সূচীপত্র

নবম খণ্ড

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৯১

গিরিশচন্দ্র বসু

১৮৫৩—১৯৩৯

গিরিশচন্দ্র বসু

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
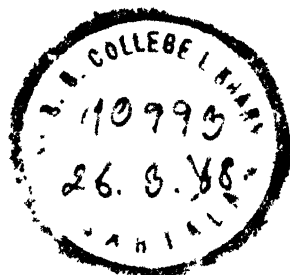
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৯

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

৭.২—১৩।৫।১৯৫২

যে-সকল কৃতী শিক্ষাবিদের আবির্ভাবে বাংলা দেশ ধন্য হইয়াছে, বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা—গিরিশচন্দ্র বসু তাঁহাদের অন্যতম। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি তাঁহাকে আজও আমাদের নিকট স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ঐকান্তিক দেশপ্রীতিতে গিরিশচন্দ্রের হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তাঁহার দেশপ্রেম নিছক ভাববিলাসমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই, তাহা তাঁহাকে বিবিধ জাতিগঠনমূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। কৃষির উন্নতি না হইলে আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের আশা যে সুদূরপরাহত তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া তিনি তৎপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গবাসী স্কুলে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে উন্নত ধরণের কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এদেশে বেসরকারী শিক্ষায়তনে কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন ষোল আনা স্বদেশীভাবাপন্ন,—মনে-প্রাণে, আচারে-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে খাঁটি বাঙালী। মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা উভয়েরই প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অপরিসীম। শিক্ষাবিদ্‌রূপে তাঁহার বিপুল খ্যাতির নীচে সাহিত্য-সাধক গিরিশচন্দ্র চাপা পড়িয়াছেন। একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবকরূপেও তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা দাবী করিতে পারেন। আমি প্রধানতঃ সাহিত্য-সাধক গিরিশচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছি।

জন্ম ঃ বিদ্যাশিক্ষা

১২৬০ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক (২৯ অক্টোবর ১৮৫৩) বর্দ্ধমান জেলার বেড়ুগ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়।

তাঁহার পিতার নাম—জানকীপ্রসাদ বসু। জানকীপ্রসাদ উদারপ্রকৃতি ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন ; ইংরেজীতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল।

গিরিশচন্দ্রের শৈশব-শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায় সুরু হয়। পড়াশুনায় পুত্রের প্রবল অনুরাগের পরিচয় পাইয়া জানকীপ্রসাদ তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষা দিবার অভিলাষ করেন। তাঁহার অগ্রজ রাজবল্লভ তখন হুগলী জজ-আদালতের পেশ্‌কার ; জানকীপ্রসাদ তাঁহার নিকটেই পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। গিরিশচন্দ্র জ্যেষ্ঠতাতের বাসায় অবস্থান করিয়া, বিদ্যাশিক্ষার্থ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১০ বৎসর।

অল্প বয়সে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলেও জেঠাই-মার স্নেহে গিরিশচন্দ্র কোন দিনই মায়ের অভাব অনুভব করেন নাই। উত্তর-জীবনে যে-সকল সদ্‌গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা গিরিশচন্দ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি তাঁহার জেঠাই-মার নিকট ঋণী। এই গুণবতী মহিলার নিকট বাল্যকালে তিনি যে-সকল সৎশিক্ষা লাভ করেন তাহাই পরবর্ত্তী কালে তাঁহাকে মহত্তর জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

হুগলীতে অবস্থানকালেই গিরিশচন্দ্রের কলেজী বিদ্যার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁহার পরীক্ষাগুলির ফল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইং ১৮৭০ ···	এন্‌ট্রান্স, ২য় বিভাগ	···হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল
১৮৭৩ ···	এফ. এ., ২য় বিভাগ	···হুগলী কলেজ
১৮৭৬ ···	বি. এ., ১ম বিভাগ, ১১শ স্থান···	ঐ

অধ্যাপনা

গিরিশচন্দ্র বি. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐ পরীক্ষার ফল দর্শনে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর উড্‌রো সাহেব তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। উড্‌রো গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি তরুণ গিরিশচন্দ্রকে কটক কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন। গিরিশচন্দ্র ১৮৭৬, ৬ই ফেব্রুয়ারি এই কার্য্যে যোগদান করেন। এইখানে অধ্যাপনাকালেই তিনি "Teacher"-রূপে ১৮৭৮ সনে এম. এ. পরীক্ষা পাস করিয়াছিলেন।

বিবাহ

কটক কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার এক বৎসর পরে, ১৮৭৭ সনে গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়; তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর। পাত্রী—বর্দ্ধমান-নিবাসী প্যারীচরণ মিত্রের কনিষ্ঠা কন্যা নীরদমোহিনী।

বিলাত-যাত্রা ঃ পরীক্ষায় সাফল্য

এই সময়ে বঙ্গীয় সরকার কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য প্রতি বৎসর দুই জন করিয়া ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া বিলাতে পাঠাইতে-ছিলেন। এক দিন স্কুল-পরিদর্শক ভূদেব মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই বৃত্তি লইয়া বিলাত যাইতে পরামর্শ দেন। তখন সমাজ এতটা উদার ছিল না; কালাপানি উত্তীর্ণ হইলে সমাজে স্থান হইত না। ইহা সত্ত্বেও জানকীপ্রসাদ পুত্রকে বিলাত

যাইবার সম্মতি দিয়াছিলেন, তাহার উন্নতির পথে অন্তরায় হন নাই। ১৮৮১, ২১এ ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন। সমুদ্রযাত্রার ৩৭ দিন পরে তিনি বিলাতে পৌছান।

বিলাতে পৌছিয়া গিরিশচন্দ্র সিসেষ্টার (Cirencester) রয়াল এগ্রিকালচারাল কলেজে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। সিসেষ্টার কলেজে তখন কি কি বিষয় পড়ানো হইত, গিরিশচন্দ্র একখানি পত্রে তাহার আভাস দিয়াছেন; তিনি লিখিতেছেন :—

> "আজ কাল প্রতি বৎসর দুই জন করিয়া বঙ্গবাসী কৃষিকার্য্য শিখিবার জন্য ইংলণ্ডে আসিতেছেন। ইংলণ্ডের মধ্যে সাইরেণসেস্টার কালেজ এ বিষয়ে প্রধান; লোকের ইহাই বিশ্বাস; সুতরাং বাঙ্গালার ছোট লাট তাঁহাদিগকে সাইরেণসেস্টারে পড়িতে পাঠাইতেছেন।...
>
> কালেজে কি কি বিষয় পড়া হয়।—(১) কৃষিবিদ্যা হাতে কলমে শিখিতে হয় (Theoretical and Practical); (২) রসায়ন (Inorganic, organic, qualitative and quantitative analysis and agricultural chemistry) —অক্সিজান বাষ্প হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের গুণ ও তাহাতে কি কি পদার্থ কত পরিমাণে আছে, সমস্ত স্বহস্তে করিতে হয়, চক্ষে দেখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে হয় না; (৩) উদ্ভিদ্‌বিদ্যা; (৪) ভূতত্ত্ব; (৫) প্রাণী-তত্ত্ব; (৬) ঘোড়া, গোরু, ভেড়া ইত্যাদির শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসা; (৭) প্রকৃতিবিজ্ঞান (Physics); (৮) জমিমাপ (Surveying); উঁচু নীচু পরিমাণ (Levelling); (৯) জমিদারী তত্ত্বাবধারণ; (১০) কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় আইন; (১১) গৃহ-নির্ম্মাণ (Building construction) ও গৃহ-নির্ম্মাণ

উপযোগী পদার্থের গুণ বিচার (Strength of materials) এবং (১২) ইংরাজি ধরণে খাতা-লেখা।"

১৮৮২ সনে সিসেষ্টারে অবস্থানকালে গিরিশচন্দ্র ইংলণ্ডের রয়াল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির ডিপ্লোমা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও সোসাইটির আজীবন-সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন ; এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উক্ত সোসাইটির নিকট হইতে ৫০ পাউণ্ডের একটি পুরস্কার লাভ করেন। ঐ বৎসরই তিনি আবার হাইল্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল সোসাইটির ফেলোশিপ পরীক্ষা দিয়া উহার আজীবন-সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন। পর-বৎসর—১৮৮৩ সনে তিনি এগ্রিকালচারাল কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ কিঞ্চ (Kinch), এফ. সি. এস্.-এর সুপারিশে ইংলণ্ডের কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সিসেষ্টার কলেজে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন।* গিরিশচন্দ্রের বিলাতের ছাত্র-জীবন

* সিসেষ্টার কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে ১৯৪৮ সনে তৎকালীন অধ্যক্ষ জানাইয়াছিলেন :—

"I have scrutinised his Examination Results and find that in his first year he got more marks than any one else, in fact he got 2,990, and the next man, J. H. Dugdale, got 2,918. He was top in Agriculture, Chemistry, Law, Veterinary Science and Botany. In his final year he was second in his Examinations, Dugdale getting 1599 marks and Bose 1532. He had highest marks in Agriculture and Chemistry. Dugdale you will be interested to know was the first County Organiser of Agricultural Education in this Country. During the period Mr. Bose was a student here the Principal was the Revd. J. B. McClellan, M. A., and about 100 students were in residence. They were mostly the Sons of land owners and large farmers."—*Bangabasi College Diamond Jubilee 1887-1947*, p. 4.

কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। তিনি বিলাতে অতি মেধাবী ছাত্ররূপে সুপরিচিত হইয়া ভারতীয় ছাত্র-সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উপরন্তু, তিনি পশুচিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য লেঃ গবর্ণরের ৫০ পাউণ্ড পুরস্কারও লাভ করেন।

কৃষিবিদ্যায় অভাবনীয় সাফল্য লাভ করিয়া গিরিশচন্দ্র ১৮৮৪, ৪ঠা জুন ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। ফিরিবার পথে তিনি প্যারিস, জেনিভা ও ইটালী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ২০এ জুন তিনি মার্সেই হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

‘কৃষি গেজেট’

বিলাত-প্রবাস গিরিশচন্দ্রের আচার-আচরণে, এবং ভাব-জীবনে কোনো পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই, বিজাতীয় আদর্শের প্রভাবে তিনি মোটেই রূপান্তরিত হইয়া যান নাই। তিনি বাঙালী-রূপেই বিলাত গিয়াছিলেন, বাঙালীর মতই বিলাতে কাটাইয়াছেন, আবার যখন স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন তখনও তিনি পুরাদস্তুর বাঙালী, অধিকন্তু স্বদেশের কল্যাণসাধনের অনুপ্রেরণায় তাঁহার অন্তঃকরণ ভরপূর। বিলাত হইতে ফিরিবার পর তাঁহার নিকট নিজামের রাজ্য হায়দ্রাবাদ হইতে একটি লোভনীয় চাকুরী গ্রহণের আহ্বান আসিয়াছিল। সিসেষ্টারে উত্তীর্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী দুই জন কৃতী ছাত্রের ন্যায় সরকার তাঁহাকেও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই দুইটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং জাতিগঠনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশে শিক্ষাবিস্তারকেই জীবনের পবিত্র ব্রত হিসাবে বরণ করিয়া লইলেন। সে-যুগে এত বড় সরকারী চাকরির মোহ

পরিত্যাগ করিয়া এই শিক্ষাব্রতী যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, আদর্শনিষ্ঠা এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাহা বিরল।

বিদেশ হইতে গিরিশচন্দ্র কৃষিবিদ্যায় অগাধ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়া আসিয়াছিলেন। এই অর্জিত বিদ্যা যাহাতে দেশবাসীর কল্যাণসাধনের সহায়ক হয়, সে জন্য তিনি বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিলেন। এ দেশের কৃষির উন্নয়ন হইল তাঁহার ধ্যান জ্ঞান। দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের বর্ষকাল-মধ্যেই গিরিশচন্দ্র জনসাধারণকে উন্নত প্রণালীর কৃষিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করিবার অভিলাষে বাংলায় কৃষি গেজেট' নামে "কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক" একখানি মাসিক পত্রিকা ও ইংরেজীতে *Agricultural Gazette* 'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশ করিবার আয়োজন করিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন, 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী স্বনামধন্য যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর পিতামহ দামোদর গিরিশচন্দ্রের পিতামহ জগদ্বল্লভের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। গিরিশচন্দ্র বয়সে যোগেন্দ্রচন্দ্রের অগ্রজ।

'কৃষি গেজেটে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫)। ইহা প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে বঙ্গবাসী ষ্টীম প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। ইতিপূর্ব্বে 'ব্যবসায়ী' (ইং ১৮৭৬), 'কৃষিতত্ত্ব' (১৮৭৯), 'কৃষিপদ্ধতি' (১৮৮৩) প্রভৃতি সমগোত্রীয় পত্রিকার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু 'কৃষি গেজেট' ছিল একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা; ইহার রচনাগুলি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য সরল ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক লিখিত। প্রথম সংখ্যার "মুখ-বন্ধে" সম্পাদক পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এক দিকে যেমন দেশের কৃষককুলের উপর তাঁহার অপরিসীম দরদের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য দিকে তেমনি আমাদের কৃষির

উন্নয়নের জন্য তিনি কত গভীরভাবে চিন্তা করিতেন তাহাও বুঝিতে পাওয়া যায়। কৃষির উন্নয়নের সহিত এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উৎকর্ষের সম্পর্ক যে কি ঘনিষ্ঠ, তাহাও গিরিশচন্দ্রের এই রচনাটিতে ব্যক্ত হইয়াছে। আজিকার দিনে স্বাধীন ভারতের যাঁহারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহারা ইহা হইতে কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশ পাইতে পারিবেন ভাবিয়া দীর্ঘ হইলেও রচনাটি আগাগোড়া উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) ভারতীয় কৃষকদের অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা।

সকলেই স্বীকার করেন ভারতীয় কৃষকের ন্যায় কষ্ট-প্রাণ ও অধ্যবসায়ী জাতি জগতে আর নাই; সময়ে সময়ে তাহারা কার্য্যে বেশ কৌশল ও নিপুণতাও দেখাইয়া থাকে। এক বেলা আধ্‌পেটা খাইয়া, কৌপীন পরিধান করিয়া, তাহারা যত কম পয়সায় খাটিতে পারে, পৃথিবীর আর কোন জাতীয় কৃষক তাহা পারে না। কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা, এত অধ্যবসায়, কষ্ট, শ্রম ও কৌশল সত্ত্বেও তাহারা দুই বেলা পেট ভরিয়া দুই মুঠা খাইতে পায় না, বৎসরের তিন শত পঁয়ষট্টি দিন তাহারা উদরান্নের জন্য লালায়িত। কৃষক-কুল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যাস্তের পর পর্য্যন্ত, বৈশাখের তীব্র রৌদ্রে পৌষের হাড়-ভাঙ্গা শীতে, শ্রাবণের অজস্র বারিধারায় আপাদ মস্তক ভিজিতে ভিজিতে, স্ব স্ব ভূমিখণ্ডের উপর সদা ব্যাপৃত থাকিয়াও স্ত্রী পুত্রের উদরান্ন যোগাড় করিতে অক্ষম; স্ত্রী পুত্র লইয়া চির অনাহারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তিন চারিটি মাত্র পয়সায় যাহারা এক বেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পায়, তাহারা এত কষ্ট করিয়াও উদরের জন্য লালায়িত, ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা! টানাপাখার হাওয়া খাইয়া, বরফ দেওয়া জল পান করিয়াও তুমি হাঁই ফাঁই করিতেছ, কিন্তু কখন কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, যে, যাহারা তোমার বাবুগিরীর পয়সা যোগাইতেছে সেই কৃষককুল এই

বৈশাখের দুই প্রহর রৌদ্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বৃক্ষশূন্য মাঠে ভূমিকর্ষণ করিতেছে। যাহাদের শ্রমে তোমার এত বাবুগিরী তাহাদের কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করা তোমার কি উচিত নয় ?

(২) কৃষকের কি কিছু শিখিবার নাই ?

কেহ কেহ বলেন, ভারতের কৃষি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাই যদি হইল তবে কৃষককুল অন্নের জন্য লালায়িত কেন ? স্থানে স্থানে কৃষির অবস্থা, দেশের উপযুক্ত স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় কৃষির উন্নতি অথবা ভারতীয় কৃষকের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। কৃষির যদি অবস্থা এত উন্নত তবে কৃষিকার্য্যে ব্রতী কৃষকের এ দুর্দ্দশা কেন ?

(৩) পত্রিকার উদ্দেশ্য।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিই ভারতের জীবন ; সেই ভারতের কৃষক যে কঠিন পরিশ্রম করিয়াও অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে চিরকাল যাপন করিতেছে, ইহা বড় গভীর চিন্তার বিষয়। সেই গুরুতর বিষয় আলোচনা করিয়া কৃষকদের কষ্ট নিবারণ জন্য এই পত্রিকার জন্ম। রাজা, প্রজা, জমীদার, অর্থাৎ ভূমির সহিত যাহার কোন সম্পর্ক আছে, সকলকে স্বদেশের ও বিদেশের কৃষিপদ্ধতির মর্ম্ম বুঝাইয়া যাহাতে স্বদেশের কৃষিপদ্ধতি উন্নত হয় তাহাই ইহার উদ্দেশ্য।

(৪) ইহাতে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইবে।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন ভূমির দোষ গুণ ও উৎপাদিকা শক্তির বিচার ; ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভূমি ও জল বায়ুতে কি কি ফসল সুচারুরূপে হইয়া থাকে ও হইতে পারে ; ধান্য গোধূমাদি আহারের

প্রধান প্রধান সামগ্রী কি প্রকারে অল্প মূল্যে উৎকৃষ্টরূপে উৎপন্ন ও বিক্রয় জন্য প্রস্তুত করিতে হয়; কীটাদি ফসলের শত্রু; ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে জল সেচনে ভূমি ও শস্যের কি উপকার; লাঙ্গল আদি কৃষি-যন্ত্রের উন্নতি; গো মহিষের জন্য দেশের ঘাষাদি রক্ষা ও আবশ্যক হইলে বিদেশ হইতে নূতন ঘাষাদি আনয়ন; এবং সার প্রয়োগের মূলমন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভূমির উপযুক্ত সার,—এই সমস্ত বিষয় ইহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইবে।

আরও এক কথা। আমাদের দেশের গরু-বাছুরের বড় দুরবস্থা। তাহাদের না আছে আহার, না আছে যত্ন। আমাদের কৃষকেরা বুঝে না, যে গো মহিষ কৃষির প্রধান অঙ্গ; মস্তক যেমন শরীরের প্রধান অংশ, গো মহিষ কৃষি সম্বন্ধে সেইরূপ। সেই জন্যই গরু-বাছুরের বংশোন্নতি, লালন পালন, আহার, চিকিৎসা ও মড়ক নিবারণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদত্ত হইবে। লোম ও মাংসের জন্য মেষ ও ছাগল, এবং কৃষি-নিযুক্ত ঘোটকের বিষয়ও ইহাতে লিখিত হইবে। ইহা ব্যতীত কৃষি ও শিল্প-বিষয়ক অনুসন্ধান-তালিকা, শস্যের অবস্থা, বৃষ্টি ও মেঘের গতি ইত্যাদি কৃষি সংক্রান্ত নানা বিষয় এই পত্রিকায় স্থান পাইবে।

(৫) কৃষির সহিত শিল্পের সম্পর্ক।

কেবল কৃষির উন্নতিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিব না। যাহাতে শিল্পের প্রতি আমাদের দেশের লোকের মনোযোগ হয়, কারখানা সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে। আমাদের দেশে অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হয় যাহার কিঞ্চিৎ উন্নতিসাধন করিলে, দেশে বিদেশে তাহার কাটৃতি বৃদ্ধি হইতে পারে। বিদেশ হইতে আমরা অনেক জিনিষ আনিয়া থাকি, যাহা সামান্য আয়াসে আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে পারে। চিনি প্রস্তুত ও পরিষ্কার, চামড়ার পাটকরা, তুলা ও পাটের কাপড় প্রস্তুত, মাটীর

বাসন চিনের বাসন ও কাচের বাসন, দিয়াসালাই ও সাবান প্রস্তুত,—ইত্যাদি নানাবিধ শিল্প বিষয় ইহাতে আলোচিত হইবে। কৃষির সহিত শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং উভয়ের উন্নতিতে দেশের ধন বৃদ্ধি।

(৬) কৃষির সহিত বাণিজ্যের সম্পর্ক।

কৃষি, শস্যাদি উৎপন্ন করে; শিল্প হস্তক্ষেপ করিয়া কৃষিজাত দ্রব্যকে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করে; বাণিজ্য তখন অগ্রসর হইয়া কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রীর দেশ বিদেশ বিস্তার ও আমদানি রপ্তানি দ্বারা শিল্প ও কৃষি উভয়ের সাহায্য করে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের এইরূপ নিকট সম্পর্ক।

(৭) শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা দেশের কি উন্নতি সাধন সম্ভব?

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী, ভূমির উৎপন্নই তাহাদের জীবন। কাজে কাজেই যে যাহা করুন সকল ভারই ভূমির উপর। যাহাদের কৃষি একমাত্র সম্বল, তাহারা শিল্প ও বাণিজ্যে লিপ্ত হইলে ভূমির ভার কমিবে। এক জমি লইয়া মারামারি না করিয়া, কারখানা প্রভৃতি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে শিখিলে, অনেক লোক, যাহারা এক্ষণে অন্নের জন্য লালায়িত, তাহাদের গৃহে অন্ন হইবে। কৃষি চতুষ্কোণ করিতে হইলে শিল্প বৃদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক। সেই জন্য কেবল কৃষি নহে, শিল্প এবং বাণিজ্যের আলোচনাও ইহার উদ্দেশ্য রহিল।

(৮) কৃষি পত্রিকার অভাব।

আপাতত সমগ্র ভারত মধ্যে এমন একখানিও পত্রিকা নাই যাহাতে এই সকল বিষয় সহজ ভাষায় ও সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হয়। এ প্রকার একখানি পত্রিকার যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিশেষ যখন কৃষি ও অন্যান্য বিষয়, যাহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হয়, তাহার দিকে

লোকসাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। 'কৃষি গেজেট' সেই অভাব পূরণ করিবে,—সেই অভাব পূরণ করিবার জন্যই ইহার জন্ম।

(৯) পত্রিকার লেখক।

কৃষি বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে পারদর্শী লোক ইহার লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। লেখকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই স্বদেশ ও বিদেশের কৃষি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। বিলাতের কৃষি-কলেজ শিক্ষিত মহোদয়বৃন্দের যত্নেই ইহার উৎপত্তি, তাঁহাদের দ্বারাই ইহা সম্পাদিত হইবে। ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কৃষি-ডিরেক্টর, কৃষি-সমাজের সভাপতি ও সম্পাদক, কৃষি ও শিল্প-কলেজের প্রধান প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি অভিজ্ঞ ও পারদর্শী লোক আমাদের সহিত যোগদান ও যাহাতে দেশের এই বিশেষ অভাব পূর্ণ হয় তাহার চেষ্টা করিবেন, আশা করা যায়। আমাদের অভিপ্রায়ের সহিত যাহাদের সহানুভূতি আছে তাহাদের সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে।

(১০) সকল অবস্থা ও সকল শ্রেণীর লোকের দ্বারে যাহাতে কৃষি গেজেট উপস্থিত হয় তাহার চেষ্টা।

সকলের দ্বারে কৃষি-গেজেট উপস্থিত হইতে পারিবে বলিয়া বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় ইহা সম্পাদিত হইল। বাঙ্গালা কৃষি গেজেটের বাৎসরিক মূল্য মায় ডাক মাশুল নগদ ৩৲ টাকা ও ইংরাজী গেজেটের মূল্য নগদ ৪৲ টাকা।

আমরা 'কৃষি গেজেটে'র প্রথম দুই বর্ষের সংখ্যাগুলি দেখিয়াছি। প্রথম বর্ষের ১ম সংখ্যায় গিরিশচন্দ্রের লিখিত "ভারতীয় গমের উপর বিলাতের ভাবী নির্ভর" ও "ভারতবর্ষে গরুর মড়ক" এবং ২য় সংখ্যায়

"মাছের চাষ"—এই তিনটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। কৃষিতত্ত্ববিৎ সৈয়দ সখাবৎ হোসেন, অম্বিকাচরণ সেন, ভূপালচন্দ্র বসু (অরবিন্দের শ্বশুর), অতুলচন্দ্র রায়, শ্রীশচন্দ্র দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাও পত্রিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র কত সহজ সরল ভাবে বক্তব্য বিষয় বুঝাইতে পারিতেন এবং তাঁহার প্রবন্ধ কিরূপ কাজের কথায় পূর্ণ থাকিত, 'কৃষি গেজেটে' প্রকাশিত "মাছের চাষ" তাহার প্রমাণ। বাংলায় আজ মৎস্যের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। মাছের চাষ বাড়াইবার জন্য যে-সকল পরিকল্পনা হইয়াছে সেগুলি বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, এমতাবস্থায় একজন দিক্‌পাল বৈজ্ঞানিক বহু পূর্ব্বেই এই সমস্যার সমাধানকল্পে যে-সকল কার্য্যকরী উপায়ের কথা বলিয়াছিলেন সেগুলি দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ সময়োপযোগী বিবেচনায় আমরা "মাছের চাষ" প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

> "**মাছের চাষ**।—কথাটি শুনিতে কিছু নূতন। কিন্তু নূতন বলিলে আর চলে কৈ? জিনিষটী এখন বড় দরকারী হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল সর্ব্বত্রই শুনা যায় যে, আগেকার মত মাছ পাওয়া যায় না—পূর্ব্বে যে পরিমাণে মাছ পাওয়া যাইত, দিন দিন সে পরিমাণের হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এ কথা ঠিক করা সহজ নহে, তবে আমি যে জেলার বিষয় জানি, সেখানে এইরূপই বটে। আমার মনে হয় কিছুকাল পূর্ব্বে, বর্ষার পর, আমাদের নদ, নদী, খাল, বিল, ডোবা, পুকুর সব মাছে ভরিয়া যাইত। এখনও সেই সব রহিয়াছে, কিন্তু তেমন মাছে-ভরা অবস্থা আর দেখিতে পাই না। মাছ এত কমিল কেন, আর তাহাতে ভারতবাসীর ক্ষতিই বা কি, তাহা দেখা যাউক।

ভারতে যত লোক মাছ খায়, ইংলণ্ডে বা ইউরোপের কুত্রাপি তত নহে। মাছ, ভারতবাসীর সখের জিনিষ নহে, উহা তাহাদের দৈনিক আহারীয় সামগ্রী। মুসলমান সম্প্রদায়কে বাদ দিলে, মাংসাহারী লোকের সংখ্যা ভারতে নিতান্তই কম। জন্তুজাত আহারীয় সামগ্রীর মধ্যে, দুগ্ধ ও মাছই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত। সুতরাং মাছের হ্রাস বৃদ্ধিতে ভারতবাসীদিগের বিলক্ষণ ক্ষতি বৃদ্ধি, ইহা সহজেই বুঝা যায়। যাহাতে মাছের উৎকর্ষ সাধন হয়, সে সব কথা ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর কথা সন্দেহ নাই।

কিসে মাছ কমিয়া যাইতেছে, এখন তাহাই দেখা যাউক। প্রাণধারণ ও পুষ্টিসাধন করিতে হইলে, সকল জীবেরই উপযুক্ত আহারের প্রয়োজন। আমরা যেমন বায়ু-সাগরে বিচরণ করি, কিন্তু বায়ু সেবন করিয়া জীবনধারণ করিতে সক্ষম নহি; তেমনই জলচারী মাছগুলিও জল খাইয়া বাঁচিতে পারে না,—তাহাদেরও উপযুক্ত আহারের প্রয়োজন। তাহাদের উপযুক্ত আহার কি? ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, অগ্রে দেখা আবশ্যক যে, তাহাদের শরীর কি কি উপকরণে গঠিত? আহার নির্দ্ধারণের প্রণালীই এইরূপ।

এদেশের মাছ এ পর্য্যন্ত রীতিমত রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। হইলে খুব ভাল হইত সন্দেহ কি? তদভাবে বিলাতের মাছের পরীক্ষার ফল ধরিয়া লওয়া যাউক। অবশ্য উপকরণ সম্বন্ধে বেশী তফাৎ হইবে না। তাহা এই;—সাড়ে বার মণ মাছে ২০ ভাগ নাইটারজান, ৮॥০ ভাগ প্রস্ফুরসমিলিত অম্ল, ও ৪॥০ ভাগ ক্ষার। তৈলজ পদার্থ প্রায় শতকরা ১৯ ভাগ। সুতরাং মাছের আহার ঐরূপ উপকরণেরই হওয়া চাই। মাছের আহারের পরিমাণ সম্বন্ধে একটী কথা আছে। স্থলচর জীব জন্তু অপেক্ষা মাছের সুবিধা এই যে, অপেক্ষাকৃত অল্পাহারেই ইহাদের চলে।

কারণ, অন্যান্য জন্তুদিগের অনেক আহার কেবল মাত্র শরীরের তাপ রক্ষা করিতেই খরচ হয়, তা ছাড়া দেহের পুষ্টিসাধন, ক্ষতিপূরণ, এ সকলের জন্য ত আহার চাইই। দেহ রক্ষা, ও বৃদ্ধি করিতে গরুর যত আহারের প্রয়োজন, শরীরের তাপ রক্ষা করিতে তাহার ছয় গুণ আহারের দরকার। মাছের এ বাড়্‌তি প্রয়োজনটী নাই। তাহাদের যাহা কিছু আহারের প্রয়োজন, তাহা পুষ্টির জন্য। সুতরাং খুব কম আহারেই মাছের বেশ চলে। এটী খুব সুবিধা, সন্দেহ নাই। তথাচ মাছের আহারের প্রয়োজন। আর সে আহার উপরোক্তরূপ উপকরণের হওয়া চাই। স্বভাবত জল বা জলের নীচের মাটী হইতেই, মাছ তাহাদের আহার সংগ্রহ করে। সুতরাং নদীগর্ভ, বালিময় কিম্বা প্রস্তরময় হইলে তাহার জলে, ও তাহার তলার জমিতে মাছের আহারের উপকরণের অভাব পড়ে; সেখানে মাছ ভাল হয় না—বেশীও হয় না, বড়ও হয় না। অন্নকষ্টে মানুষের যে দশা, সেখানে মাছেরও সেই দশা। আবার যেখানকার নদ নদী, গাছপালা ও চষা জমি প্লাবিত করিয়া আসে, সেখানে মাছের বড় বাড়। স্কটলণ্ডের পর্ব্বতময় প্রদেশের নদ নদী এক প্রকার মাছশূন্য বলিলেও হয়। সেখানে মাছের আহারের সংস্থান নাই, মাছ থাকিবে কেমন করিয়া? উহাদের মধ্যেই আবার যে যে নদ নদী আবাদী জমি বা সার দেওয়া জমি ধুইয়া আসে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত বেশী মাছ। নদীনালার জলে ও তলায় কি পরিমাণে উপরিউক্ত তিনটি সার পদার্থ আছে জানিলে, তাহা মৎস্যের উপযোগী কি না বলা যায়। বিলাতের একজন বিচক্ষণ কৃষি-পণ্ডিত এই সকল কথা বলিয়াছেন।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, যেমন অন্যান্য দ্রব্যের চাষ হয়, মাছেরও সেইরূপ চাষ সম্ভব। অর্থাৎ মাছ বাড়াইতে হইলে ও

তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে, তদুপযোগী জিনিষ—সার—দেওয়া চাই। এখন, সহজেই বুঝা যাইবে যে, কেন এদেশে মাছ কম পড়িয়াছে। অনেকেই বুঝেন যে, গাছ কাটিয়া ও বন পরিষ্কার করিয়া ফেলায়, বৃষ্টির অনেক অভাব হইয়া পড়ে। এই বৃষ্টির অভাবে, মাছের যে কেবলমাত্র নিবাস-কষ্ট হয় তাহা নহে, তাহাদের আহারেরও বিলক্ষণ অভাব হইয়া পড়ে। যে জেলার কথা আমি বলিতেছি, সেখানে দামোদর নদী প্রবাহিত। ইহার উৎপত্তিস্থল, রামগড় পাহাড়। এখান হইতে বাহির হইয়া প্রস্তরময় ভূমি বহিয়া দামোদর চলিয়াছে। এমত স্থলে, এ নদীতে মৎস্যের আশা অবশ্যই অল্প। তাহার উপরে আবার তাহার উৎপত্তিস্থলের গাছপালা বনঝাড় কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। দামোদরে মাছ থাকিবে কেমন করিয়া? গাছপালাতেই ক্ষার ও প্রস্ফুরস। আর, এই দুইটীই মাছের প্রধান আহার। গাছপালা হইতে—গলিত পত্র, পচা ডালপালা হইতে—নাইটারজানেরও সংস্থান। তাহার উপর যেখানে গাছপালা, সেইখানেই অল্প বিস্তর জন্তু বাস করে, তাহাদের মৃতদেহ হইতেও বেশ নাইটারজান পাওয়া যায়। এই গাছপালাগুলিই যদি কাটিয়া ফেলা যায়, তবে আর নদীতে মাছ থাকিবে কেমন করিয়া? ফলেও ঘটিয়াছে তাই। তবুও যদি এই সকল পরিষ্কার জমি আবাদ করা হয়, তাহা হইলেও কতকটা মাছের পক্ষে ভাল। আবাদে-জমি হইতে ক্ষার ও প্রস্ফুরসমিলিত অম্ল সহজে বাহির হইয়া আইসে। পুকুরের বিষয় ভাবিয়া দেখিলেই এ সকল কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। যে পুকুরে লোকে স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসন ধোয়, সেই পুকুরেই মাছ বাড়ে, সেই পুকুরেই মাছ সুমিষ্ট হয়। ঐ সকল প্রকারে মাছের আহার যোগান হয়, তাই সেখানে মাছের এত পুষ্টি। আমার মনে হয়, একটী মিউনিসিপাল-পুকুর অতি পরিষ্কার রাখিবার

জন্য তাহাতে লোকের স্নান করা, কাপড় কাচা, বাসন ধোয়া সব বন্ধ করা হয়। সে পুকুরে মাছ বড় কম। অন্যত্রও এরূপ ঘটিয়াছে শুনিয়াছি।

এখন কথা এই যে, কলিকাতা, বোম্বাই, লণ্ডন প্রভৃতি বড় বড় নগরের মলমূত্র যে নদীতে গিয়া পড়িতেছে, তাহাতে কি এই সকল সার বস্তুই নষ্ট হইতেছে? নদীতে পড়িলে কি তাহা হইতে কোন উপকার হয় না? উপকার যে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অবশ্য স্বীকার করি যে, জমিতে এই সকল সার দিতে পারিলে জমির গুণ বাড়ে, ফসলের শ্রীবৃদ্ধি হয়; আর যাহাতে সেরূপ বন্দোবস্ত হয়, তাহাই করা উচিত। কিন্তু এখন যেমন হইতেছে, জলে ফেলিয়া দিয়া যে সারগুলি একেবারে নষ্ট হইতেছে এমত নহে। জলে মিশ্রিত হইয়া উহা মৎস্যদিগের আহার যোগায়। এই জন্য ভাগীরথীর মোহানা যে, মাছে পরিপূর্ণ তাহা অনায়াসে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাগরের তলভূমি ও তাহাতে যে মলমূত্রাদি পতিত হয়, এই দুইটীর অবস্থা জানিলেই সেই সাগরের মৎস্যধারণী শক্তি বুঝিতে পারা যায়। এই দুইটি বিষয় ভাবিয়া দেখিলে, বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগ যে, মাছে পরিপূর্ণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মাছ কমিয়া যাইবার আর একটী কারণ আছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাছেরও উপর বেশী টান পড়িয়াছে। সুতরাং রীতিমত বিবেচনা করিয়া মাছ ধরা হয় না। যখন্ তখন্, অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাছ ধরা হয়। ডিম পাড়ার সময়েও অনেক মাছ এইরূপে মারা পড়ে। লোকের বিশ্বাস যে যত দিন জল আছে তত দিন আর ভয় কি, মাছ থাকিবেই। সুতরাং মাছ ধরিবার আর সময়-জ্ঞান থাকে না,—ডিম পাড়িবার সময়েও মৎস্যকুল রেহাই পায় না।

ডিমশুদ্ধ একটা মাছ ধরিলে, একটী মাছ মরিল না, একটী বংশের শ্রাদ্ধ করা হইল। ক্রমাগত এমন করিয়া কত দিন চলে? অনেক দেশে এরূপ কুপ্রথা নিবারণ জন্য আইন আছে। আমি অবশ্য এমত বলিতেছি না যে, এদেশেও সেইরূপ আইন হউক; এদেশে সেরূপ আইনের দরকারও দেখি না। ফলে, এই বলা আমার উদ্দেশ্য যে, মৎস্যেরও চাষ চলে এবং আবশ্যক।"

বঙ্গবাসী কলেজ

কৃষির উন্নতি করিতে হইলে দেশের ছাত্র-সমাজের একাংশকে এ দেশেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র অবহিত হইয়া উঠিলেন। কেবলমাত্র 'কৃষি গেজেট' প্রকাশ করিয়াই যে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্যক্ সফল হইবে না ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি 'সিসেষ্টারে'র আদর্শে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলেন; 'কৃষি গেজেটে' (চৈত্র ১২৯২) সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই বিবৃতিটি প্রকাশিত হইল :—

"আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কৃষি-শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটি স্কুল খোলা হইতেছে। ১১৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে ১লা মে হইতে 'বঙ্গবাসী স্কুল' নামে একটি স্কুল খোলা হইবে, কৃষি-শিক্ষার জন্য তাহাতে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে। আরও আনন্দের বিষয় যে, বিলাতপ্রত্যাগত কৃষি-পারদর্শী সাইরেণ্‌সেষ্টার কৃষি-কালেজ উত্তীর্ণ কোন কোন ব্যক্তি কৃষি-শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপনা কার্য্য করিবেন। যাহাতে কৃষি-শিক্ষার্থে ভারতবাসীকে বিলাত যাইতে না হয়, বঙ্গবাসী স্কুলের কৃষি-বিভাগের তাহা এক

প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষি-বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হইবে, যথা,—(১) কৃষি, (২) কৃষি-রসায়ন, (৩) পল্লিগত অবস্থা, (৪) উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, (৫) ভূতত্ত্ব, (৬) জরিপ ও ড্রয়িং, (৭) বিলাতী মহাজনী হিসাব (Book keeping), (৮) পল্লিগত স্বাস্থ্য এবং (৯) পশুচিকিৎসা। আমরা স্বাধীন উদ্যমের পক্ষপাতী, গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে স্বাধীন চেষ্টায় কলিকাতায় কৃষি-শিক্ষাব জন্য একটি স্কুল হইতেছে দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইলাম; আশা করি, দেশের লোক ইহার উপকারিতা বুঝিয়া ইহার উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই কৃষি-শিক্ষা বিস্তারের জন্য কৃষি-স্কুল ও কৃষি-কালেজ আছে। কিন্তু কৃষিপ্রাণ এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে কৃষি-শিক্ষার কোন উপায় নাই। 'বঙ্গবাসী' স্কুলের কৃষি-বিভাগ আজি তাহার অঙ্কুর বপন করিল।"

১৮৮৬, ১৩ই মে তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় বঙ্গবাসী স্কুলের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ইহাতে স্কুলটির পরিকল্পনার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

THE BANGABASI SCHOOL,
116 *Bowbazar Street, Calcutta.*

The Bangabasi School will consist of two distinct branches viz., (1) the general branch which will teach, to begin with, up to the Entrance standard, and (2) the Agricultural Branch, which is intended to supply the want of Agricultural Education in India. The Managing Board of the school has thought it expedient to substitute a 7 years' course of study for the 9 years' course usual in most schools in Bengal, for, in their opinion, much of the valuable time of students is wasted for want of due occupation.

There will be two terms each year, (1) the Dusserah Term (June to November) and (2) the Basanti Term (December to May). After examinations at the end of each Term, liberal Scholarships and Prizes as well as Freeships will be awarded to deserving students in each class. The Scholarships will be one of Rs. 6 each, and the Freeships and Prizes, also one each for each class. At the end of the year, a grand special prize of Rs. 50 will be awarded to the most successful students of the School. Besides, four Matriculation Prizes of Rs. 100, Rs. 50, Rs. 30 and Rs. 20 respectively will be awarded to first four passed students of the Bangabasi School at the Entrance Examination each year, provided they pass it in the First Division.

As the teaching of English is usually very defective in most schools of Bengal, the Managing Board of the Bangabasi School is very happy to have secured the services of several gentlemen who, besides being distinguished graduates of the Calcutta University, have also had the advantage of education in England. Among these are Babus Giris Chandra Bose, M. A., M. R. A. C., F. C. S., etc.. late Professor of the Cuttuck College, Bhupal Chandra Bose, B. A., M.R. A.C. etc., Byomkesh Chakravarty, M.A., M.R.A.C., late Professor of the Sheebpur Engineering College, A. K. Roy, M.R.A.C. etc. and Aghore Nath Chatterjee, M.R.C.P. etc. The schooling fees will be Rs. 4 per mensem for the upper three classes, and Rs. 2 for the lower three but in special cases they may be

reduced to one half ; admission fees the same as monthly fees. The schooling fee for the agricultural classes is Rs. 5/-.

25 students will receive freeships in the Entrance Class provided they prove to the satisfaction of the Secretary that they deserve them and take their admission before the 1st of June.

SPECIAL NOTE :—The Bangabasi School is now open for admission but classes will begin from the 1st of June. For further particulars see prospectus or apply at the Bangabasi Office, 34-1, Kalutola Street, Calcutta.

স্কুলটির নামকরণ করেন—'বঙ্গবাসী'র কর্ণধার ও গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। ইহার উন্নতির জন্য গিরিশচন্দ্র সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু সরকারী-সাহায্যবিহীন এরূপ একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করা কথার কথা নয়, এজন্য তাঁহাকে কত না বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গবাসী স্কুলের কৃষি-বিভাগটিকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। ১৮৮৭ সনে বঙ্গবাসী কলেজের সৃষ্টি হয়। বউবাজার ষ্ট্রীটের যে ভাড়া-বাড়ীতে বঙ্গবাসী স্কুল খোলা হয়, প্রথমে সেই বাড়ীতেই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ স্কট লেনে তাহার নিজস্ব ভবনে উঠিয়া আসে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে একই ভবনে স্কুলটিরও কার্য্য পরিচালনা হইতে থাকে অবশেষে স্কুলটিকে কলেজ হইতে পৃথক্ আবাসে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল এবং সেণ্ট জেম্‌স স্কোয়ারে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের উপরে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ কলেজের রেক্টর গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক স্কুলের

একটি নূতন গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলটি এই নবনির্ম্মিত ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়।

বঙ্গবাসী কলেজ বর্ত্তমানে একটি বিরাট্ শিক্ষাকেন্দ্রের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র আমরণ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ওতপ্রোত ছিলেন; তিনি ১৮৮৭ হইতে ১৯৩৪ সন পর্য্যন্ত ইহার অধ্যক্ষ এবং ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৯ সন পর্য্যন্ত রেক্টর ছিলেন। ছাত্রবর্গ তাঁহাকে সত্য সত্যই গুরুর ন্যায় ভক্তি করিত; তিনিও তাহাদিগকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় যে-সকল ছাত্রকে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থান দিতে ভরসা পায় নাই, স্বদেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র তাহাদিগের জন্য স্বীয় কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

গ্রন্থাবলী

সমগ্র জীবন বিপুল কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও গিরিশচন্দ্র অবসর সময়ে মাতৃভাষায় লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। "প্রাণী ও উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের ঋত্বিক" গিরিশচন্দ্রের ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ দ্বারা বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে। 'বিলাতের পত্রে' তাঁহার সাহিত্যিক গুণপনারও পরিচয় পাওয়া যায়।

গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি; তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা গবর্মেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির বিবরণ হইতে গৃহীত। পুস্তকে প্রকাশকাল নির্দ্দেশের অভাব প্রশ্ন-চিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে—

১। **ভূতত্ত্ব,** ১ম ভাগ, মূল সূত্র। ? (২৯ ডিসেম্বর ১৮৮১)। পৃ. ৭৪।

"কটক কলেজের বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীগিরিশ চন্দ্র বসু এম, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।"

"প্রাচীনকালে ভূতত্ত্বের বিজ্ঞান ছিল না। এই নব বিজ্ঞানের বয়ঃক্রম ৫০।৬০ বৎসর মাত্র। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালাভাষায় ভূতত্ত্ব বিদ্যার রীতিমত কোন পুস্তকই নাই। এই গ্রন্থে ভূতত্ত্বের স্থূল স্থূল কথা সংক্ষেপে লিখিত হইল; বাঙ্গালী পাঠকের যদি পড়িতে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। কলিকাতা ৭ই পৌষ ১২৮৮ সাল।"—ভূমিকা।

২। **বিলাতের পত্র।** ? (২৪ নবেম্বর ১৮৮৩)। পৃ. ১৯১।

"ইংলণ্ড প্রবাসী শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু এম, এ, প্রণীত।···মূল্য সন ১২৮৩ সালের [১৮৮৩ ?] দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে ৷৹ আনা। পরে ১৲ টাকা।"

ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে (২৭-৩-১৮৮৫), পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮৩।

৩। **ইউরোপ ভ্রমণ।** ১২৯১ সাল (২ মে ১৮৮৫)। পৃ. ২২১।

৪। **ইংরেজ চরিত** বা জনবুল:

১ম ভাগ: ১২৯২ সাল (১০-১২-১৮৮৫)। পৃ. ১২০।

২য় ভাগ: ১২৯৩ সাল (ইং ১৮৮৬)। পৃ. ২৭০।

"ফরাসী-গ্রন্থকার মাক্সওরেল রচিত "John Bull et son ille" নামক ফরাসী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া 'ইংরেজ চরিত অথবা জনবুল' বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত হইল। ইংরেজ চরিতের গূঢ় মর্ম্ম এ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।"—ভূমিকা।

৫। **উদ্ভিদ-জ্ঞান ঃ**

১ম পর্ব্ব ঃ ১৩৩০ সাল (ইং ১৯২৩)। পৃ. ১৭১+৭১।

২য় পর্ব্ব ঃ ১৩৩২ সাল (ইং ১৯২৫)। পৃ. ১৪২।

"১৮৭৪ সালে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তখন আমি হুগলি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ও বিশেষজ্ঞ সার জর্জ্জ ওয়াট (তখন 'সার' হয়েন নাই) আমার শিক্ষা-গুরু।...'উদ্ভিদ-জ্ঞান' চারি পর্ব্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব্ব প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় পর্ব্ব ছাপা হইয়াছে, শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব্ব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু কবে হইবে—অথবা হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। প্রথম পর্ব্বে উদ্ভিদের স্থূলদেহরচনা ও দ্বিতীয় পর্ব্বে শ্রেণী-বিভাগ আলোচিত হইল। সূক্ষ্মরচনা, কার্য্যরচনা ও পুষ্পহীন উদ্ভিদের আখ্যায়িকা তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব্বে সন্নিবিষ্ট হইবে।...১লা ডিসেম্বর, ১৯২৩ সাল।—মুখবন্ধ।

পাঠ্য পুস্তক ঃ গিরিশচন্দ্র সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞানের কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কৃষি সোপান' (ইং ১৮৮৯), 'কৃষি পরিচয় (১৮৯০), 'প্রকৃতি পরিচয়' (১৮৯১) ও 'কৃষি দর্শনে'র (১৮৯৮) নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

মৃত্যু ঃ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

জীবনের ব্রত যথাশক্তি উদ্‌যাপিত করিয়া গিরিশচন্দ্র পূর্ণ শান্তিতে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৯ সনের ১লা জানুয়ারি, ৮৬ বৎসর বয়সে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু দেশবাসীর সমক্ষে সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও স্বদেশের কল্যাণকল্পে নিরলস কর্ম্মসাধনার যে দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বিনাশ নাই। "কীর্ত্তির্যস্য

স জীবতি”—নিজের কীর্ত্তির মধ্যেই গিরিশচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিবেন। আমাদের দেশে কৃষিবিদ্যার প্রসারের জন্য গিরিশচন্দ্র সুচিন্তিত পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শেষ পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সহিত কৃষিবিদ্যা শিক্ষার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াতে তাঁহার পরিকল্পনা স্থায়ী ভাবে কার্য্যকরী হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে ইহা তাঁহার একটি ব্যর্থপ্রচেষ্টা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু “গিরিশচন্দ্রের মত যে-সকল জীবনের মধ্য দিয়া জাতি গড়িয়া উঠে” বাহ্যিক সফলতা বিফলতার মাপকাঠি দিয়া তাঁহাদের সকল কাজের বিচার করা চলে না। আমাদের দেশে আজ যে অনেকের মনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে, দেশে সরকারী বেসরকারী নানা কৃষিশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে গিরিশচন্দ্রের আদর্শ পরোক্ষভাবে কতটুকু প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে তাহা বিচার করিবার সময় এখনও হয়ত আসে নাই। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে—১৯৪১, ১০ই আগষ্ট বঙ্গবাসী কলেজে তাঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে ভাষণ প্রদান করেন তাহাতে গিরিশচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলেন :—

“গিরিশ চন্দ্রের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ১৮৮৩ সাল হইতে। ঐ বৎসর মে, জুন, জুলাই মাসে আমি এডিনবরা হইতে আসিয়া লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ছাত্র হিসাবে ভর্ত্তি হই। তখন সিসেষ্টার কলেজে অধ্যয়নরত স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র বসু, ভূপালচন্দ্র বসু এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ হইত। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল।

গিরিশ চন্দ্রকে দেশবাসী, বৈজ্ঞানিক হিসাবে, শিক্ষক হিসাবে, ছাত্রবন্ধু হিসাবে, শিক্ষাবিদ্ হিসাবে ও জনসেবক হিসাবে হৃদয়-কন্দরে চিরদিনের জন্য শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। বঙ্গবাসী কলেজ তাঁহার অক্ষয় কীর্তি; তাঁহার স্বার্থত্যাগ, অকুণ্ঠিত সেবা ও স্বদেশহিতৈষণার জ্বলন্ত নিদর্শন। বাঙলার ইতিহাসে, আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে গিরিশ চন্দ্র বসু তাঁহার দান ও দৃষ্টান্তের দ্বারা অমর।

কিন্তু মানুষ গিরিশ চন্দ্রকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তিনি তাঁহার কর্মের চেয়েও সত্যই মহত্তর ছিলেন। বাহিরের লোকের আমরা কতটুকুই বা জানি।

গিরিশ চন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন বড়কর্তা স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী গ্রহণে আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি কোম্পানীর নোকরী এক কথায় প্রত্যাখ্যান করিয়া বঙ্গবাসী কলেজ সংস্থাপন করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন।

গিরিশ চন্দ্রের চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ছিল। কত দরিদ্র ছাত্র তাঁহার সাহায্য পাইয়াছে, কত পরিবার তাঁহার দান লাভ করিয়াছে, কত মেধাবী ছাত্র তাঁহার অনুগ্রহে সমাজের নানা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে—তাহার হিসাব তিনি কখনও রাখেন নাই, তাহার হিসাব কড়াক্রান্তিতে হয়ও না। দেশবাসী তাঁহার মত মানুষকে যদি স্মৃতিপথে না রাখে তবে অকৃতজ্ঞ জাতি বলিয়া কলঙ্কিত হইবে।

স্বদেশী আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনৈতিক আলোড়নে ছাত্রদের কতজনকে তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। বঙ্গবাসী কলেজ একাধিক বার রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত যুবক কর্মীর আশ্রয়স্থল ও স্নেহনীড় হইয়াছে। আজও মনে পড়ে কি সাহসিকতার সহিত তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত ছাত্ররা তাঁহার বিদ্যায়তনে ভর্তি হইলে তিনি তাহাদের সম্পর্কে দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি প্রকাশ্যভাবে যোগদান যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই ; কিন্তু রাজনীতির উদ্দেশ্য যদি দেশসেবাই হয়, তবে গিরিশ চন্দ্রের মত অকুতোভয় দেশসেবী কমই দেখা যায়।

আজিকার বাঙালীর নিকট, বিশেষতঃ তরুণ সমাজের নিকট, আমার আর একটি দিক বলবার আছে। তাহা এই মানুষটির সরল, নিরলস, আড়ম্বরহীন জীবনপ্রণালী। ঘড়ির কাঁটার সহিত মিলাইয়া জীবনের প্রত্যেকটি কার্য প্রতি দিন তিনি বিধিবদ্ধভাবে করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার দীর্ঘজীবন ও চরিত্রমাধুর্যের উৎস ছিল। বহুকাল সন্ধ্যাবেলা নির্ধারিত সময়ে তাঁহার সহিত গড়ের মাঠে বেড়াইয়াছি, তাহার কত স্মৃতি আজ মনে ভাসিতেছে। ইংরাজীতে যাকে বলে A man of strong personality গিরিশ চন্দ্র ছিলেন তাই। কখনও কোনো বিষয় সম্বন্ধে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জবাব দেওয়া ছিল তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি যাহা বলিতেন তাহার শুধু মাত্র একই অর্থ করা যাইত—হয়ত বা হাঁ, নয়ত বা না। ভাসা ভাসা জবাব, দু-কূল বজায় রাখার মত জবাব তিনি কোনো-দিন দিয়াছেন বলিয়া আমি শুনি নাই। আর তাঁহার পোষাক

পরিচ্ছদ! কে বলিবে তিনি সে যুগের সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত বিলাত-ফেরত ছাত্র! কে বলিবে তিনি প্রাণী ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অন্যতম ঋত্বিক ও ভারতীয় বহু গবেষকের গুরুস্থানীয়! কে বলিবে তিনি বাঙলার অন্যতম প্রধান বিদ্যায়তনের কর্ণধার! সামান্য একটি ধুতি ও সাদা টুইলের শার্ট পরিধান করিয়া তিনি সরলতার আদর্শে দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ছিলেন। যে কালের তিনি মানুষ, যে পদমর্যাদা ও আর্থিক আনুকূল্য তাঁহার ছিল তাহাতে ইহা কত বিরল ছিল তাহা সমবয়সী হিসাবে আমি বলিতে পারি। আমি এমন সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যনিষ্ঠ, আলস্যহীন, সংযমী ও বিলাসবিমুখ বাঙালী লক্ষ লক্ষ চাই, গিরিশ চন্দ্রের জীবনের আদর্শ যাহারা গ্রহণ করিয়া আমার এই দরিদ্র দেশের দুঃখ বিমোচনের বিভিন্ন পন্থা বাছিয়া লইয়া নিজ নিজ কাজে জীবন বিলাইয়া দিবে। গিরিশ চন্দ্রের মত জীবনের মধ্য দিয়াই জাতি গড়িয়া ওঠে; আপন সার্থকতার সন্ধান পায়। তাঁহার সাধনা ও স্বপ্ন সিদ্ধি লাভ করুক।"

গিরিশচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

গিরিশচন্দ্র প্রধানতঃ শিক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের প্রচারে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। এই পাঠ্য পুস্তকগুলিতেই তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা এবং মাতৃভাষায় তাহার সহজ প্রকাশ ক্ষমতার পরিচয় আছে। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সার্থক নিদর্শন তাঁহার 'বিলাতের পত্র' দুই খণ্ড। "ইংলণ্ডপ্রবাসী" গিরিশচন্দ্র

স্বদেশে যে-সকল লিখিয়াছিলেন, সেগুলি প্রথমে 'বঙ্গবাসী' পত্রে মুদ্রিত হইবার পর 'বিলাতের পত্র' নামে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রগুলি সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষকভাবে লিখিত; এগুলির স্থানে স্থানে তাঁহার গভীর স্বাজাত্যবোধের ও স্বাদেশিকতার পরিচয় সুপরিস্ফুট। শিক্ষা, সমাজ, সভ্যতা—নানা বিষয়ে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের তুলনা করিয়া তিনি উভয় দেশের দোষ ও গুণের যে সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন, বিলাতের কোন্ কোন্ গুণ গ্রহণীয় ও কোন্ কোন্ দোষ বর্জ্জনীয় তাহা প্রকাশে যে যুক্তি ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও তাঁহার উক্তিগুলি বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ হইয়া আছে। নিম্নে উদ্ধৃতিসমূহ হইতে পুস্তকখানির ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে :—

বিলাতী সভ্যতা।—আমার কোন পরিচিত বন্ধু একবার টাইম্‌স পত্রিকায় এই বলিয়া বিজ্ঞাপন দেন—"বিদেশী যুবাপুরুষ কোন ভদ্র পরিবার মধ্যে কিছু দিন থাকিতে ইচ্ছা করেন।" টাইম্‌স পত্রে এই বিজ্ঞাপন বাহির হইবার দুই দিন পরেই একদিন প্রাতঃকাল হইতে ৮টা পর্য্যন্ত তাঁহার ঘর চিঠিতে পূর্ণ হইয়া গেল। বোধ হয় চিঠির সংখ্যা দেড় শতের কম নহে। আমি সেই সকল চিঠি পড়িয়াছি, 'পিক্‌উইক্-পেপার' উপন্যাস প'ড়ে আমার যত না আমোদ হইয়াছিল, এই সব চিঠি পড়িতে তাহার চতুর্গুণ আমোদ হইল। প্রথমে দেখিলাম যে, দুই একখানি ব্যতীত সমস্ত চিঠিই স্ত্রীলোকদ্বারা লিখিত। পত্রবিভাগের কার্য্য বোধ হয় এখানে বাটীর গিন্নীদের উপর নির্ভর। সকল পত্রেই লেখা যে, আমার বাটীতে আসিলে যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং যত দূর সুখে রাখিতে পারি চেষ্টা করিব। অনেক পত্রেই লেখা যে আমার পরিবার মধ্যে এক, দুই বা ততোধিক

প্রাপ্তবয়স্কা রূপবতী কন্তা, ভ্রাতুষ্পুত্রী বা অন্ত কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক বাস করেন ;—আমরা সকলেই শীতবাত্যানুরাগী, আমাদের অনেকে প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্কা, আমরা সকলে আমোদ আহ্লাদে মনের সুখে কালাতিপাত করি। কেহ কেহ বা তাঁহাদের পরিবারস্থ নবযৌবনপূর্ণা স্ত্রীলোকদের বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিয়াছেন। আমাদের দেশে এখনও এত দূর সভ্যতা হয় নাই।

এই ত চিঠির এক দিক দেখিলে, অপর দিক দেখিলে এখানকার স্ত্রীলোকদের বুদ্ধির ও শিক্ষার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক পত্রে লেখা যে, আমার বাটী উচ্চ ও শুষ্ক স্থানে অবস্থিত, সম্মুখে ময়দান খোলা, লোকের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যে শেষ তালিকা লওয়া হয়, তাহাতে এই পল্লী খুব স্বাস্থ্যকর প্রমাণ হইয়াছে—ইত্যাদি। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে স্ত্রীলোকদের মধ্যেও সাধারণ শিক্ষা কত অধিক। (১ম ভাগ, পৃ. ৫০-৫২)

সমাজিক কৃত্রিমতা : ... সকল সমাজেরই দোষ গুণ আছে, তবে দোষ অগ্রে চক্ষে পতিত হয়। যদি কোন দোষের কথা লিখি, তাহা হইতে মনে করিও না যে প্রশংসার কিছু নাই। ইহাঁদের সমাজ অত্যন্ত কৃত্রিম (artificial) বলে বোধ হয়। আমি জানি আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, এদেশী মাতা তত ভাল বাসিতে জানেন না, এদেশী ভগ্নী, ভ্রাতার শুশ্রূষা করিতে তত তৎপর নহেন, এদেশী ভাই, ভগ্নীর প্রিয় নন, এদেশী পুত্রের সহিত পিতা মাতার তত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা ভালবাসা-মাখান ভাব নাই। এইরূপ সংস্কার কোথা হইতে হইল, বলিতে পারি না ; কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহার আর সন্দেহ নাই। এখানকার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, ভালবাসা ও সহৃদয়তাতে আমাদের অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট না হউন, কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন। তবে প্রভেদ এই, আমাদের পারিবারিক স্নেহ ও সহৃদয়তা মুখে প্রকাশ করি না, অথবা প্রকাশ করিতে জানি না; আমার ভগ্নী আমাকে ভালবাসেন, ভালবাসা মনে মনেই রহিল, আবশ্যক হইলে কার্য্যে প্রকাশিত হইবে; কিন্তু এ দেশের পারিবারিক স্নেহ প্রকাশের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হয়। প্রাতঃকালে প্রথম দেখা হইবার সময় পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভগ্নীর পরস্পর করমর্দ্দন বা স্নেহচুম্বন—প্রথা কেমন বোধ হয়? রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার সময়ও এই প্রথা। যদি ভ্রাতা, ভগ্নীর নিকট হইতে কোন একটা জিনিষ চাহিয়া পাঠাইলেন, প্রাপ্তিস্বীকার স্বরূপ ধন্যবাদ না দিলে, মহা অসভ্যতা হইল। ইহাকে কৃত্রিমতা না বলিয়া কি বলিব? ঘনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে যখন এরূপ, তখন দূর সম্পর্ক, বা নবপরিচিতের মধ্যে কত অধিক আড়ম্বর তাহা অনায়াসে বুঝিতে পার। তোমার সঙ্গে কোন লোকের আলাপ করিতে হইলে একজনের ত প্রথমে পরিচয় করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে উভয়েই পরস্পর করমর্দ্দন করিতে হইবে, এবং সেই সময়ে উভয়েই বলেন, "হা ডি ডু" (হাউ ডু ইউ ডু—how do you do); ইহার অর্থ, "তুমি কেমন আছ," কিন্তু এস্থলে ইহার কোন অর্থ নাই, ইহার উত্তর দিবার আবশ্যকও নাই, তবে সমাজের পদ্ধতি মত না চলিলে লোকের উপলব্ধি হইবে, সভ্য সমাজের রীতি নীতি এখনও তোমার শিক্ষা হয় নাই। কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলে এই সম্বোধন করিয়া হস্তকর্ষণ করিতে হয়। (১ম ভাগ, পৃ. ৫৩-৫৭)

বিলাতী-গাভী: ··· আমাদের প্রধান খাদ্য,—চাল, গম, ছোলা, মটর, শাকশবজি; কিন্তু ইংরেজের প্রধান খাদ্য,—

মাংস, মাখন, পনীর। কাজেকাজেই এখানকার কৃষিকার্য্যের প্রধান যত্ন, মাংস প্রস্তুত করা; অতএব রেডিং নগরের কৃষিমেলায় যে নানা জাতীয় ভেড়া, শূকর, গরু ইত্যাদি প্রদর্শিত হইবে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পার। এই সকল গৃহপালিত পশুর আকার ও শ্রী দেখিয়া বেশ বুঝিলাম, কেমন যত্নের সহিত তাহারা পালিত হয়। কিবা নধর গঠন, যেন গায়ে ঠোস্ মারিলে রক্ত পড়ে। সেই সময় আমাদের দেশের গরু বাছুরের দুর্গতি ও অযত্নের কথা মনে হইল। আমাদের দেশের অনেকানেক গৃহস্থ একপাল করিয়া গোরু রাখেন; ভাল খাইতে দিতে পারেন না; যে গাভীটি নবপ্রসব করিল, তাহারই সেই সময়ের জন্য চারিটি চারিটি খোল ভুষির বরাদ্দ হইল,—অবশিষ্টগুলি যে গরু, সেই গরুই রহিল,—ঠেলিলে পড়িয়া যায়, চক্ষুকোণে জলধারার রেখা,—গোশালা এক একটি ক্ষুদ্র নরকবৎ, দুর্গন্ধময়, গভীর কর্দ্দমবিশিষ্ট—সুগন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিয়া পড়ে, কাহার সাধ্য সে বিভীষিকাময়ী ভয়ঙ্করমূর্ত্তি গোশালার নিকট যায়? কিন্তু এখানকার পশুশালা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সিন্দূরটি পড়িলেও কুড়াইয়া লওয়া যায়, দুদণ্ড দাঁড়াতে ইচ্ছা করে। এখানে যেমন যত্ন, ফলও তদ্রূপ। এখানকার এক একটা গাভী দিনে দুইবারে অর্দ্ধমন বা ত্রিশ সের পর্য্যন্ত দুধ দিয়া থাকে; আমাদের দেশের গোরু যেরূপ দুরবস্থায় থাকিয়াও দুগ্ধ দেয়, সমধিক যত্ন ও আহার পাইলে, আমার বিশ্বাস, আমাদের গোরুও বিলাতের গাভীর ন্যায় দুগ্ধবতী হইতে পারে। মহাভারতে পড়িয়াছি, সেকালে ভারতবাসীর গাভীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল; —গাভী ষড়-ঐশ্বর্য্যশালিনী ভগবতী। প্রাচীন হিন্দুগণ গাভীকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত। গাভী গৃহস্থের অমৃত-ক্ষারিণী, মঙ্গলকারিণী, চতুর্বর্গফলদাত্রী ছিল,—কিন্তু এখানে আমাদের দেশের গৃহস্থের গাভী, নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িয়াছে। যদ্রূপ ভক্তি,

ফলও তদ্রূপ ;—গাভী দুগ্ধ হরণ করিয়াছেন। অযত্নে থাকিয়া সুরভি দুগ্ধ দিবেন কেন? যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। (১ম ভাগ, পৃ. ৭৭-৭৯)

কিউ-বাগান।—...বিলাতের রাজধানী লণ্ডন নগরে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে খোষগল্প ও আমোদ প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণে লোক-শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে সাধারণ লোকের মন প্রশস্ত করিবার জন্য, চক্ষু ফুটাইবার জন্য এমন সহজ উপায় খুব কমই আছে। যিনি একবার সাউথ কেনিংষ্টনের যাদুঘরটি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিয়াছেন, তিনি পৃথিবীর চারি দিক ভ্রমণ না করিয়াও সকল দেশের যাবতীয় আদর্শ-দ্রব্য দেখিয়াছেন বলিয়া গৌরব করিতে পারেন। ব্রিটিশ যাদুঘরে পেপাইরস (Papyrus) কাগজে চিত্রদ্বারা লেখা, তুলার কাগজে হাতে লেখা, তাল-পত্রে খন্তী-লেখা ও আজকালকার তাড়িৎ দ্বারা ছাপার লেখা পুস্তক, স্তূপ স্তূপ দেখিবে ;—দেখিলে মন কেমন অভাবনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়—যাহার কখনও মা সরস্বতীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহারও মন খুলিয়া দেবীপূজায় ভক্তি জন্মে। যে সকল লোক—বিশেষত যে সকল বরফনিভ ধবলকান্তি, ধন-যৌবন-বিদ্যা-পোষাক-গর্ব্বিণী বিলাতী রমণী অপাঙ্গ দৃষ্টিতে জগতের সম্বসারকেও যেন তৃণবৎ মনে করিয়া অভিমান-ভরে ভাবেন যে, এই ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্যজাতি মাত্রেরই তাঁহাদের ন্যায় পোষাক, তাঁহাদের ন্যায় আহার, তাঁহাদের ন্যায় ধরণ ধারণ, এবং তাঁহাদের ন্যায় ভাষা অবশ্যই হইবে ; ভিন্ন দেশে মনুষ্য ভিন্নরূপ হয় দেখিয়া যাঁহারা অধরের হাসি লুকাইতে পারেন না, এবং যাঁহারা ভিন্ন দেশের লোককে ভিন্ন প্রকার পোষাক পরিতে দেখিলে বিস্মিত হইয়া বলেন, "how funny it is! কি মজা, এদের চেহারা দেখ—এরা

আমাদের মত ইংরেজী কথা কহে না, আমাদের মত কাপড় পরে না—আপনাপনি হিলিবিলি করিয়া কি আবার বকে,"—সেই সকল ক্ষুদ্রহৃদয়া রমণীর "পদার্থ-ইতিহাস-যাদুঘরের" শত শত ভিন্ন ভিন্ন জীব জন্তু ও উদ্ভিদ্ দেখিয়া ক্ষুদ্র মন যে প্রশস্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ছবির ঘরটি বড় সুন্দর।—প্রেমিকের হাস্যময় ঢল ঢল মূর্ত্তি, হতাশের আক্ষেপময় বিশুষ্ক মূর্ত্তি ; ঘাতকের বিকট মূর্ত্তি ; আহতের ম্লানময় নিস্তেজ মূর্ত্তি ; ক্রোধান্ধ ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বিকম্পিত দেহ, ক্ষমাশীলের চারু সৌম্য কান্তি, বালক বালিকার কোমল কমনীয় দেহ—এ সকলি তোমার নয়নপথের পথিক হইবে। ঘটনাবলীরও নানারূপ চিত্র দেখিতে পাইবে ; কোথাও নৃশংস বিকট সংগ্রাম হইতেছে, নিয়ম নাই ক্ষমা নাই—যে যাহাকে বলে পারিতেছে, সে তাহাকে হত্যা করিতেছে ;—কোথাও শান্তিময় স্নেহময় পরিবারবর্গ ; কোথাও আনন্দময় সুখের বিলাস মন্দির,—তাহার পার্শ্বেই আবার দুর্ভর শোকময় মৃত্যু-শয্যা। স্বভাবের কেমন মনোহর দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে ;—নিবিড় অরণ্য, সুন্দর নদীর তীর, মনোরম হ্রদ, ভীষণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তরঙ্গময় সমুদ্র বক্ষ ;—এই সকল দেখিয়া সুপ্ত ইন্দ্রিয়ও বিকাশপ্রাপ্ত হয়। আবার স্ফটিক নির্ম্মিত গৃহে যখন বৈদ্যুতিক আলো দেখিবে, তখন তোমার মন একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িবে। লণ্ডনে এইরূপ আমোদের সহিত শিক্ষার স্থান আরও অনেক আছে। ইহাতে জনসাধারণের যে কত উপকার হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিও। বাগানের কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি ; বাগান সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। ভাই! স্ত্রীলোকের অধ্যবসায়, আগ্রহ ও কার্য্যকুশলতা যে কত দূর তাহা দেখ ; মিস নর্থ নামক একটি বিলাতের স্ত্রীলোক পৃথিবীর প্রায়

সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া সেই সেই দেশের প্রধান গাছ গাছড়া ও ফল ফুলের ছবি (Oil painting) স্বহস্তে আঁকিয়া আনিয়া এই বাগানে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে দান করিয়াছেন। একটি প্রকাণ্ড হলের প্রাচীরে সমস্ত ছবিগুলি সুন্দররূপে বসান হইয়াছে। ছবিগুলি এত ঠিক্ যে, যেন ঠিক্ সেই জিনিসটি। একটি ছবিতে কলার কাঁদি চিত্রিত দেখিলাম, প্রথম দেখিবা মাত্র সত্য সত্যই কলার কাঁদি বলিয়া ভ্রম হয়। একবার ভাবিয়া দেখ—একটি স্ত্রীলোক কত দূর করিতে পারে? যে দেশের স্ত্রীলোকের এত দূর অধ্যবসায় ও গুণপণা, সে দেশের সন্তানগণ কেন না বীর্য্যবান, যশোবান ও গুণবান হইবে? (১ম ভাগ, পৃ. ৯২-৯৬)

লোক-শিক্ষা।— ··ভাই বঙ্গবাসী! সকলে মিলিয়া একবার তারস্বরে উচ্চারণ কর—"শিক্ষা এবং জ্ঞানই সকল পরাক্রমের মূল।" ভারতবাসী! একবার দ্বেষ পরহিংসা ভুলিয়া, পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া জগৎকে দেখাও, যে ভারত এক সময়ে জগতের নেতা ছিল, জগৎ যে ভারতের আলোকে আলোকিত হইয়াছিল, সে ভারত আজি অবস্থা পরিবর্ত্তনে, পাশ্চত্য-প্রদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পশ্চাৎপদ নহে। যদি জগতকে এই সুফল দেখাইয়া নিজ গৌরব রক্ষা করিতে চাও, ইউরোপের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর;—ইংরাজ-রাজের সন্নিকর্ষ সৌভাগ্য মনে করিয়া, বহুদর্শিতা দ্বারা প্রতিপন্ন জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ লোক-শিক্ষা বিধান জন্য বদ্ধপরিকর হও। অসার তপ-জপের কাল আর নাই। শিক্ষার কাল উপস্থিত। যদি জীবন-সমরে জয় লাভ করিতে চাও, যদি পুনরায় জগতে জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে আকাঙ্ক্ষা থাকে, এই সুযোগ ত্যাগ করিও না। যদি অদৃষ্টে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ইংরাজ-সন্নিকর্ষ

শুভাদৃষ্ট জ্ঞানে ইংরাজি-শিক্ষায় আলোকিত হইয়া স্বদেশকে জ্ঞানালোকে পুনরুজ্জ্বল কর। হ্যাট্ কোট্ পরিয়া, চুরাট টানিয়া, টাওেম চাপিয়া, সহধর্ম্মিণীকে গাউন পরাইয়া বৃথা বাক্যব্যয় করিলে আর চলিবে না। কার্য্যের সময় উপস্থিত,—বিলাতী বিলাসিতার দিকে দৃষ্টি কমাইয়া, একবার ইংরাজ জাতির জাতীয় জীবনের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও—দেখিবে, জাতীয় শিক্ষাই ইংরাজ জাতির গৌরবের মূলভূত কারণ।" (১ম ভাগ, পৃ. ১৬৫-৬৬)

বিলাতী স্নানযাত্রা।—…আমরা প্রত্যহ দল বাঁধিয়া প্রাতে ৭৷৮টার সময় "পিয়ারে" (pier) স্নান করিতে যাইতাম। ৭টা হইতে দশটা পর্য্যন্ত ঐরূপ স্থানে অবগাহন করিতে পারা যায়। পিয়ারে স্নান—কোমলাঙ্গীদের অধিকার নাই,—পুরুষের একচেটে। …পুরুষপ্রবর ক্রমে পিয়ারে উপস্থিত হইলেন,—এখানে সমাজ নাই, নীতি নাই,—প্রধান অপ্রধান, ছোট বড় সকলের অমনি কটীর বসন খসিয়া পড়িল; এখানে নীতি-বীরের ভ্রূকুটী-কুটিল নেত্রে কেহ ভীত নহে—সমাজের কৃত্রিম-শৃঙ্খল যেন যাদুমন্ত্রে ভঙ্গ হইল। প্রভুরা প্রকৃতির যে পরিচ্ছদে পৃথিবীতে প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই পরিচ্ছদে অবগাহনার্থ সমুদ্র-জলে প্রবেশ-উন্মুখ হইলেন। ইং-পুরুষ-পুঙ্গবের সেই অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি, উপরে অনন্ত নীল-আকাশের সূর্য্যদেব দেখিলেন, সম্মুখে তোয়োনিধি নিরীক্ষণ করিলেন—তথাচ ভ্রূক্ষেপ নাই। তার পর জলে নামিয়া সন্তরণ আরম্ভ;— এ সন্তরণে বড়ই আরাম। স্নান শেষ হইল; পুনরায় সাহেব বসন পরিধান করিলেন; তখন পিয়ারস্থ প্রহরীকে নির্দ্দিষ্ট দর্শনী দিয়া সাহেব চুরট-ধূম-পান করিতে করিতে নিজ নিজ আবাসমুখে আসিতে লাগিলেন। এই ত গেল 'পিয়ারে' স্নান।

তার পর, সাধারণের অবগাহন। এখানে মেয়ে পুরুষের সমান অধিকার। দশটা বাজিল; সূর্য্যকিরণ ঈষৎ প্রখর হইয়া উঠিল, জগৎ হাসিতে লাগিল; তখন সাধারণ স্নানের একটা মহারোল উত্থিত হইল। সমুদ্রকূলে পাল্কী-গাড়ীর মত কতকগুলি গাড়ী আছে; দর্শনী দিয়া একখানি গাড়ীতে উঠ,—অমনি একজন ঠেলিয়া ঠেলিয়া সেই গাড়ীখানিকে জলের নিকট দিয়া আসিবে। তুমি গাড়ীর মধ্যে নিজ বসন খুলিয়া এক কৌপীন পরিধান কর; তখন সেই অদ্ভুত কৌপীনধারী যোগীর বেশে গাড়ীর সিঁড়ি দিয়া জলে নামিয়া তরঙ্গমালার সহিত ক্রীড়া কর। স্ত্রী-পুরুষ, কোমলাঙ্গ কর্কশাঙ্গ,—উভয়েই এইরূপে জলকেলী করিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন সেই পৌরাণিক অপ্সর-কিন্নরগণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ম্লেচ্ছদেশে আবির্ভূত হইয়া জল-বিহার আরম্ভ করিয়াছেন।......

আমি দুর্ব্বল মূর্খ বাঙ্গালী—বিজেতা-জাতির চরিত্র সমালোচনে আমার অধিকার নাই,—তবে আজ হৃদয়ে স্বতই এই ভাবের উদয় হয়, "হে সভ্য ইংরাজ, আজ এ কি দেখিলাম! যাহা দেখিলাম, তাহার সমস্ত বর্ণনা করিতে পারিলাম না বটে,—কিন্তু সে ভীষণ লোমহর্ষণ দৃশ্য এ হৃদয়পট হইতে অন্তর্হিত হইবে না। ইংরেজ! তুমি ভারতে গিয়া ভারতবাসীর হাঁটুর উপর কাপড় দেখিয়া লজ্জায় মরিয়া যাও,—আজ তোমরা শত শত নরনারী, একত্রে সম্মুখে সম্মুখে যে পোষাক পরিধান করিয়া অবস্থিতি করিতেছ, তাহা দেখিয়া কি লজ্জা বোধ হয় না? ইংরেজ! তোমাদের চরিত্র আমি যত দূর বুঝিলাম, তাহাতে মনে হয় তোমরা বাহ্য-দৃষ্টে বেশ সুন্দর, কিন্তু ভিতরে ময়লা—ভিতরে তোমরা বড়ই অসভ্য।" (২য় ভাগ, পৃ. ৪৪-৪৮)

থিয়েটার।-- এই রেলওয়ে-টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের কালে আজ জনবুলের প্রাণ, যক্ষের প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থ-পিপাসায় ইংরেজের ছাতি কেবল শুকাইতেছে, লোভে রসনা লহলহ করিতেছে —অন্য কথা নাই, অন্য চিন্তা নাই, অন্য ধারণা নাই—কেবল অর্থ, অর্থ, অর্থ; ইংরেজের জপমন্ত্র—অর্থ; ইংরেজের প্রাণের প্রাণ—অর্থ; ইংরেজের যীশুখ্রীষ্ট, অর্থ ইংরেজের সংসারের সার সুখ। সর্ব্বমত্যন্ত-গর্হিতম্। অনবরত একভাবে একদৃষ্টে অর্থের দিকে সজোর দৃষ্টি রাখায়, ইংরেজ অপর দিকে আর তাদৃশ দেখিতে পান না, দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, দেখিলেও আর তাহাতে তাঁহার তত তৃপ্তি হয় না। সমাজের উন্নতি-অবনতির দিকেও ইংরেজ আর তাদৃশ দৃষ্টি রাখিতে পারেন না; সমাজ-গ্রন্থি শিথিল হইলেও ইংরেজ তাহা বুঝেন না। ইংরেজের সাবধান হওয়া উচিত। (২য় ভাগ, পৃ. ৪৯-৫০)

পালেমেণ্টের অবকাশ কালে।— মিশর-বিপ্লব লইয়া আজকাল এখানে কিরূপ বক্তৃতা, কিরূপ ছড়াকাটাকাটি চলিতেছে, একবার দেখা যাউক। এক্ষণে মিশরের সুশাসনভার ইংরেজ স্কন্ধে লইয়াছেন। "ছুঁচ হইয়া প্রবেশ করা ও ফাল হইয়া বাহির হওয়া" —এই নীতি জনবুলের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয়। মিশরের যেরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা, তাহাতে আধুনিক সভ্যতার খাতিরে কিছু দিনের জন্য মিশরের উপর হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসিদ্ধ এবং ইহা অপেক্ষা শান্তি রক্ষার আর সদুপায় নাই,—এই বলিয়া দরিদ্র মিশরকে ইংরেজ সভ্যতা-আলোকে আলোকিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন সুদনে মিশর সৈন্যের পরাজয় এক প্রকার ইংরেজরাজেরই পরাজয় বলিতে হইবে; -এই কথার ভাণ করিয়া মিশর-বাজেয়াপ্তীর সুর উঠিতেছে। কিন্তু উন্নতিশীলদল এ সুরে কর্ণপাত করিতেছেন

না ; তাঁহারা বলেন, "এখনই সমগ্র ব্রিটিশ রাজ্যে সূর্য্য অস্ত হয় না, আরও অধিক রাজ্য বিস্তার হইলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা,—বিশেষত ইহাতে দেশীয় ধনেরও অপব্যয় হইবে"—এই বলিয়া উন্নতিশীল উদারনৈতিক দল আপন গরিমা করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু আমরা ভারতবাসী—ঘরপোড়া গরু,—আমরা সিন্দুরে-মেঘে ভীত হই,—এ সকল বাক্যের মহিমা তত দূর বুঝি না।......

ভাই! বিলাতী রাজনীতির কথা আর অধিক বলিতে চাহি না—কেবল এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ইহা এক রকম দোকানদারী। আপন দলের প্রাধান্য কিসে বৃদ্ধি হয়, রাজনীতিবিৎ পণ্ডিতদের ইহাই একমাত্র ভাবনা ও চেষ্টা। (২য় ভাগ, পৃ. ৬৫-৬৭)

সংযোজন : ১৩২৬ সালের ৬ই-৮ই বৈশাখ হাওড়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়; গিরিশচন্দ্র ইহার বিজ্ঞান-শাখায় সভাপতিত্ব পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১২

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

১৭২০—১৭৮১

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩৷১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৯

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
৭.২—২২।৬।১৯৫২

কুল-পরিচয়

রামপ্রসাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কার অনেকটা কুলক্রমাগত এবং তিনি স্বয়ং বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে গৌরবের সহিত একাধিক বার বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা,[১]

ধনহেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল, 'কৃত্তিবাস'তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত, প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশসমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব, ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন 'রামেশ্বর,' দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ 'রামরাম,' মহাকবি গুণধাম, সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে, কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

বাঙ্গলার বৈদ্যসমাজের প্রামাণিক কুলগ্রন্থ হইতে রামপ্রসাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের সম্পূর্ণ নামমালা অধুনা সহজেই উদ্ধার করা যায়। বিক্রমপুরনিবাসী গোপালকৃষ্ণ রায় 'অম্বষ্ঠসম্বাদিকা' নামক গ্রন্থে (১২৫৬ সনের ১৯ ফাল্গুন প্রকাশিত, পৃ. ৬৯) সর্ব্বপ্রথম রামপ্রসাদের উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ সহ বিশেষজ্ঞের ভাষায় তাঁহার কুলনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন :—

ধলহণ্ডীয়-বংশীয়ো হালীশহরবাসকৃৎ।
রামপ্রসাদসেনোঽভূত্তত্ত্বজ্ঞঃ সাধকঃ সুধীঃ॥

১। 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' ১২৬০ সাল ২০ চৈত্র, ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত, পৃ. ১৫০-১, ১৭৩ ও ১৯১-২। এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই দুর্লভ সংস্করণের এক খণ্ড রক্ষিত আছে। পৃ. ৫১-২ কিঞ্চিৎ পাঠান্তর আছে :—

সেই বংশ সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্ব গুণযুত, ছিল কত কত মহাশয়।
*　　　　*　　　　*
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার, কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া।

প্রসাদাজ্জগদম্বায়াস্তত্ত্বজ্ঞানান্বিতানি বৈ।
রচিতানি সুগীতানি তেনাখ্যানামপূর্ব্বকৈঃ ॥
ন ভূতানি ন ভাব্যানি বর্ত্তমানানি নৈব চ।
তৎসদৃশানি গীতানি চান্যৈঃ কৈশ্চিৎ কথঞ্চন ॥

মধ্যযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য টীকাকার ভরত মল্লিক ১৫৯৭ শকাব্দে 'চন্দ্রপ্রভা' নামে সুবৃহৎ কুলপঞ্জী রচনা করিয়াছিলেন (১২৯৯ সনে বিনোদলাল সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ৪৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) এবং কয়েক বৎসর পরে 'রত্নপ্রভা' নামক গ্রন্থে তাহার সারসঙ্কলন করেন (১২৯৮ সনে প্রকাশিত)। উভয় গ্রন্থেই একটি পৃথক্ 'ধলহণ্ডীয়প্রকরণ' দৃষ্ট হয় (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ৫০-৫৯, রত্নপ্রভা, পৃ. ১৯-২২)। রাঢ়-বঙ্গের সর্ব্বত্র ধন্বন্তরিগোত্র বীজী পুরুষ বিনায়ক সেনের বংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইত। বিনায়কের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ কৃত্তিবাস (বিনায়ক—রোষ—নারায়ণ—সাণ্ড—সরণি—কৃত্তিবাসাঃ)। কৃত্তিবাসের পুত্রেরা আদি স্থান রাঢ়ান্তর্গত মালঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া 'ধলহণ্ডগোষ্ঠীং সমাশ্রিতাঃ,' তদবধি মালঞ্চের পরেই ধলহণ্ডে সেনবংশের একটি প্রসিদ্ধ সমাজ গড়িয়া উঠে। রামপ্রসাদ সুতরাং কৃত্তিবাসকেই আদি পুরুষ ধরিয়াছেন। রামপ্রসাদের পিতামহ রামেশ্বরের নাম ভরত মল্লিক উল্লেখ করিয়াছেন (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ৫৫, রত্নপ্রভা পৃ. ২১)—তিনি ছিলেন কৃত্তিবাসের অধস্তন নবম পুরুষ (কৃত্তিবাস—রত্নাকর—নিত্যানন্দ—জগন্নাথ — যদুনন্দন — রঞ্জন — রাজীবলোচন—জয়কৃষ্ণ—রামেশ্বর)। বিনায়ক হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত ১৪ পুরুষের পারিবারিক বিবরণ ভরত মল্লিক যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—এই সকল সমৃদ্ধ উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে রামপ্রসাদের উক্তির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ভরত মল্লিকের লেখা হইতে জানা যায়, রামেশ্বরের পিতার আমল হইতে বংশে দৈন্যদশা উপস্থিত হইয়াছিল। 'দুর্দৈবদৈন্যতঃ' রামেশ্বরের সহোদরা ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল 'কুমারহট্টবাসী' জগদীশ দাসের সহিত এবং অনুমান হয়, তৎসূত্রে রামেশ্বরই প্রথম কুমারহট্টে বাস স্থাপন করেন। কুমারহট্ট সপ্তগ্রাম সমাজের অন্তর্গত। মূল রাঢ়ীয় সমাজের কুলীনেরা অনেকে 'ধলণ্ডীয়' সেনবংশকে নিষ্কুল বলিয়া লিখিয়াছেন (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ১৩; রত্নপ্রভা, পৃ. ৩), কিন্তু ভরত মল্লিক স্বয়ং তাহা স্বীকার করেন নাই।[২] রামেশ্বর চায়ুদাসবংশীয় সম্ভ্রান্ত রামেশ্বর বাচস্পতির প্রথম পক্ষের তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব দ্বিতীয় পক্ষে বাচস্পতির চতুর্থ কন্যাকে বিবাহ করেন (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২৬৮, রত্নপ্রভা, পৃ. ৬৬)। ভ্রাতৃদ্বয়ের এই সম্বন্ধ ভরত মল্লিক 'কুলোচিতম্' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। লক্ষ্য করা আবশ্যক, উক্ত বাচস্পতি ভরত মল্লিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন; বাচস্পতির পিতৃব্যপুত্র গোবিন্দ কবিরাজ প্রথম পক্ষে ভরত মল্লিকের সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন (ঐ-ঐ)। সুতরাং রামেশ্বর সেন ভরত মল্লিকের এক পুরুষ পরবর্ত্তী ছিলেন।

২।
ধলণ্ডীয়-নরট্টীয়া নাধুনা কুলবিশ্রুতাঃ।
এষাং নিবাসসম্বন্ধা রাঢ়ে প্রায়ো ন সন্তি হি।
অমূলকৈরবিজ্ঞাতৈঃ সম্বন্ধা বহবোঽপি হি।
ইত্যুক্তং জগদীশেন হৃস্তং নৈতন্মতং মম।
তেষাং হি পূর্ব্বপুরুষা বিখ্যাতাঃ কুলবত্তয়া।
ইদানীমপি তে জ্ঞাতা বহুভিঃ পূর্ব্বনামতঃ। (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ১৩)

জন্ম-মৃত্যুর কাল

রামপ্রসাদের সঠিক জন্মতারিখ কেহই লিপিবদ্ধ করেন নাই এবং অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৭৭৭ শকের ভাদ্র মাসে শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত কালীকীর্ত্তনের সংস্করণে সর্ব্বপ্রথম ১৬৪০-৪৫ শকাব্দের মধ্যে (১৭১৮-২৪ খ্রী.) রামপ্রসাদের জন্ম অনুমিত হইয়াছে (ভূমিকা, পৃ. ৵০)। পরবর্ত্তী সমস্ত লেখকই প্রায় একবাক্যে নির্ব্বিচারে তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহই এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র প্রমাণসূত্র নির্দ্দেশ করেন নাই।[৩] কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের লেখাই এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। রামপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে মাত্র তিন জন উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছেন—সর্ব্বাগ্রে গুপ্তকবি, তৎপর দয়ালচন্দ্র ঘোষ (১২৫৯-৯১ বঙ্গাব্দ) ও সর্ব্বশেষে অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।[৪] গুপ্তকবি ১২৬০ সনের ১লা পৌষসংখ্যা সংবাদ প্রভাকরে লিখিয়াছেন (পৃ. ৯):—"পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল আমরা রামপ্রসাদি পদ্য

৩। কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ (১৭৮৪ শকাব্দা)—জীবনবৃত্তান্ত, পৃ. ৶০; দয়াল ঘোষের প্রসাদ-প্রসঙ্গ—জীবনচরিত (১ম সং, পৃ. ৪১, ২য় সং, পৃ. ৬৯) প্রভৃতি।

৪। সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০ সন, ১লা আশ্বিন, ১লা পৌষ ও ১লা মাঘ-সংখ্যা এবং ১২৬১ সন ১লা চৈত্র-সংখ্যায় গুপ্তকবির লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। দয়াল ঘোষের 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ,' ১ম সং, ২৫ বৈশাখ ১২৮২ এবং ২য় সং, ১লা মাঘ ১২৮৩। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে কোন নূতন কথা নাই। অতুলবাবুর রামপ্রসাদ ১লা বৈশাখ ১৩৩০ সনে প্রকাশিত—এই বিরাট্ গ্রন্থ একটি অরণ্যবিশেষ এবং বহু নূতন তথ্য ইহাতে অশেষ পরিশ্রমে সঙ্কলিত হইলেও পদে পদে পথভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। অতুলবাবু ১৩৩৫ সনের ৩১ চৈত্র স্বর্গত হইয়াছেন।

সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি," অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই তিনি রামপ্রসাদ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। তৎকালে রামপ্রসাদের পুত্র পৌত্রাদি বহু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন জীবিত ছিলেন, যাঁহাদের নিকট গুপ্তকবি অনায়াসে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 'আকরস্থান হইতে মূল পুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া' তিনি 'কালীকীর্ত্তন' প্রথম মুদ্রিত করেন (সা-প-প, ৪৯, পৃ. ৫৫-৬৩)। দুঃখের বিষয়, গুপ্তকবি পুস্তকাকারে রামপ্রসাদের জীবনী ও রচনা ইচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।[৫] রামপ্রসাদ সম্বন্ধে গুপ্তকবির লেখা যেটুকু মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার প্রামাণ্য বিনা কারণে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। রামপ্রসাদের জন্ম-মৃত্যুর কাল নির্দ্দেশ করিয়া তিনি এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন (সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ৯) :—"৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহার পূর্ব্বক নিত্যধাম যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবেক না।" গুপ্তকবি লিখিয়াছেন, শ্যামাপ্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন তাঁহার মৃত্যু হয়। এবিষয়ে অতুল বাবু একটি অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করেন যে, রামপ্রসাদের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পুরুষানুক্রমে শ্যামাপূজার পর-দিন অনুষ্ঠিত হইয়াছে (রামপ্রসাদ, জীবনী, পৃ. ১০৫ পাদটীকা—পরিশিষ্টে পৃ. ২৫৪ "বৈশাখী পূর্ণিমায়" দেহরক্ষার কথা অমূলক)। গুপ্তকবি ভারতচন্দ্রাদি কবিদের জন্ম মৃত্যুর কাল সাবধানে লিপিবদ্ধ করিতে

৫। ১৭ অক্টোবর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের 'সংবাদ-প্রভাকরে' রামপ্রসাদের জীবনচরিত ও কবিতা সকল 'টীকা সহিত পুস্তকাকারে' প্রকাশ করার বিজ্ঞাপন বাহির হয়।…"এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বিংশতি বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি…।" কার্য্যতঃ তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

চেষ্টা করিয়াছেন—এ স্থলেও তাঁহার ভাষা হইতেই বুঝা যায়, তিনি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। স্থূলভাবে ৭০-৭৫ বৎসর না লিখিয়া তিনি হিসাব করিয়াই লিখিয়াছেন '৭২ বৎসরের অধিক হইবে না'। গণনাদ্বারা পাওয়া যায়, ১১৮৮ বঙ্গাব্দে ৩ কার্ত্তিক মঙ্গলবার (১৬ অক্টোবর ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে) প্রায় ২৫ দণ্ড পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশী ছিল, তৎপর অমাবস্যায় শ্যামাপূজার উৎকৃষ্ট কাল। তৎপরদিন বুধবার রামপ্রসাদের মৃত্যু ধরিয়া গুপ্তকবির প্রবন্ধ রচনাকালে ঠিক ৭২ বৎসর পূর্ণ হয়। এই তারিখই যে গুপ্তকবির গবেষণালব্ধ অভ্রান্ত নির্ণয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, যদিও তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ তিনি লিখিয়া যান নাই। মৃত্যুকালে রামপ্রসাদের বয়স ৬০ বৎসরের 'কিঞ্চিৎ' বেশী হইয়াছিল—১১২৭ সনে জন্ম ধরিলে বয়স হয় ৬১-২ বৎসর। খুব সম্ভবত: ঐ সনেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল (১৬৪২ শকাব্দ, ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ), নিশ্চিতই তাহার পূর্ব্বে নহে এবং ১১২৮ সনের পরেও নহে।[৬] ঠিক ১৬৪২

৬। গুপ্তকবির সূক্ষ্মনির্দ্দেশ স্থূলে পরিণত হইয়া ১৬৪০-৪৫ শকাব্দে দাঁড়াইয়াছে এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, পরবর্ত্তী কোন লেখকই ইহা সাবধানে লক্ষ্য করেন নাই। অতুলবাবু প্রভাকরের এই সংখ্যা স্বয়ং দেখিতে পারেন নাই—তাঁহার নিকট প্রবন্ধের অনুলিপি প্রেরিত হইয়াছিল এবং তাহা 'সম্পূর্ণ আকারে' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮৪০ শক, আষাঢ় হইতে আশ্বিন সংখ্যা) এবং 'রামপ্রসাদ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে (পৃ. ২২১-৪৩) প্রকাশিত হয়। কিন্তু কি শোচনীয় বিড়ম্বনা—প্রেরিত অনুলিপিতে সুদীর্ঘ ৪ পৃষ্ঠা (৯-১২) সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে! ফলে, অতুলবাবুর আলোচনার অনেকাংশ (পৃ. ৩৭৬-৮৯) পণ্ডশ্রম হইয়াছে। তিনি যে একটি ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া ১১৮১ সনে মৃত্যুকাল নির্ণয় করিয়াছেন (পৃ. ৩৭৯-৮১), গুপ্তকবি এক শতাব্দী পূর্ব্বে তদপেক্ষা দৃঢ় প্রমাণসূত্র বহু পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কালক্রমে প্রবাদ অসম্ভব আকার ধারণ করে—যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামপ্রসাদের 'পৌত্রের মুখে' শুনিয়া তাঁহার বয়স ১১২ বৎসর স্থির করিয়াছিলেন (রামপ্রসাদ, ২য় সং, পৃ. ৩৮১)! অর্থাৎ সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান রামমোহনের জন্মকালে রামপ্রসাদের বয়স হয় প্রায় ১০০ বৎসর !!

শকে জন্মের কথা কৈলাসচন্দ্র সিংহও 'বহুযত্নে' জানিতে পারিয়াছিলেন (সাধকসঙ্গীত, ১ম সং, ১ম ভাগ, অবতরণিকা, পৃ. ২৭), কিন্তু তাঁহার সূত্রটি তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই।

রামপ্রসাদের এই কালনির্ণয়ের সমর্থন পারিবারিক ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়—আমরা দুইটি প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি। ভরত মল্লিক রত্নপ্রভায় রামেশ্বর সেনের পুত্র-কন্যার উল্লেখ করেন নাই, অথচ রামেশ্বরপত্নীর ছোট ভগিনীর (অর্থাৎ রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার) কন্যার বিবাহ উল্লেখ করিয়াছেন (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ৫৫, ২৭২; রত্নপ্রভা, পৃ. ২১, ৫৮)। সুতরাং বুঝা যায়, রত্নপ্রভা রচনাকালে (প্রায় ১৬৮০ খ্রী) রামরাম সেন বাল্য অতিক্রম করেন নাই। ১৬৭০ সনে রামরামের জন্ম ধরিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিধিরামের জন্ম হয় ১৭০০ সনে কিম্বা কিছু পরে (নিধিরামের প্রপৌত্র গঙ্গাচরণ কে. এম. ব্যানার্জ্জির, ১৮১৩-৮৫ খ্রীঃ, সহাধ্যায়ী ছিলেন—সা-প-প, ৫২, পৃ. ২ দ্রষ্টব্য)। নিধিরামের সহিত রামপ্রসাদের বয়োব্যবধান প্রায় ২০ বৎসর। পক্ষান্তরে, রামপ্রসাদ ২২ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন এবং তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের পুত্র রামমোহনের জন্ম প্রায় ১৭৭০ খ্রীঃ (ঐ, ঐ, পৃ. ৭)। রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ নাই। রামপ্রসাদের বহু কবিতা দুর্ব্বোধ্য। "নলিনী নবীনা মনোমোহিনী" শীর্ষক গানের একটি অংশ এই—"সোম-মৌলিপ্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম, ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কর্ম্মনাশা।" এই অদ্ভুত পঙ্‌ক্তির প্রকৃত অর্থ আমাদের অজ্ঞাত। বাহ্যতঃ এ স্থলে পাঁচটি গ্রহের নাম দৃষ্ট হইতেছে—সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও রবিজ অর্থাৎ শনি। আমাদের মনে হয়, কবি তাঁহার জন্মকালীন গ্রহসংস্থান অংশত উদ্ধার করিয়া এই হেঁয়ালী রচনা করিয়াছেন—'রবিজ মঙ্গলধাম' পদের অর্থ হয় শনিগ্রহের

মঙ্গলগৃহে (মেষে বা বৃশ্চিকে) অবস্থিতি এবং 'ভজে বুধ বৃহস্পতি' অর্থাৎ বুধ স্বগৃহে বৃহস্পতিযুক্ত। ইহা এক অতি বিস্ময়কর ঘটনা যে, ১১২৭ সনের আশ্বিন মাসে বস্তুতই শনি বৃশ্চিকরাশিতে এবং বৃহস্পতি কন্যারাশিতে বুধের সহিত অবস্থিত ছিল এবং ১১১২ সালের পর এই গ্রহসংযোগ উক্ত শতাব্দীতে আর কোন বৎসর ঘটে নাই। সুতরাং ১১২৭ সনের আশ্বিন মাসে রামপ্রসাদের জন্ম সূক্ষ্মতরভাবে নির্ণয় করার প্রলোভন আমরা ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

কর্ম্মজীবন

রামপ্রসাদ দারিদ্র্যবশতঃ চাকরী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু অত্যল্পকাল মাত্র। তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মজীবন বর্ণনা করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন ঃ—('সংবাদ প্রভাকর,' ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ২-৩)

"রামপ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতাস্থ বা তন্নিকটস্থ কোন বিখ্যাত ধনির গৃহে ধনরক্ষকের অধীনে এক মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বিষয়বাসনা-বিহীনতা জন্য তৎকর্ম্মে তাঁহার মনের অভিনিবেশ মাত্র ছিল না, এ কারণ তিনি তহবিলদারের প্রিয় হইতে পারেন নাই, সর্ব্বদাই উভয়ের মধ্যে বাক্‌কলহ ও বিবাদ হইত, সেন কবির চাকরি করা কিছু উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত ছিল না, তিনি মানসিক সঙ্কল্প পূর্ব্বক যে পরম প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন শুদ্ধ তাঁহারি কার্য্য করিতেন, মানব প্রভু বিরক্ত হইলে উপস্থিত পদে বিপদ হইবে সে দিকে দৃক্‌পাতো করিতেন না, প্রতিদিবস নিয়মিত কালে কার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া খাতার পাতা খুলিয়া আগা গোড়া শুদ্ধ "শ্রীদুর্গা" "শ্রীদুর্গা" এই নাম লিখিতেন, এই প্রকারে যখন খাতার সমুদয় পাতা কেবল

"দুর্গানামে" পরিপূর্ণ হইল, তখন সর্ব্বশেষে এই একটি গান লিখিয়া বসিলেন। যথা—

"আমায় দেও মা তবিল্‌দারী।
আমি নিমকৃহারাম্ নই শঙ্করী॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভঁাড়ার জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখো তাঁরি॥ ১
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়্‌গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল, চরণ ধুলার অধিকারী॥ ২
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তোমা পেতে পারি॥ ৩
প্রসাদ বলে এমন্ পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত, পদ পাইতো, সে-পদ লোয়ে বিপদ সারি॥ ৪

খাতার শেষ পত্রে এই কবিতা লিখিত হইলে তহবিলদার সেই খাতা দৃষ্টি করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যগ্র হইয়া আপনার প্রভুর নিকট কহিলেন, "মহাশয় একটা পাগল ও মাতালকে বিশ্বাসপূর্ব্বক কর্ম্ম দিয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! দেখুন এমন সুন্দর পাকা খাতাখানা একেবারে নষ্ট করিয়াছে, ইহাতে অঙ্কপাতমাত্র নাই, কেবল পাগলামি করিয়াছে ইত্যাদি" উক্ত প্রভু তচ্ছ্রবণে খাতার আগাগোড়া সকল পাতা বিলক্ষণরূপে বিলোকন ও "আমায় দেও মা তবিলদারি" এই পদটি সমুদয় তিন চারি বার পাঠ করত: অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খাজাঞ্চিকে কহিলেন "তুমি পাগল ও মাতাল বলিয়া কাহার উপর অভিযোগ করিতেছ? এ ব্যক্তিতো কাঁচা কর্ম্ম করিয়া পাকা খাতা নষ্ট করে নাই, পাকা খাতায় পাকা কর্ম্মই

করিয়াছে, তুমি কথার ঈঙ্গিতে ও ভাবের ভঙ্গিতে এই সঙ্গীতের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার নাই, আর তুমি বিষয়মদে মত্ততা জন্য ইঁহাকে চিনিতে পার নাই, রামপ্রসাদ সেন সামান্য মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ দেবী পুত্র, অতি সাধু ব্যক্তি" পরে অতি প্রিয়বাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কবিরঞ্জনকে কহিলেন, "রামপ্রসাদ! তুমি যে পদে পদার্পণ করিয়াছ তাহাতে এ পদে বদ্ধ রাখায় কেবল তোমারি বিপদ করা হইতেছে, তুমি যাবজ্জীবন এই সংসার কাননে বিচরণ করিবে আমি তাবৎকাল তোমাকে ৩০ ত্রিশ মুদ্রা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিব* তোমার আর ক্ষণকাল এখানে থাকিবার আবশ্যক করে না, যাও তুমি এখনি আপনার গৃহে গিয়া স্বকার্য্য সাধন কর।" (*পাদটীকা—এই স্থলে দুই প্রকার প্রবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন, খিদিরপুরস্থ ৺দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন, কলিকাতাস্থ নবরঙ্গ কুলপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট মুহুরিগিরি কর্ম্ম করিতেন)।

এই মাসিক বৃত্তি ব্যতীত "নানা স্থান হইতে নানা ব্যক্তি যাঁহারা সংকীর্ত্তনাদি নানা বিষয়ক গীত লইতে আসিত তাঁহারা কালীর ও কবির প্রণামিস্বরূপ অনেক অর্থ ও বহুপ্রকার দ্রব্যাদি অর্পণ করিত।" (ঐ, পৃ. ৩) কিন্তু রামপ্রসাদের দারিদ্র্য কোন কালেই ঘুচে নাই—তিনি অতিশয় দাতা ও দয়ালু ছিলেন এবং অনুগত দীন দরিদ্রকে মুক্তহস্তে সমুদয় দান করিয়া ফেলিতেন।

ধর্ম্মজীবন

বস্তুতঃ দেবীপুত্র রামপ্রসাদের সমগ্র জীবন ধর্ম্মসাধনায়ই কাটিয়াছে এবং তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রকাশ ধর্ম্মজীবনেরই অঙ্গরূপে গ্রহণীয়।

তাঁহার রহস্যাবৃত সাধনার কথা নানা জনে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্তের মতে "ইনি ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই মান্য করিতেন না, ইঁহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্ট রূপ প্রমাণ হইয়াছে।…নিরাকারবাদিরা "ব্রহ্ম" শব্দ উল্লেখপূর্ব্বক যাঁহার উপাসনা করেন ইনি কালীনাম উচ্চারণ করত তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিতেন…।" (পৃ. ৮) রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্যে স্বয়ং তাঁহার অভিমত এবং সাধনফল কিয়ৎ পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তদ্দ্বারা প্রমাণ হয়, তিনি 'বীরাচারী' তান্ত্রিক ছিলেন অর্থাৎ পূজার অঙ্গরূপে মদ্যাদি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সাধনক্ষেত্র উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্টগ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ নাম॥
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণপুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা॥ (পৃ. ৯৮–৯৯)

তাঁহার সাধনা দেবীর বিড়ম্বনায় সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, এ কথা নিজ পত্নীর সৌভাগ্য বর্ণনা করিয়া তিনি একাধিক বার অন্যত্রও লিখিয়াছেন :

ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥

(পৃ. ।৵০, ৪০, ৫০, ১০১, ১৫৪, ১৭৬–৭৭)

এক স্থলে তাঁহার সাধনমার্গের তত্ত্ব তিনি প্রায় পষ্টাক্ষরেই সূচনা করিয়াছেন :—

ভাব রে ভকত নর কালী কল্পতরু।
তারা নাম তরী তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু॥
চতুষ্পদ চতুষ্পদ না লভে একান্ত।
আজ্ঞা কিন্তু আজ্ঞাপেক্ষা এ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত॥

* * *

হলাহলামৃতামৃত রস হলাহল।
ক্রিয়াক্রিয়া কলিকালে শীঘ্র ফলাফল॥
পরম সংস্কৃতবিদ্যা গুরুরতিগম্যা।
বীর্য্যবন্ত সাধক জনার মনোরম্যা॥
সল্লোক যে পথগামী সেই পথে পথ।
কহে কবিরঞ্জন আমার এই মত॥ (পৃ. ১৪৩)

'চতুষ্পদ' অর্থাৎ পশ্বাচারী একান্তভাবে পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে না এবং কলিকালে 'ক্রিয়াক্রিয়া' অর্থাৎ বীর্য্যবন্ত সাধকের পক্ষে পঞ্চমকারের সাধনই সদ্যঃফলপ্রদ—'আমার এই মত' বলিয়া রামপ্রসাদ দৃঢ়ভাবেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পথ যে বিপৎসঙ্কুল, তাহা তিনি গোপন করেন নাই ('ব্যতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে,' পৃ. ১৪৩)। সুন্দরের শবসাধন, বিদ্যাসুন্দর উভয়ের মহাশঙ্খমালা জপ ('সঙ্গোপনে জপে রামা মহাশঙ্খমালা,' পৃ. ১৫৩) প্রভৃতি বহু কল্পিত অনুষ্ঠানে রামপ্রসাদ তাঁহার সাম্প্রদায়িক আচার নিবদ্ধ করিয়াছেন। কুলাচার নামে পরিচিত এই সাধনপথে ব্রহ্মজ্ঞানী ভিন্ন অপরের অধিকার নাই। রামপ্রসাদ যে এই পথের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার যে ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল—তাহার প্রমাণ বিদ্যাসুন্দরে ও পদাবলীতে পাওয়া যায়। আমরা দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন।
ভেদ করে সেই মূঢ়জন প্রজ্ঞাহীন॥ ('বিদ্যাসুন্দর,' পৃ. ১৮৮)

রাজ্য শুদ্ধ ভেকধর, সভাই সাধক নর, মুখে কহে রাধাকৃষ্ণ বাণী।
চিত্তে বাঞ্ছা কালপ্রিয়া, আজ্ঞামত করে ক্রিয়া, এইরূপে কাল কাটে প্রাণী।
বৈশ্য ক্ষত্রী বৈদ্য শূদ্র, নিত্যানন্দ বীরভদ্র, কর্ম্ম ভাল নহে যে বা কহে।
তার কিন্তু নাহি স্বর্গ, শুন কহি ধীরবর্গ, সেও পাপী সে সঙ্গে যে রহে॥

(পৃ. ১৪৮)

রামপ্রসাদের অভ্যুদয়কালে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে কুলাচার প্রচলিত ছিল—বর্ত্তমানে প্রায় কেহই এ কথা অবগত নহেন। আমরা একটি তান্ত্রিক নিবন্ধ হইতে ইহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। কৃপারাম তর্কবাগীশের পুত্র কেশব ন্যায়ভূষণ প্রায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কালিকার্চ্চন-চন্দ্রিকা ও দীক্ষণচন্দ্রিকা রচনা করেন। তাঁহার একটি পঙ্‌ক্তি এই—"ইদানীং গৌড়-দক্ষিণরাঢ়েষু অন্যেষপি চ দেশেষু বহবশ্চাতুর্ব্বর্ণিকাঃ কুলাচারেণেষ্টদেবতামারাধয়ন্তি" (দীক্ষণচন্দ্রিকা, ১০৩।২ পত্র)। এই আচারানুষ্ঠানের ফলে রামপ্রসাদের এক দিকে নানাবিধ অলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছিল এবং অপর দিকে লোকসমাজে মাতাল অপবাদ রটিয়াছিল। আমরা গুপ্তকবির লেখা হইতে দুইটি কাহিনী উদ্ধৃত করিতেছি।

"এক দিবস রামপ্রসাদ সেন বাটীর বেড়া বান্ধনের জন্য দড়ি, বাঁশ, বাঁকারি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঘরামীর অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, ক্ষণকালের পরেই ঘরামী লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, বাঁশ বাঁকারি দড়ি প্রভৃতি আপনারাই যথাস্থানে সংলগ্ন হইয়া বেড়া বদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাসি ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে কোলাহল শব্দ ঘোষণা হইয়া উঠিল "যে, কাশীপুরেশ্বরী অন্নদা স্বয়ং আসিয়া রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছেন।" ('সংবাদ প্রভাকর,' ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ৮)

"এক দিবস দিবাভাগে কবিরঞ্জন কুলক্রিয়া সমাধা করত কুমারহট্টের বলরাম তর্কভূষণ নামক বিখ্যাত তার্কিক পণ্ডিতের টোলের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উক্ত অভিমানী পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন "দেখ দেখ মাতালব্যাটা যাইতেছে।"...রামপ্রসাদ সেন হাস্যবদনে 'ও তার্কিক ভট্টাচার্য্য! কি বলিতেছ?' এই বলিয়াই গান ধরিলেন। যথা।

"রসনে কালী (নাম) রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জটরে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে,
কেবল বাদার্থ মাত্র, (খুজতেছে) ঘট পটরে। ১
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস,
গান কর, পান কর, পাত্র বটরে॥ ২
সুধাময় কালী নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
করে জপনা কালীর নাম, কি উৎকটরে। ৩
শ্রুতি রাখ সত্ত্বগুণে, অন্য নাম নাহি শুনে,
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, শিবে কঠোরে॥" ৪

তথা।

"সুরা পান করিনেরে। সুধা খাই কুতূহলে॥
আমার মন্‌মাতালে মেতেছে আজ্,
মদ্‌মাতালে মাতাল বলে।"[৭] (ঐ, পৃ. ৪)

৭। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে জনশ্রুতি অদ্যাপি নিঃশেষিত হয় নাই। আমরা ১৩৫৪ সনে এক পূর্ব্ববঙ্গবাসীর প্রমুখাৎ নিম্নোক্ত ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম। মদ্যপায়ী রামপ্রসাদ তাঁহার মাতুলের সঙ্গে থাকিতেন। কোন ধনীর গৃহে উৎসবোপলক্ষ্যে রামপ্রসাদকে বাদ দিয়া মাতুলের নিমন্ত্রণ হয়। রামপ্রসাদ মাতুলের সঙ্গে যাইয়া তাঁহার সঙ্গীতদ্বারা সকলকে

পৃষ্ঠপোষক ও ভূসম্পত্তি

রামপ্রসাদের অলৌকিক ক্ষমতা ও কবিত্বশক্তির কথা দেশময় প্রচারিত হইলে মাসিক বৃত্তিদাতা ব্যতীত বহু প্রধান ব্যক্তি তাঁহাকে নানা ভাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। কয়েকটি নাম উল্লিখিত হইল। (১) নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা পণ্ডিত ও কবিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেও রামপ্রসাদের "কবিতা সকল লোকমুখে শ্রবণ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, এবং ইঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য করিতেন।··· পরন্তু নবদ্বীপাধিপতির মনে এইরূপ ইচ্ছা হইল যে, রামপ্রসাদ তাঁহার অধীন হইয়া নিরন্তর নিকটে থাকেন, কিন্তু সে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই, কারণ তৎকালে রামপ্রসাদের মন অধীনতা ও বিষয়বাসনা হইতে এককালেই বিরত হইয়াছিল। ঐ সময়ে রামপ্রসাদ সেনের প্রতি ও তাঁহার কবিতার প্রতি মহারাজের এতদ্রূপ প্রীতি জন্মিল যে তিনি মধ্যে মধ্যে হালিশহরে স্বয়ং আসিয়া নিজ স্থাপিত কাছারী বাটীতে কিছু দিন প্রবাস করত রামপ্রসাদ সেনকে আহ্বান করিয়া প্রচুরতর প্রযত্ন পুরঃসর তাঁহার কবিতা সকল শ্রবণ করিতেন এবং তাহাতেই

মুগ্ধ করেন এবং গানের পর তাঁহার পিপাসা নিবৃত্তির জন্য জল আনীত হইলে দেখা গেল, সব জল মদ্যে পরিণত হইয়াছে! লক্ষ্য করা আবশ্যক, পূর্ব্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদ মাতুলের সহিত থাকিতেন, ঘুণাক্ষরেও এইরূপ কথা শুনা যায় নাই। পক্ষান্তরে গুপ্তকবি লিখিয়াছেন, "রামপ্রসাদ সেন যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন যোড়াসাঁকোর দোয়েহাটায় তাঁহার মাতুলবাটীতে থাকিতেন।" (পৃ. ১০) সুতরাং ঘটনাটি কলিকাতায়ই ঘটিয়া থাকিবে।

সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন অভিধান দান করিয়াছিলেন।"—(ঈশ্বর গুপ্ত)। এখানে সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক, রামপ্রসাদ কোন গ্রন্থে বা পদে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামোল্লেখ করেন নাই এবং তাঁহার স্বয়ংখ্যাপিত "কবিরঞ্জন" উপাধি যে কৃষ্ণচন্দ্র দিয়াছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তের লেখা ছাড়া তাহার কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

"বাঙ্গালা ১১৬৫ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৪/০ চৌদ্দ বিঘা ভূমি রামপ্রসাদ সেনকে নিষ্কররূপে প্রদান করেন, তাঁহার সনন্দ পত্রে লিখিত আছে "গর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক।" পরন্তু তাহাতে রাজার মোহর ও নাম স্বাক্ষরিত আছে, ঐ ভূমি কুমারহট্টের অতি নিকটেই।"—(ঈশ্বর গুপ্ত, পৃ. ৭) রামপ্রসাদের পুত্র রামদুলাল সেন "শন ১২০২ সাল ১৯ অগ্রহায়ণ" তাঁহার পিতার নামীয় "মহাত্রাণ সম্পত্তির বিবরণ চারিটি পৃথক্ তায়দাদে দাখিল করেন—তন্মধ্যে ১৮৩৪৮ নং তায়দাদে আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে মোট ৫১/০ বিঘা নিষ্কর জমী দান করিয়াছিলেন। যথা—

বউলপুর ১৮/০ উখড়া পরগণা
পদ্মনাভপুর ১৭/০ ঐ
মামুদপুর ১৬/০ হাবিলিসহর পরগণা।

তৎকালে হালিসহর নদীয়া জিলার অন্তর্গত ছিল। রামদুলাল সেন চারিটি তায়দাদের সঙ্গে "আসল সনন্দ দর্শাইয়া নকল দাখিল" করিয়াছিলেন। নদীয়া কালেক্টরীতে তন্মধ্যে দুইটি এবং সৌভাগ্যবশতঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সনন্দটি এখনও রক্ষিত আছে—দুইটি নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সনদের নকল এই :—

নকল শ্রীশ্রীরাম

শরণং

পারশী

১৫৮৩

ইঙ্গরাজী

শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু শুভাসীঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ এ অধিকারে তোমার ভূমিভাগ কিছু নাহি অতএব বেওয়ারিষ গরজমা জঙ্গলভূমি সমেত পতিত পরগণে হাবেলীসহর ১৬ ষোল বিঘা এবং পরগণে উখড়ায় ৩৫ পয়ত্রিষ বিঘা একুনে ৫১ একান্ন বিঘা তোমাকে মহোত্তরাণ দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ ইতি সন ১১৬৫ তারিখ ৪ ফাল্গুন শহর—

এই দান পত্র বোধ হয় গুপ্তকবি স্বয়ং পরীক্ষা করেন নাই এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র-দত্ত অপর কোন দানপত্র রঘুনন্দন উল্লেখ করেন নাই। দানপত্রে 'কবিরঞ্জন' উপাধি লিখিত নাই, অর্থাৎ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঐ উপাধি প্রদত্ত হয় নাই। কারণ, আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের বহু সনদ পরীক্ষা করিয়াছি—দানভাজন ব্যক্তিদের উপাধি সর্ব্বত্র সাবধানে লিখিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকে প্রদত্ত ১১৫৬ সন ১ অগ্রহায়ণ তারিখের সনদ দ্রষ্টব্য (সা-প-প, ৫২, পৃ. ৬)।

(২) রঘুনন্দনের বিবরণানুসারে হালিসহরের সুভদ্রা দেবী ২ বৈশাখ ১১৬৫ সনে একটি বাটী (পরিমাণ আন্দাজ ১/০ বিঘা) রামপ্রসাদকে "বসতি করিতে বৈদ্যত্তর মহাত্রাণ" রূপে দান করেন (১৮৩৪৭নং তায়দাদ ও দানপত্রের নকল দ্রষ্টব্য, ঐ ঐ, পৃ. ৬-৭)। হালিসহরের বিখ্যাত তালুকদার সাবর্ণ চৌধুরীবংশীয় দর্পনারায়ণ রায় ঐ পরগণার তালডেঙ্গা গ্রামে ২/০ বিঘা জমী ১৫ আষাঢ় ১১৬৫ সনে রামপ্রসাদকে

দান করেন (১৮৩৪৯ নং তায়দাদ)। দর্পনারায়ণ ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের অধস্তন ৭ম পুরুষ। রামপ্রসাদের প্রাচীনতম ভূমিদান সনদের তারিখ ১৭ চৈত্র ১১৬০ সন (=১৭৫৪ খ্রী.)—দাতা উক্ত দর্পনারায়ণ, শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একযোগে (১৮৩৫০ নং তায়দাদ, ভূমির পরিমাণ মোট ৮/০ বিঘা)। সুতরাং বুঝা যায়, রামপ্রসাদ স্বগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ জমীদারদের নিকটই প্রথম ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের বহু স্থলে রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন :—

অকর্ত্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ। (পৃ. ১৮৬)
ব্রাহ্মণ মামকী তনু ঈশ্বরাজ্ঞা বটে।
সাবধানে রবে ধরামর সন্নিকটে॥ (পৃ. ১৮৭)

(৩) কালীকীর্ত্তনে রামপ্রসাদ চারি বার ‘রাজকিশোরে’র নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার অপূর্ব্ব স্তুতি করিয়াছেন —“চঞ্চলা অচলা গৃহে তব পূর্ণ দয়া” ইত্যাদি। ইঁহার আদেশেই কালীকীর্ত্তন রচিত হইয়াছিল। গুপ্তকবি তাঁহার পরিচয়াদি লিখিয়া যান নাই। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ‘তীর্থমঙ্গলে’ হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়ের নাম আছে—তিনি অভিন্ন হইতে পারেন। রামপ্রসাদ তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে কুত্রাপি প্রবলপ্রতাপ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও স্বগ্রামবাসী পৃষ্ঠপোষকদের নাম করেন নাই। রাজকিশোর সম্ভবতঃ তাঁহার কোন ধনী আত্মীয় ছিলেন।

(৪) গুপ্তকবি একটি বিস্মৃতপ্রায় সম্বাদ এক স্থলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—পরবর্ত্তী কোন লেখকই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। “রামপ্রসাদ সেন যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন যোড়াসাঁকোর দোয়েহাটায় তাঁহার মাতুলবাটীতে বাস করিতেন। ৺চূড়ামণি দত্তের

সহিত অত্যন্ত প্রণয় ছিল, সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন, তিনি অতি সুবক্তা ও প্রিয়ভাষী ছিলেন।”—(পৃ. ১০)। চূড়ামণি দত্ত কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বড়লোক এবং রাজা নবকৃষ্ণের সমকালীন। ‘কায়স্থকৌস্তুভ-সারসংগ্রহ’ নামক গ্রন্থের (চৈত্র ১২৮২ সনে প্রকাশিত) শেষাংশে (পৃ. ৬০-৬৮) কায়স্থ কৃতী পুরুষদের একটি তালিকা আছে। তন্মধ্যে শোভাবাজার পূর্ব্বভাগে নবকৃষ্ণ, কালীপ্রসাদ দত্ত ও চূড়ামণি দত্তের নামোল্লেখ দ্রষ্টব্য (পৃ. ৬০)। রামপ্রসাদ স্বয়ং কিম্বা অপর কোন লেখক তাঁহার মাতুলের নামপরিচয়াদি উল্লেখ করেন নাই। রামপ্রসাদের সহিত মুরসিদাবাদে নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গ গুপ্তকবির ‘কোন আত্মীয় বন্ধু’র পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল (‘সংবাদ প্রভাকর,’ ১লা মাঘ ১২৬০, পৃ. ৮)— তিনি রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসী ছিলেন। প্রবাদটি বিশ্বাস করা কঠিন।

অধস্তন বংশধারা

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নানা স্থানে তাঁহার পুত্র-কন্যা ও পরমাত্মীয় ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করিয়াছেন—তাহার বিবৃতি অনাবশ্যক। বিশেষতঃ প্রবৃত্তিমার্গের প্রতি রামপ্রসাদের মনোবৃত্তি নানা পদে এবং বিদ্যাসুন্দরে (“কন্যা পুত্র জন্মিলে কেবল কর্ম্মভোগ” পৃ. ১৬৮) ব্যক্ত রহিয়াছে। অতুল বাবু অশেষ পরিশ্রমে রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরামের (প্রসাদীকথা, পৃ. ৩৩৫-৪০) এবং পুত্র রামদুলাল ও রামমোহনের বংশাবলী ও পারিবারিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। রামদুলালের ধারা এখন লুপ্ত হইয়াছে। রামমোহনের ধারা বিদ্যমান আছে—তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্র জয়নারায়ণ, তৎপুত্র গোপালকৃষ্ণ

(২৯।৪।১৮৯৫খ্রী. ৭৩ বৎসর বয়সে স্বর্গত), তৎপুত্র কালীপদ (১৯।১২। ১৯১৩ খ্রী. ৬৭ বৎসর বয়সে স্বর্গত), তৎপুত্র ৺মানসরঞ্জন প্রভৃতি। রামমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র দুর্গাদাস (১২৯৩-৪ সনে 'প্রায় ৮০' বৎসর বয়সে স্বর্গত), তৎপুত্র অমরনাথ (৫।৭।১৮৬২—২৩।১০।১৯২৭ খ্রী.), তৎপুত্র রামরঞ্জন (১২৯১ সনে জন্ম) প্রভৃতি। "শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা" (বিদ্যাসুন্দর, পৃ. ৯৯), অপর কন্যা জগদীশ্বরী, অনুজ বিশ্বনাথ ও ভগ্নীদ্বয়ের পরিচয়াদি বহু কাল লুপ্ত হইয়াছে।

মৃত্যু

রামপ্রসাদের দেহত্যাগের অতি বিস্ময়কর ঘটনা ঈশ্বর গুপ্তের লেখা হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইল (পৃ. ৯)—"প্রাচীন লোকেরা কহেন "তিনি শ্যামা প্রতিমা বিসর্জ্জন সময়ে পরিজন স্বজন বান্ধব সকলকে কহিলেন, অদ্য মায়ের বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জ্জন হইবে, অতএব তোমরা সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে আইস, আমি পদব্রজে চলিলাম। এই বলিয়া বহু লোক সমভিব্যাহারে জাহ্নবী-তটে গান করিতে করিতে আইলেন" ত্রিদশতরঙ্গিণীতীরে যতক্ষণ জীবিত ছিলেন ততক্ষণ অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভক্তিরসের বিদায়ি পদ অনেক গুলীন রচনা করিয়াছিলেন, গঙ্গাযাত্রার সময়ে পথিমধ্যে যে কয়েকটা গান করেন তাহার একটা গান এই।

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু তরণি ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর মেয়ে॥

দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
অনায়াসে পাবে কূল, কাল রবে চেয়ে ॥ ১
শিব নহে মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে ॥ ২

তথা।

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে ॥ ১
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে ॥ ২
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হোয়ে সে মিশায় জলে ॥ ৩

তীরে নীরে শরীর স্থাপন করত এই গান করিলেন।

যথা।

"নিতান্ত যাবে দীন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট কোরে বোসেছি ঘাটে,
ও মা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নেয়ে লবে গো ॥ ১
দশের ভরা ভোরে লায়, দুঃখি জনে ফেলে যায়,
ও মা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো ॥ ২
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসান্ দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান্ দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ॥" ৩

এরূপ প্রবাদ আছে যে, নিম্নলিখিত গান করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল।

যথা।

"তারা! তোমার আর কি মনে আছে।
ও মা, এখন্ যেমন্ রাখ্‌লে সুখে, তেম্‌নি সুখ কি পাছে॥
শিব যদি হন্ সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি, মা গো।
ও মা, ফাকির উপরে ফাকি, ডান্ চক্ষু নাচে॥ ১
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই, মা গো।
ও মা, দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে॥ ২
প্রসাদ্ বলে মন্ দড়, দক্ষিণার জোর বড়, মা গো।
ও মা, আমার দফা, হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে॥ ৩

"দক্ষিণা হয়েছে" এই উক্তি করিবামাত্রই প্রাণের দক্ষিণা হইল, অর্থাৎ প্রপঞ্চ শরীর পরিহাব করিলেন। প্রাচীন লোকেব মধ্যে অনেকেই কহেন তাঁহার মরণসময়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়াছিল। এ বিষয়ের সত্য-মিথ্যা আমরা কিছুই বলিতে পারি না।"

ঈশ্বর গুপ্তের পরে যাঁহারা এ বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই গুপ্তকবির স্বাভাবিক সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই।

রচনাবলী

(১) রামপ্রসাদের প্রযত্নকৃত এবং লিপিবদ্ধ রচনার মধ্যে **কালী-কীর্ত্তন** সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছিল। তিনটি ভণিতাতে কবিরঞ্জন উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা,

শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহাঅন্ধের নয়ন অঞ্জন॥

সুতরাং নবাবিষ্কৃত প্রমাণবলে ইহার রচনাকাল ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে হইতে পারে না এবং বেশী পরেও হইবে না। কারণ, রামপ্রসাদের জীবদ্দশায়ই ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। গুপ্তকবি লিখিয়াছেন :—"'বলা ফেণ্‌-চাটা' নামক একজনা কীর্ত্তনওয়ালা রামপ্রসাদি কালীকীর্ত্তন গান করিত, ঐ ফেণ-চাটা একদিবস কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে গিয়া কালীকীর্ত্তন গান করিয়া মধু-বর্ষণ করত সকলের চিত্ত হরণ করিল, রাজা সেই গানে পুলকিত হইয়া কীর্ত্তনকারিকে কহিলেন 'বলরাম! এত দিন তোমার নাম ফেণচাটা ছিল, এই ক্ষণে আমি তোমার নাম মধু-চাটা রাখিলাম'। এতদ্রূপ রাজপ্রসাদে প্রফুল্ল হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলরাম কহিল, "মহারাজ! আমি কৃতার্থ হইলাম, ফলে আক্ষেপ এই যে আপনি রাজা হইয়া আমার 'ফেণ' ঘুচাইয়া দিলেন, 'চাটা'টুকু ঘুচাইতে পারিলেন না।" রাজা গায়কের এই উক্তিতে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিলেন।" গুপ্তকবির মতে কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন "বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম।" পাদ্রী ওয়ার্ড (Ward) সাহেবের গ্রন্থে কালীকীর্ত্তনের উল্লেখ আছে (Kalee-Keerttunu by Ramu prusadu a Shoodru : *The Hindoos*, London, 1822, Vol. II, p. 478; also III, p. 300-1)। ইহা বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে—ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মুদ্রিত করেন[৮] (সা-প-প, ৪৯, পৃ. ৫৫-৬৩, এই সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত)। শতাধিক

৮। ঐ সময়ে আর একটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৭৭৭ শকের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারিলাল নন্দীর সংস্করণে ২২-২৩ বৎসর পূর্ব্বের 'দুইটি' সংস্করণের উল্লেখ আছে (পৃ. ৩৩ পাদটীকা)। লঙ্‌ সাহেব (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, App., p. 704) ১৮৪৫ সনের একটি ২০ পৃষ্ঠার সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। সংবাদ

বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার সুধীসমাজে রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন মধুবর্ষণ করিয়াছিল। ইহার আরম্ভে গুরুবন্দনা ("বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণং" ইত্যাদি), তৎপর গৌরচন্দ্রী ("গিরিবর! আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে" ইত্যাদি—গুপ্তকবির মুদ্রিত সংস্করণে ইহা নাই, ১২৬১ সনের ১লা চৈত্র সংখ্যায় তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত) তৎপর বিস্তৃত বাল্যলীলা এবং 'গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাম্রকাননে'। একটি দীর্ঘ পদ রূপবর্ণন অথবা ভগবতীর রাসলীলা ("জগদম্বা কুঞ্জবনে মোহিনী গোপিনী" ইত্যাদি) মুদ্রিত সংস্করণে ছিল না, ১২৬০ সনের ১লা পৌষ সংখ্যায় গুপ্তকবি মুদ্রিত করেন। ব্রজলীলার ন্যায় ভগবতীলীলাও ইষ্টনিষ্ঠ ভাবুকের চিত্ত মোহিত করে, নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যিক ইহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারিবেন না। রামপ্রসাদ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া কালীকীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন ("প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে)।"

কালীকীর্ত্তনের তিনটি পদ নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

গৌরচন্দ্রী

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥

প্রভাকরে (১২৬২ সনের ৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যা) 'নিউপ্রেস' হইতে প্রকাশিত কালীকীর্ত্তনের বিজ্ঞাপন আছে (মূল্য ।৵০)—বিজ্ঞাপনদাতা উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় সাং হালিসহর খাষবাটী।

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর, গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী, মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে।

*　　*　　*

শ্রীরামপ্রসাদে কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়, জগত্‌জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা, শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥

বাল্যলীলা

জয়া বলে আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম, জগদম্বা চল পুষ্পকাননে।
চল চল পুষ্পবনে জয়া দাসী যাবে সনে॥
জগদম্বে বিলম্বেও চল চিত্তপদচলনা।
লোহিত চরণতলারুণপরাভব, নখরুচি হিমকর সম্পদ দলনা॥
নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে, ঘন সুমধুর নূপুর কিঙ্কিণীকলনা।
সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুহে বিহরসি হরশিরসি শশিললনা॥
কল্পতরুতলে শ্রীরাজকিশোর ভাবে, বাঞ্ছাফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর, দীন দয়াময়ী সন্তত ছল ছলনা॥

গোষ্ঠলীলা

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধূ বেশ।
কষিত কাঞ্চন তনু প্রথম বয়েস॥
বিচিত্র বসন মণি-কাঞ্চন ভূষণ।
ত্রিভুবন দীপ্ত করে অঙ্গের কিরণ॥
স্বয়ম্ভুযুগল হর সুরনদীকূলে।
স্বয়ম্ভু পূজেন নিত্য করপদ্মফুলে॥

নাভিপদ্ম তেজি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে।
লোমাবলী ছলে চলে করিকুম্ভ ভ্রমে॥
ঈশ্বরমোহন ইষু নয়ন তরল।
বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড।
ফেরে করে লয়ে ছাঁদ ডোর দুগ্ধভাণ্ড॥
ভালেতে তিলক শোভা সুচারু বয়ান।
ভণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান॥

(২) **কৃষ্ণকীর্ত্তন** রামপ্রসাদ-রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ—ঈশ্বর গুপ্ত ইহা সম্পূর্ণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু একটি মাত্র পদ মুদ্রিত করেন। তিনি লিখিয়াছেন—"রামপ্রসাদের কৃষ্ণকীর্ত্তনের এক স্থান হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী, ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী।
রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে, রাই আমার মোহনমোহিনী॥
রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে।
কুটিল কটাক্ষশরে, জিনিল কুসুমশরে॥
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ, সখী বকুলে বানাইল বেশ।
তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল, কেশে করিছে প্রবেশ॥
নব ভানু ভালেতে নিবাস, মুখপদ্ম কোরেছে প্রকাশ।
উরে কলিকা যে আছে, কি জানি ফুটে পাছে, সখীর হৃদয়ে তরাস॥"[১]

১। একটি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ:—
বধূললাটোদিতবালভানুনা, মুখারবিন্দং স্ফুটিতং বিলোক্য।
স্ফুটেৎ কিমস্যা কলিকেতি শঙ্কয়া, বিধুর্বিধাত্রা গমিতো রবেরধঃ।

ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার, অপরূপ শোভা হোল আর।
এ কি শ্রীবদনছবি, উপরেতে চাঁদ রবি, সদন মদন রাজার॥
অলকা কোলে মতিহার, কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার।
যেন রাহুর মুখমাঝে, বসন রাজি রাজে, চাঁদেরে করেছে আহার॥
আঁখি লোল অনুমানি এই, চাঁদে হরিণশিশু আছে যেই।
তনু সুধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে, দিগ নিহারই সেই॥
চারু অপাঙ্গ কাম কামান, নাসাতিলক শর খরসান।
সেই শ্যামসুন্দর, মানস মৃগবর, ভাবে বুঝি ক'রিছে সন্ধান॥
(সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ, ১২)

(৩) **কালিকামঙ্গল** বা কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর : যুগকবি ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত পার্থক্য করিয়া ইহার নামকরণ হইয়াছে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর অথবা শুধু 'কবিরঞ্জন'। গুপ্তকবি এক স্থলে লিখিয়াছেন—"কবিরঞ্জন, কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, এই তিনখানি গ্রন্থ কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না।" (সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ৮) এই সম্পূর্ণাঙ্গ 'জাগরণ' গ্রন্থের নামান্তর 'কালিকামঙ্গল' ছিল বলিয়াই মনে হয়। নিম্নলিখিত পয়ার তাহাই সূচনা করে :—

যে গাওয়ায় যে বা গায় তাহার (? তোহার) মঙ্গল।
নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল॥ (পৃ. ১১৬)

ইহার বহু ভণিতায় 'শ্রীকবিরঞ্জন' লিখিত আছে (পৃ. ৪, ১৩, ২৪, ৩৯, ৪২, ৫৭, ৮২ প্রভৃতি—অধিকাংশ ত্রিপদী ছন্দে)। সুতরাং নূতন প্রমাণবলে ইহা ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই—ঐ সনের সনন্দে তাঁহার সর্ব্বজনপরিচিত উপাধির উল্লেখ নাই। গুপ্তকবি লিখিয়াছেন, "মহারাজ রামপ্রসাদি বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টি করিয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি

বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ করিয়াছিলেন" (সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ৬)। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারও ভারতচন্দ্রকে রামপ্রসাদের পরে ধরিয়াছিলেন (সা-প-প, ৫০, পৃ. ৬২-৩) এবং রামগতি ন্যায়রত্নের মতেও, "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-রচনার ২।১ বৎসর পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল" (বাঙ্গালা সাহিত্য, ১ম সং, পৃ. ১৫৪)। এই সকল ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত এক দিকে ভারতচন্দ্রের রচনার শ্রেষ্ঠতা হেতু এবং অন্য দিকে রামপ্রসাদের প্রতি পক্ষপাত হেতু কল্পিত হইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর রচনাকালে রামপ্রসাদের তিন সন্তানের জন্ম হইয়াছে, তৎকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৪০। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর এবং সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মের পূর্ব্বে ১৭৬০-৭০ খ্রীঃ মধ্যে রামপ্রসাদ গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের মধ্যে বিষয়বস্তু, ভাব, ভাষা ও ছন্দোবিষয়ে দৃশ্যমান প্রচুর সাদৃশ্য একের উপর অন্যের প্রভাব সূচনা করে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের উপর রামপ্রসাদের প্রভাব অধুনা কল্পনার অতীত। ভারতচন্দ্রের যুগান্তকারী গ্রন্থ বিদ্যমান দেখিয়াও রামপ্রসাদ "প্রবহমাণ নদীসন্নিধানে সরোবর খননের ন্যায় নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য্য" (ন্যায়রত্ন, পৃ. ১৫৫) কেন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, রামপ্রসাদের বিস্ময়কর জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য ও তৎকৃত বিদ্যাসুন্দরের নিগূঢ় রহস্য আলোচনা করিলে তাহার উত্তর পাওয়া যাইবে।

রামপ্রসাদ 'জাগরণারম্ভে'র পূর্ব্বে গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালীর বন্দনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কালীবন্দনাটি অপূর্ব্ব। আরম্ভ যথা,—

কলিকাল কুঞ্জর কেশরী কালীনাম।
জপিলে জঞ্জাল যায় যায় যোগ্য ধাম॥

কাল কর পৃথক্ চিন্ত হে মনে এই।
লকারে ঈকার দীর্ঘ খড়্গ বটে সেই॥
রসনাগ্রে মুখ ভরে যত্ন করে লও।
ভক্তি গজপৃষ্ঠে চরি যমজয়ী হও॥
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর।
শ্রীনাথ কহিলা তত্ত্ব বস্তু সারাৎসার॥ (পৃ. ।/০)[১০]

গুরুকৃপায় অভয়ার অভয়বাণী সাধক কবির চিত্তে যে সারাৎসার বস্তুরূপে চিরাধিষ্ঠিত হইয়াছে, গ্রন্থের সর্ব্বত্র তাহার অভিব্যক্তি বিদ্যমান, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার বিস্মৃতি হয় নাই—শৃঙ্গার রসের বিচিত্র বর্ণনার পদে পদে বীরাচারী তান্ত্রিক ইষ্টদেবীর লীলা অনুভব করিয়াছেন। অর্থাৎ রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর একাধারে কাব্য ও কৌল তন্ত্রের নিবন্ধ এবং জনসাধারণের নিকট এ জাতীয় রহস্যময় তন্ত্রগ্রন্থ চিরকালই গুপ্ত থাকে। গ্রন্থমধ্যে রামপ্রসাদ নানা প্রকার ভণিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—কালী-বন্দনার শেষে যে ভণিতা আছে, তাহাই সর্ব্বাধিক স্থলে দৃষ্ট হয়:—

প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস দাস দাসী পুত্র হই॥

১০। ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত ১২৬০ সনে প্রকাশিত সংস্করণ আমরা ব্যবহার করিলাম। লঙ্ সাহেব (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, App., p. 680) "হালি সহরের রামপ্রসাদ"-রচিত বিদ্যাসুন্দরবিষয়ক "কবিরহস্য" (?) এবং "রামপ্রসাদ সেন"-রচিত 'কলি(?বি)রঞ্জন' পৃথক্ উল্লেখ করিয়া দুইটি সংস্করণের কথা লিখিয়া থাকিবেন। গ্রন্থের নাম "কালীরহস্য" হওয়া অসম্ভব নহে—

অষ্টরসধারা জগদম্বা পাদপদ্ম।
পরম রহস্য কথা শুন গুণসদ্ম। (পৃ, ।৶০) দ্রষ্টব্য।

এই ভণিতার শেষার্দ্ধ একটি হেঁয়ালী—বোধ হয়, রামপ্রসাদের প্রমাতামহ (কিম্বা মাতার পরমগুরু) একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। মহাভারতে ব্যাসকূটের ন্যায় এই গ্রন্থেও রামপ্রসাদ প্রযত্নপূর্ব্বক বহু হেঁয়ালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহার অর্থবোধ হয় না। যথা বিদ্যাসুন্দরের বিচারে,

এক বস্তু তিন কিন্তু একে তিন লাভ।
কহ কহ তরলাক্ষি এবা কোন ভাব॥
আদ্য অন্তে যেটা সেটা কামনা সদাই।
আদ্য অন্তে পাঠে তুল্য কৃপা লেশ পাই॥
চারিমধ্যে সুবিখ্যাত বর্ণচারি সার।
আশ্রয়েতে চারি ফল পঞ্চ সুপ্রচার॥
কালীকিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার।
বুঝে কিন্তু সে কালী অক্ষর হৃদে যার॥ (পৃ. ৫৪)

সুন্দরের বন্ধন মোচন সংবাদে বিদ্যার উল্লাসবর্ণনা মধ্যেও পাওয়া যায়:—

বদরি কোমল পূর্ণ সুধা রসভরা।
সুবোধ কুবোধ বোধগম্য নহে ত্বরা॥[১১]
রসবেত্তা যে জন কি তার তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবিশতি সুধা॥
পাঠ করে্য পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে।
গবাগণ গুপ্তে গোভঙ্গিমা করে হাসে॥
অরসিক নিকটে রসস্য নিবেদন।
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হয় যে মরণ॥

১১। 'কালীকীর্ত্তনে' অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়:— বদন কমল বাক্য সুধারস ভর।
সুবোধ কুবোধ ভেদে গম্য নহে নর॥

গ্রন্থমধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে।
যা জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে॥ (পৃ. ১৫৪)

উপাখ্যানাংশে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু বহু স্থলেই পৃথক্। বর্দ্ধমান নগরী সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের উক্তি এই :—

ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী।
কামদেব দিল বর্দ্ধমান নামখানি॥ (পৃ. ১৯৬)

রামপ্রসাদ অকুণ্ঠ প্রশস্তির শেষে লিখিয়াছেন :—

সপ্তগণ্ড ক্রমে ক্রমে, সুকবি সুন্দর ভ্রমে, কত ঠাঁই, কত চমৎকার।
কালিকার পূর্ণদৃষ্টি, পুরী বিশ্বকর্ম্মা সৃষ্টি, সৃষ্টিতে তুলনা নাহি যার॥
ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ, কি কহিব সবিশেষ, সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি।
কালীপাদপদ্ম তলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে, আনন্দিত কবিগুণ রাশি॥
(পৃ. ১৩)

উভয়ের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য হইল চোর ধরার উপায় বর্ণনে। কোটাল বিদ্যার গৃহ সিন্দুরমণ্ডিত করিয়া সুন্দরের সন্ধান পায়, কিন্তু স্ত্রীবেশধারী সুন্দর কোটালের প্রতি কৃপাবশত: বিদ্যার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া দক্ষিণ চরণে খন্দক লঙ্ঘন করিয়া স্বয়ং ধরা দেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রামপ্রসাদের এই বর্ণনা স্বকপোলকল্পিত নহে এবং বিদ্যার পিতৃগৃহ বর্দ্ধমানে স্থাপন করাও ভারতচন্দ্রের কল্পনা নহে। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের একটি প্রাচীনতর প্রতিরূপে আমরা উভয়ই আবিষ্কার করিয়াছি। গুপ্তিপাড়ানিবাসী 'চন্দ্রচূড় ব্রহ্মচারী' ১৬২৭ শকাব্দের মাঘ মাসে (= ১৭০৬ খ্রী.) 'কালীপক্ষীয়া বিদ্যাসুন্দরকাব্যটীকা' রচনা করেন (সা-প-প, ৫৮, পৃ. ১৬)। গল্পটির সারাংশ এই—ইন্দ্রের সভায় বিদ্যা ও বিদ্যাধর নামক গন্ধর্ব-যুগলের অভিনয়ে তালভঙ্গ হয়

এবং অভিশপ্ত হইয়া কাঞ্চীনিবাসী গুণরত্নের পুত্র সুন্দর এবং বর্দ্ধমানে বীরসিংহ ও মহারাজ্ঞী অমলার কন্যা বিদ্যারূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। দূত জনার্দ্দন ভট্টের মুখে বার্ত্তা শুনিয়া সুন্দর কালীর বরে 'খেচরত্বাৎ' ছয় মাসের পথ ক্ষণমাত্রে লঙ্ঘন করিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন। মালিনীর নাম 'কজ্জলা'; কালীর তিনটি বরে 'বিল' সৃষ্টি, বিদ্যার পরাজয় ও বীরসিংহের নিকট মুক্তি লাভ হয় ইত্যাদি। বিচারকালে বহু শ্লোক রচনার মধ্যে 'গোমধ্যমধ্যে' ও 'স্বযোনিভক্ষ' শ্লোকদ্বয় ও তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। বিদ্যার গর্ভকথা প্রচারিত হইলে বীরসিংহের 'নিশাচর' সংগরসিংহ ৮ দিনের মধ্যে চোর ধরিয়া দিবে বলে। অষ্টম দিবসে "বিদ্যাগেহঞ্চ সিন্দুরমণ্ডিতং কৃত্বা অতিষ্ঠৎ" (১৮।২ পত্র)। ধরা পড়িয়া সুন্দর "বিলপথেন বিদ্যানিকটমগাৎ" (২০।১) এবং সখীবেশে নিশাচরের শপথ শুনিয়া অবশেষে "বিললঙ্ঘনে দক্ষিণচরণপ্রদানং কৃতমিতি" (২১ পত্র)। এই অংশে একটি পুষ্পিকা আছে—"ইতি শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজচম্পকমহীনাথনির্দেশিতশ্রীচন্দ্রচূড়ব্রহ্মচারিরচিতবিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান-নাটকানুবন্ধে বিদ্যাপরিণয়ঃ প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ"॥ শ্রীরামনাথশর্ম্মণঃ পুস্তিকা লিখনঞ্চ। (২১।২)। গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে (২২-৯৯ পত্র) চৌরপঞ্চাশিকার কালীপক্ষে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। কারণ, চন্দ্রচূড়ের লেখানুসারে সুন্দর বিহ্বল হইয়া ঐ ৫০ শ্লোকে ভগবতীর ধ্যান করিয়াছিলেন "ইতি চ পুরাতনী কথা" (২২।১)। লক্ষ্য করা আবশ্যক, এই সংস্কৃত গ্রন্থও রামপ্রসাদের উপজীব্য ছিল না—কাঞ্চীরাজ, মালিনী, দূত, কোটাল প্রভৃতির নাম এখানে পৃথক্। বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানের এই অভিনব 'নাটকানুবন্ধ' সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইলেও ইহার আকর বোধ বাঙ্গলা নাটক।

সুন্দরের এই কালীভক্তিময় প্রাচীন রূপ ভারতচন্দ্রের নিপুণ তুলিকায় 'নাগর রায়ে' পরিণত হইয়া রাজসভায় বাহাবা লইয়াছে। নিভৃত ভক্তহৃদয়ে তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলেই রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের উৎপত্তি। ইহাতে বিদ্যা ও সুন্দরের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, বাঙ্গলা সাহিত্যে বস্তুতঃ তাহার তুলনা নাই। মালঞ্চ বৃত্তান্তে 'বিনোদবর' সুন্দরের নিগূঢ় রূপ ভাবে ছন্দে অপূর্ব্ব :—

অদূরে উদয় রবি, নিদ্রা তেজি উঠে কবী।
শিরসি কমলে, দশ শতদলে, চিন্তয়ে শ্রীনাথ ছবি॥
জপয়ে শ্রীদুর্গানাম, পূর্ণ হেতু মনস্কাম।
প্রাতঃস্নান করি, ধৌত ধুতি পরি, সসঙ্কল্প গুণধাম॥
নিকটে মালঞ্চ শুষ্ক, দেখি মনে বড় দুঃখ।
সে জন গমনে, কুসুম কাননে, বিকশিত হয় পুষ্প॥

*　　　*　　　*

সুন্দর সৌরভ ছুটে, মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে।
নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণ, স্মরে দহে প্রাণ, চমকিয়া হীরা উঠে॥

*　　　*　　　*

ভ্রমিতে কানন মাঝ, সম্মুখে যুবক রাজ।
পুটাঞ্জলি পাণী, মুখে মৃদু বাণী, কহে তব এই কায॥
সামান্য পুরুষ নহ, স্বরূপে আমাকে কহ।
পূর্ণ ব্রহ্ম হরি, নররূপ ধরি, কি হেতু তুমি ভ্রমহ॥
কত পুণ্য পুঞ্জ মম, ধন্য কেবা মম সম।
শুন মহাশয়, ধন্য মমালয়, অতিথি শ্রীনরোত্তম॥ (পৃ. ২৬-৮)

রামপ্রসাদ ভ্রমেও এক বার সুন্দরকে 'রায়' উপাধি দেন নাই—কবি, কবিবর, মহাকবি প্রভৃতি পদেই তাঁহাকে মণ্ডিত করিয়াছেন।

সরোবরতীরে পরস্পর দর্শন লাভের পর বিদ্যা আসিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবতীর স্তব করিলেন এবং—

একান্ত কাতরা বিদ্যা, তুষ্টা মহাবিদ্যা আদ্যা, পড়িলা প্রসাদ জবাফুল।
শ্রবণে শুনিল এই, তোমার স্বদেশ সেই, আজি নিশি সকল প্রতুল॥

(পৃ. ৪৭)

বলা বাহুল্য, সুন্দরও ভগবতীর স্তব করিয়াছিলেন :—

স্তব করে কবি, পরিতুষ্টা দেবী, পুনরপি আজ্ঞা হয়।
ভয় নাহি বচ্ছ, ইহা কোন্ তুচ্ছ, সুখে কর পরিণয়॥
অপরূপ কথা, অকস্মাৎ তথা, সুড়ঙ্গ হইল পথ।
প্রসাদের বাণী, ভক্তের ভবানী, পূরাইলা মনোরথ॥ (পৃ. ৪৯)

ভারতচন্দ্র এ স্থলে দেবীদত্ত সিঁদকাঠী ও সন্ধিমন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ্রচূড়ের লেখানুসারে "ভগবত্যাজ্ঞানিয়ন্ত্রিতবিলপথেন প্রবিষ্টঃ সুন্দরঃ" (৮।১ পত্রে)। ভারতচন্দ্রের লেখার উপর রামপ্রসাদের নিগূঢ় লেখনী-সঞ্চালন পদে পদে লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের মতে সুন্দরের বন্ধন মোচনের পর,

সিংহাসনে বসাইয়া, বসনভূষণ দিয়া, বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ।
করিল বিস্তর স্তব, নানামত মহোৎসব, হুলাহুলি দেই রামাগণ॥

(পৃ. ৩১৩)

রামপ্রসাদের লেখানুসারে বীরসিংহের পণ্ডিতেরা শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবস্থা দিলেন :—(পৃ. ১৫৪-৫৭)

গন্ধর্ব্ব বিবাহ পরে, পুনরপি নৃপবরে, বিবাহ না করে কোথা কেহ।

এবং বহু পৌরাণিক নিদর্শন প্রমাণার্থ প্রদর্শিত হইল। বার মাস বর্ণনে ভারতচন্দ্রের বিদ্যা আশ্বিনে নদে-শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইতে চাহিয়াছেন। আর কবিরঞ্জন গাহিলেন,

কষ্টায় কেবল মুক্তি, ভক্তিভাবে পূজে শক্তি, মুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে।
যে গৃহী সাধক দীন, সেই সে দিবস তিন, মরমে মরিয়া থাকে খেদে॥
(পৃ. ১৬২)

এইরূপ ব্যক্তিগত অনেক মর্ম্মকথা রামপ্রসাদ নানা স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের শেষ পরিণতি ভারতচন্দ্র বর্ণনা করেন নাই। রামপ্রসাদ সে অভাব বাঞ্ছা মত পূরণ করিয়াছেন। সন্তানলাভের পূর্ব্বেই সুন্দর বিদ্যা সহ দেশে ফিরিয়া যান এবং স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হন। "মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী"তে বিদ্যার পুত্র পদ্মনাভের জন্ম হয় (পৃ. ১৭৭) এবং এই পুত্র শিক্ষালাভের পর,

কোন ক্ষোভ নাই, জননীর ঠাঁই, নিল একাক্ষরি মন্ত্র। (পৃ. ১৭৯)

আমাদের অনুমান, রামপ্রসাদ জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দনের জন্মকাল ও মন্ত্র-দীক্ষা ছলক্রমে এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুত্রের উপর তাঁহার গভীর স্নেহ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দ্বারা সূচিত হয় (পৃ. ৬২, ৭৭, ১১৮, ১২৭, ১৫৮, ১৬৯, ১৯০)। জ্যেষ্ঠ সুতা (পৃ. ৯৯), সুতা জগদীশ্বরী (পৃ. ১৬৯, ১৯০) প্রভৃতি অপর পরিজনের উল্লেখ অত্যন্ত বিরল। রামপ্রসাদ স্বয়ং একাক্ষরী দক্ষিণাকালীমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন, ইহাও অনুমানসিদ্ধ হইতেছে। একটি গানে ('পতিতপাবনী তারা') বশিষ্ঠাভিশপ্তা তারাবিদ্যার উল্লেখ দৃষ্ট হয়—তাহা কবিরঞ্জনের না হইয়া দ্বিজ রামপ্রসাদের রচনা হইতে পারে। সুন্দর মন্দির গাঁথিয়া দক্ষিণাকালীর পাষাণমূর্ত্তি স্থাপন করেন (পৃ. ১৭৯-৮০)। কিন্তু,

তথাপিও কদাচ প্রসন্ন নহে চিত্ত।
শব সাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য॥
প্রযত্নে সংগতি করে চণ্ডালের শব।
সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব॥

ভৌমবারযুতা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি।
শ্মশানে চলিলা সঙ্গে মহিষী রূপসী ॥
বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ী গানে হব ব্যস্ত ॥
জ্ঞাত নহি বল্যে কেহ না করিবা হেলা।
বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা ॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।
ভঙ্গীতে সঙ্ক্ষেপে কিছু কিছু কয়্যে যাই ॥
অকর্ত্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে।
আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥ (পৃ. ১৮০)

রামপ্রসাদ অতঃপর শবসাধনের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন (পৃ. ১৮১-৭), তাহা বস্তুতঃ একটি তান্ত্রিক নিবন্ধ—তদ্বিষয়ে তাঁহার আত্যন্তিক অনুরাগ না থাকিলে কাব্যসাহিত্যের পরিচ্ছেদরূপে তিনি তাহা চালাইতে অগ্রসর হইতেন না। শবোপরি বসিয়া 'মহাশঙ্খমালাজপে'র ফলে দেবী সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া সুন্দরকে বর দান করেন। তন্মধ্যে বরদানচ্ছলে দেবীর পুরাণসম্মত কলিমাহাত্ম্যবর্ণন (পৃ. ১৮৫-৬) এবং চরম বাণী ("শীঘ্র মৃত্যু হয় যার পুণ্যধাম সেই") রামপ্রসাদের আর একটি নিজস্ব মর্ম্মকথা।

রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তি, চরিত্রচিত্রণ ও স্বভাবোক্তির বহু মনোহর নিদর্শন বিদ্যাসুন্দরে নিবদ্ধ আছে—কয়েকটি উদ্ধৃত হইল।

বার দিয়া বসিল বিনোদবর পাশে।
বাসনা বলিতে নারে ফিক্ ফিক্ হাসে ॥
ভাবে কবি, এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া।
ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া ॥

কটির কাপড় গাছি কতবার খোলে।
ভুজপাশ উদাস গা ভাঙ্গে হাই তোলে॥
হেসে হেসে আরো এসে ঘসায় নিকটে।
কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে॥
(মালিনীর পুষ্পচয়ন, পৃ. ২৯)

হীরা রায় নামে এক কোটালের খুড়া।
বয়স বিস্তর বড় বুদ্ধিমান বুড়া॥
কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে।
সঙ্গোপনে যাও বিদু ব্রাহ্মণীর কাছে॥
* * *
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি রহে।
বৈস বাপু বিদু মৃদু হেসে হেসে কহে॥
কোন্ ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই।
বৌও বেটা বুঝেছি নিষ্ঠুর বড় তুই॥
ভাগ্যধর হবে বাপু কুড়ায়েছি ফুল।
সুবচণ্ডী পূজে কত ছিঁড়িয়াছি চুল॥
পঞ্চম বৎসরে তোর মা মরে যখন।
মৃত্যুকালে হাতে হাতে সঁপেছে তখন॥
এবে বাছা ঠাকুরালী দেশের ঠাকুর।
আমি সেই ভাব ভাবি তুমি সে নিষ্ঠুর॥ (পৃ. ১৪-৫)

গৌড়রাজ্যে গোঁড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে।
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাঠে॥
খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁত্‌কা হাতে॥

মুণ্ড গুণ্ডছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী॥ (পৃ. ৯১)

সহরে গুজব উঠে একে এক শত।
গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেস্তে যত॥
দরজায় বস্তে কেহ মণ্ডলের ঠাট।
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥
এক শরা ভরা টিকা হুঁকা চলে দুটা।
পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু টেঁকীকুটা॥
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর।
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার॥
হাতকাটা একটা মানুষ গেল কয়ে।
চোরের সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে॥
পরম রূপসী তারা স্বর্গ বিদ্যাধরী।
বিপুল নিতম্ব হরিণাক্ষী কৃশোদরী॥
চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে।
সেই ক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাতে॥ (পৃ. ১০৬-৭)

কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি মূঢ়।
খাও হে বাপের কলা দিয়ে ঝোলা গুড়॥
দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র।
হবচন্দ্র রাজার যেন গবচন্দ্র পাত্র॥

বন পশু বুঝেছি বলিয়া দেন তুড়ি।
রাঙ্গাবট যেন সার কাঁটালের গুঁড়ি॥
ছয় মাস গতে কর্ম্ম সুধাও কি জাতি।
কেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি॥
তব চর্য্যা চর্চ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক।
দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে জনেক॥
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর।
চাসায় পরশ পায় দুনা বাড়ে দর॥ (পৃ. ১৩৩)

হৃদয়ে পরম ব্যথা, কহে কথা যাব কোথা, কার বিদ্যা কে লয়ে চলিল।
স্বপ্নরূপা কন্যাগুলা, ভেঙ্গে গেল ধুলাখেলা, শোকশেল হৃদয়ে পশিল॥ (পৃ. ১৭০)

মিশ্র হিন্দী ও শুদ্ধ হিন্দী রচনায় রামপ্রসাদ সিদ্ধহস্ত ছিলেন—মাধব ভট্টের 'ভট্টভাখা' (পৃ. ১৪৪-৪৫) প্রভৃতি তাহার নিদর্শন।

বিলাতি বহুত চিজ বেস কিম্মতের।
খরিদ্দার নাহি পড্যা পড্যা আছে ঢের॥ (পৃ. ১৪)

ইহা অত্যাধুনিক রচনা বলিয়া ভ্রম হয়।

"নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে" অনুচ্ছেদটি (পৃ. ৭৭-৭৯) অনুপ্রাসরচনার আদর্শস্থানীয়। পরিশেষে কয়েকটি রসাল প্রবাদবচন বিদ্যাসুন্দর হইতে সঙ্কলিত হইল :—

সাঁতারে হাঁপায়্যে শেষে স্রোতে ঢাল গা। (পৃ. ৬১)
ছুঁড়ীর হাঁপানে ছোঁড়া হল তন্দ্রসারা। (পৃ. ৬৯)
জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার। (পৃ. ৭০)
খুঁড়িতে কেচুয়া পাছে উঠে কাল সাপ। (পৃ. ৭৫)
কোথা বাজিবেক তাপা শিরে সর্পাঘাত। (পৃ. ৭৬)
লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়া ঢাকি। (পৃ. ৭৭)

অতি বুদ্ধে পোঁদে দণ্ডী তার ভোগ করি। (পৃ. ৯৭)
ঘৃতের সুস্বাদ কোথা ঘোলে। (পৃ. ১৬২)
পর্ব্বতের আড়ে পিতা আছি এতকাল। (পৃ. ১৮৮)

(৪) **সাধনসঙ্গীত** ঃ রামপ্রসাদী গানই রামপ্রসাদকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সাহিত্যরচনার কোন বিভাগে ইহাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অপৌরুষেয় বেদবাণীর ন্যায় ইহা এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু। ইহা যে গ্রন্থপদবাচ্য নহে এবং সাধনমগ্ন চিত্তের এক অতীন্দ্রিয় দ্রবীভূত স্তরে যে ইহার উদ্ভব, রামপ্রসাদ স্বয়ং তাহা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন ("গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত"—বিদ্যাসুন্দর, পৃ. ১৮০)। বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ প্রযত্নসাধ্য রচনা, আর রামপ্রসাদী মালসী রচনা-বহির্ভূত দেবগ্রাহ্য উচ্ছ্বসিত ভাব মাত্র। রামপ্রসাদ স্বয়ং একটি গানও লিপিবদ্ধ করেন নাই—ভক্তেরা সামান্য অংশ উদ্ধার করিয়াছেন, অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে। গুপ্তকবি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন,—"পূর্ব্বে দুই একটা করিয়া অভ্যাস করত সংগ্রহপূর্ব্বক যিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারি নিকটে তাহাই ছিল, এইক্ষণে তাহাও প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে, কারণ পূর্ব্বকালের লোকেরা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় গোপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেন, প্রাণান্ত হইলেও কাহাকে দেখিতে দিতেন না, আহ্নিক, পূজাকরণকালে সেই পুঁতির উপর ফুলচন্দন প্রদান করিতেন, অধুনাও দুই এক মহাশয় ঐ প্রকার করিয়া থাকেন, আমরা সর্ব্বস্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহারদিগের নিকট হইতে সে পদাবলি প্রাপ্ত হইতে পারি নাই" (পৃ. ৮)। ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং কবি ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদী গানের বিষয়ে স্বয়ং গবেষণা করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে লিখিয়াছেন,—"ইহার তুল্য বঙ্গভাষা-ভাষিত গীতরত্ন এ পর্য্যন্ত কোন কবি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন,...কাকের ন্যায় অতি নীরস কর্কশকণ্ঠ কোন মানুষ (যাহার তাল, মান, রাগ, সুর কিছুই বোধ নাই) তাহার কণ্ঠ হইতে রামপ্রসাদি পদ নির্গত হইলে বোধ হইবে যেন কোথা হইতে অকস্মাৎ অমৃত বৃষ্টি হইতেছে" (পৃ. ১)। "কবিতা বিষয়ে রামপ্রসাদ সেনের অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ইনি চক্ষে যখন যাহা দেখিতেন এবং ইঁহার অন্তঃকরণে যখন যাহা উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহাই রচনা করিতেন, কস্মিন্ কালে দৎ কলম লইয়া বসেন নাই। মুখ হইতে যে সমস্ত বাক্য নির্গত হইত তাহাই কবিতা হইত। তিনি পরমার্থ পথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বরপ্রসঙ্গে তাহারি বর্ণনা করিতেন। এই মহাশয় সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত তাঁহার অন্তঃকরণে অন্য চিন্তা বা অন্য চিন্তামাত্রই ছিল না," (পৃ. ২)। ঈশ্বর গুপ্ত পাদশতাব্দীর 'গুরুতর পরিশ্রমে' রামপ্রসাদের জীবনী ও সঙ্গীতাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার সঙ্গীতের বিষয়ে বহু প্রসঙ্গকথা অভ্রান্তরূপে অবগত হইয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তি পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাকে বাঙ্গলার 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' কবি বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। রামপ্রসাদের গানের বই এখন পথে ঘাটে বিকাইতেছে, অর্থাৎ ঐ সদানন্দ পুরুষটির অলৌকিক শক্তিপ্রসূত গান এখন একটি সামান্য গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়াছে এবং সরল, মর্ম্মস্পর্শী প্রভৃতি দুই একটি লৌকিক বিশেষণ পদ সমালোচকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াই তাহা চরম' চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। অথচ গুপ্তকবি মাতাল-প্রসঙ্গের গান দুইটি প্রথম মুদ্রিত করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন—"আহা

এই স্থলে রামপ্রসাদ সেন কি বিচিত্র কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও পরমার্থরসের রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ করি জগদীশ্বর এবম্ভূত অদ্ভুত ক্ষমতা অপর কাহাকে প্রদান করেন নাই, প্রসাদ কেবল একাই তাঁহার যথার্থ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈবশক্তি দেবী অনবরত ইঁহার কণ্ঠে জাগ্রতাবস্থায় বিহারপূর্ব্বক নৃত্য করিতেন, ক্ষণমাত্র নিদ্রিতা ছিলেন না, নচেৎ এবম্প্রকার অসাধারণ ব্যাপার ঘটনার সম্ভাবনা কি প্রকারে হইতে পারে” (পৃ. ৪)। মাতাল-প্রসঙ্গের দ্বিতীয় গানটির একপ্রকারের সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত হইল :—

মন ভুলো না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে॥
সুরা পান করিনে রে, সুধা খাই যে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ্ মাতালে মাতাল বলে॥
অহর্নিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণতলে।
নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচবে দিশা, বিষম বিষয়মদ খাইলে॥
যন্ত্রভরা মন্ত্রসোঁড়া, অণ্ড ভাসে যেই জলে।
সে যে অকুল তারণ, কুলের কারণ, কুল ছেরো না পরের বোলে॥
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে।
সত্ত্বে ধর্ম্ম তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে॥
মাতাল হলে বেতাল পাবে, বৈতালী করিলে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে, পতিত হবে কুল ছাড়িলে॥

তান্ত্রিক কুলাচারের অতি নিগূঢ় সারতত্ত্ব এ স্থলে গীতাকারে সাধকের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, ভাষ্যটীকাদিদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া ইহা পৃথক্ নিবন্ধরূপে প্রচারযোগ্য। একাধারে সূত্রকার ও গীতিকারের মর্য্যাদার অধিকারী হইয়া এইরূপ এক একটি গান দ্বারাই রামপ্রসাদ চিরস্মরণীয়

অসাধারণ কবির আসনে সমারূঢ়। অনুরূপ ভাববিহ্বল চিত্তে বিদ্যা-সুন্দর কাব্যেও 'অদ্যাপি বাসগৃহতো ময়ি নীয়মানে' শ্লোকের অক্ষরানুবাদ করিয়া রামপ্রসাদ হঠাৎ কুলাচারসম্মত দাম্পত্যের এক চরম ব্যাখ্যা অকপটে ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন :—

অদ্যাপি সা বিদ্যা মম হৃদে বিহরতি।
নিরখি মুঁদিলে আঁখি বিদ্যার মুরতি ॥
সুপ্ত পতি মৃত প্রায় বাক্য নাহি মুখে।
বিপরীত কাযে বিদ্যা চড়ে তার বুকে ॥
নগ্ন বিদ্যা মুক্তকেশী দন্তে কাটে জি।
নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি ॥ (পৃ. ১৩০-৩১)

"কোন আত্মীয় ব্যক্তি এক দিবস কথায় কথায় রামপ্রসাদ সেনকে কহিয়াছিলেন, "সেনজ এতদিন দুঃখ গেল, এইক্ষণে কিঞ্চিৎ সুখভোগ কর" এই কথায় তিনি অপর কোন উত্তর না করিয়া তৎক্ষণাৎ একটি গান করিলেন, ঐ গীত তাহার প্রকৃত উত্তর হইল। যথা—

মন কোর না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥

হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তেঁইতো শিবের দৈন্যদশা ॥
সে যে দুঃখিদাসে দয়া বাসে, সুখের আশে বড় কসা।
হোয়ে ধর্ম্মতনয়, তেজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা ॥ ১
হরিষে বিষাদ আছে মন, কোর না এ কথায় গোঁসা।
ওরে সুখেই দুখ, দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥ ২
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, কোরে পূরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া, তস্য কড়া, এড়াবে না রতিমাষা ॥ ৩

প্রসাদের মন, হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হও রে চাসা।
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা॥ ৪
(ঈশ্বর গুপ্ত, ঐ, পৃ. ৩-৪)

"রামপ্রসাদ সেন চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিবস কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে চড়ক দেখিতে গিয়াছিলেন, যখন চড়কী দেপাক্ দেপাক্ বলিয়া চড়কগাছে ঘুরিতেছে, তখন কেহ কেহ কহিলেন, "সেন মহাশয় দেখ কেমন সুন্দর ঘুরিতেছে" প্রসাদ তাহাতে হাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "ভাই! এ কি এক সামান্য চড়ক দেখাইতেছ, আমি দিবানিশি যে চড়কে ঘুরিতেছি তাহার নিকট এ চড়ক কোথায লাগে!" তাঁহারা কহিলেন, সে কিরূপ চড়ক ভাই, তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ সহস্র ব্যক্তির সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে এই গান ধরিলেন। যথা—

ওরে মন চড়কী ভ্রমণ কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু, যুবতীর উরে। মন রে,
ওরে কর পঙ্ক বিল্বদলে, পূজিছ তাহারে॥ ১
ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে বাজিছে ঢাক, মন রে,
ওরে বৃন্দাবলী, খ্যাম্‌টা ঢালী, বাজায় নানা সুরে॥ ২
কাম দীর্ঘ, ভাড়ায় চোড়ে, ভাংলে পাঞ্জর পাটে পোড়ে। মন্ রে,
ওরে যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্য রে তোমারে॥ ৩
দীর্ঘ আশা চড়ক্ গাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ। মন্ রে,
ওরে মায়া-ডোরে বড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে॥ ৪
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার। মন্ রে,
ওরে শিঙ্গে ফুকে শিঙ্গে পাবি, ডাকো কেলে মারে॥ ৫ (ঐ, পৃ. ৪)

মহারাজ রামপ্রসাদকে ভূমি দান করিয়া কিছু দিন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন সেনজী, সে ভূমি ভালরূপে আবাদ করিয়াছ কি না?" প্রসাদ তাহার উত্তরছলে এই গান ধরিলেন। যথা।

তারার জমি আমার দেহ, ইথে কি আর আপদ্ আছে।
ও যে দেবের দেব, সুকৃষাণ হোয়ে মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে॥
ধৈর্য্য খোঁটা, ধর্ম্ম বেড়া, এ দেহের চৌদিক্ ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক রোয়েছে॥ ১
দেখে শুনে ছটা বলদ ঘরে হোতে বার হোয়েছে।
কালীনাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে, পাপতৃণ সব কেটেছে॥ ২
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালীকল্পতরুবরে, রে ভাই, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে॥ ৩" (ঐ, পৃ. ৮)

"কন্যা, পুত্র, স্ত্রী কিংবা অপর কেহ নিতান্ত বিরক্ত করিলে জগদীশ্বর স্মরণ-পূর্ব্বক মনের ভাবে এক একবার এক একটা গান করিতেন।

যথা।

তুমি এ ভাল কোরেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু, আমারে দিলে না॥
কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না, পাবে না, তায় বা ক্ষতি কি মোর।
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি, এবার এ বাজী ভোর গো॥ ১
এ মা দিতিস্, দিতাম, নিতাম, খেতাম, মজুরি করিয়া তোর।
এবার মজুরি হোলো না, মজুরা চাব কি, কি জোরে করিব জোর গো॥ ২
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা, মোর যে বিপদ ঘোর গো॥ ৩
এ মা ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে, কি কায তোর কঠোর।
আমার একূল, ওকূল, দুকূল মজিল, সুধা না পেলে চকোর গো॥ ৪

এ মা আমি টানি কোলে, মন টানে পিছে, দারুণ করম ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে পোড়ে ছুটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর গো ॥৫ ”

(ঐ, পৃ. ৩)

কোন রাজার সভায় বসিয়া রাজব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ এই গান রচনা করিয়াছিলেন।

ছি ছি, মনভ্রমরা দিলি বাজি।
কালীপাদপদ্মসুধা তেজে, বিষয় বিষে হোলি রাজি।
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, লোকে তোমায় কয় রাজাজী।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীৎ পাজি ॥ ১
অহঙ্কার মদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজি।
তুমি ঠেকৃবে যখন জানবে তখন কর্ব্বে কালে পাপোষ বাজী ॥ ২
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা, ক্রমে যত হয় গতাজি।
পোড়ে চেরের কোটায়, মন টৌটায়, যে ভজে সে মন্দ গাজি ॥ ৩
কুতুহলে, প্রসাদ বলে, জরা এলে আস্‌বে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি, লবে টানি, কি করিবে ও বাবাজী ॥

(ঐ, ১লা চৈত্র ১২৬১, পৃ. ১২)

রামপ্রসাদের অবস্থাভেদের এই জাতীয় সঙ্গীত সকল অতি চমৎকার এবং ঈশ্বর গুপ্তই কোন কোন গান রচনার উপলক্ষ্য অবগত হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নতুবা প্রসঙ্গচ্যুত হইয়া তাহাদের চমৎকারিত্ব ও রামপ্রসাদের অদ্ভুত ক্ষমতা অনেকাংশে লোপ পাইত। রামপ্রসাদের গানের যে শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়, তাহাও গুপ্ত কবির পরিশ্রম-সাধিত বস্তু—তিনিই প্রথম সীতার বিলাপোক্তি, শিবসংগীত, শবসাধন বিষয়ক সংগীত, নৌকাখণ্ডের সংগীত, প্রথমাবস্থার গীত, নামমালা ও স্তব, মালসী আগমনী, রণবর্ণনা, মধ্যমাবস্থার গীত ও শেষাবস্থার গীত নামকরণ

করিয়া রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতসমূহ (মোট সংখ্যা ৬৭ হইতে কম নহে) মুদ্রিত করিয়াছিলেন।[১২]

রামপ্রসাদ জীবন ভরিয়া বহু সহস্র গান রচনা করিয়াছিলেন, যাহার শতাংশও রক্ষা পায় নাই। গুপ্ত কবি এক স্থলে লিখিয়াছেন (প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ৮)—

"অপিচ এমত জনরব যে কবিরঞ্জন এক লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কেবল তাঁহার প্রণীত একটি পদ সাক্ষীস্বরূপ হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যথা।

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরী দরবার রে।
(সদা) ফুকারে ফরেদি বাদি, না হয় সঞ্চার রে ॥
আরজবেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাস্ত কিবে, মা গো।
ও মা দেওয়ান দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথার রে ॥ ১
লাক্ উকিল করেছি খাঁড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া, মা গো।
তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি, কাণ নাই বুঝি মার রে ॥ ২
গালাগালী দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হোয়েছ কালী, মা গো।
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী, করিলে আমা রে ॥ ৬

১২। অতুলবাবু লিখিয়াছেন, "গুপ্তকবি মাত্র কুড়িটি পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন" (প্রসাদী-কথা, পৃ. ৩৯৬ পাদটীকা)—ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তিনি প্রভাকরের ১২৬০ সনের ১লা পৌষ সংখ্যার ৪ পৃষ্ঠা (তন্মধ্যে মোট ১৬টি গান) ও ১২৬১ সনের সংখ্যাটি (তন্মধ্যে মোট ৩৫টি নূতন পদ আছে—এই সংখ্যার ১২ পৃষ্ঠার পর পাওয়া যায় নাই, তাহাতেও বহু গান মুদ্রিত হইয়া থাকিবে) দেখিতে পান নাই। 'কবিরঞ্জনের কাব্য-সংগ্রহে' মোট পদসংখ্যা ৯১—সবই বোধ হয় গুপ্তকবি সংগ্রহ করিয়াছিলেন

রামপ্রসাদ লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে, অনেকাংশে সম্ভাবনার যোগ্য বটে, কারণ বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত পদবিন্যাসে বিরত হয়েন নাই, মনে যাহা উদয় হইয়াছে, তাহারি কবিতা করিয়াছেন।"

উপসংহারে আমরা অজু গোঁসাইর সহিত রামপ্রসাদের সঙ্ঘর্ষের কথা গুপ্তকবির লেখা হইতে উদ্ধৃত করিলাম—ইহা একটি স্মরণীয় প্রসঙ্গ।

রাজা যখন কুমারহট্টে আসিতেন, তখন রামপ্রসাদ সেন এবং অজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সঙ্গীতযুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ সেন কবীন্দ্র ছিলেন, অজু গোঁসাই আদ্-পাগলা ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্য কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন জ্ঞানভক্তি বিষয়ে পদ বিন্যাস করিতেন, তিনি তখনি রহস্যছলে তাহারি উত্তর করিতেন।

এক দিবস রাজসমীপে রামপ্রসাদ গান করিলেন।

"এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল, শূন্যে এত পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন শরার জলে সূর্য্যছায়া,
অভাবেতি স্বভাব যিটি॥ ১
গর্ভে যখন যোগ তখন ভূমে পোড়ে খেলেম্ মাটি।
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, দড়ির বেড়ি কিসে কাটি॥ ২
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছাসুখে পান কোরে,
বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি॥ ৩

আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটী,
ও মা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, মা তুমি পাষাণের বেটী ॥ ৪"

অজু গোঁসাই শ্রুত মাত্রেই ইহার উত্তর করিলেন।

"এই সংসার রসের কুটি,
খাই দাই বাজকৃসে বসে মজা লুটি ॥
ওহে সেন নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামোটী।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত, পিড়ি পেতে দেয় দুদের বাটী ॥"

কবিরঞ্জন গান করিলেন,

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুতলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি ॥ ১
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতা মাতায় তাড়্যে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধোরে রবি ॥ ২
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি ॥ ৩
প্রথম ভার্য্যের সন্তানেরে দূরে হোতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥ ৪
প্রসাদ বলে এমন হোলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হবি ॥ ৫

গোঁসাইজি ইহার উত্তর করিলেন।

"বোলেছে রামপ্রসাদ কবি।
আয় মন বেড়াতে যাবি ॥

তার কথায় কোথায়ও যেও না রে।

সাধকের মনের ভাব সে কি জানে রে॥"

রামপ্রসাদ সেন কালীকীর্ত্তনে একাম্রকাননে ভগবতীর গো-চারণ প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। গিরিশগৃহিণী গৌরী, গোপবধূ বেশ। ইত্যাদি। গোস্বামী ইহার উত্তর দিলেন।

"না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁটালের আমস্বত্ব,

মেয়ে হোয়ে ধেনু কি চরায় রে।

তা যদি হইত, যশোদা যাইত,

গোপালে কি পাঠায় রে॥"

রামপ্রসাদ সেন কহিলেন,

"কর্ম্মের ঘাট্, তেলের কাট্, আর পাগলের ছাট্, মোলেও যায় না।"

অজু গোঁসাই তখনি উত্তর দিলেন।

কর্ম্মডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর মোলেও যায় না।

রামপ্রসাদ কহিলেন,—

শ্যামা ভাবসাগরে ডোবো রে মন,

কেন আর বেড়াও ভেসে॥

গোঁ সাই উত্তর দিলেন,—

একে তোমার কোপো নাড়ী।

ডুব দিও না বাড়াবাড়ী॥

হোলে পরে জ্বর জাড়ি।

যেতে হবে যমের বাড়ী॥

এই সমস্ত কবিতা পাঠে পাঠকগণ সেনজী ও গোঁসাইজীর বিদ্যা ও গুণের তারতম্য বিবেচনা করিবেন। ('সংবাদ প্রভাকর,' ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ৭)

পরিশিষ্ট—দ্বিজ রামপ্রসাদ

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত একাধিক ব্যক্তির রচনা রামপ্রসাদী গানে মিশিয়া গিয়াছে। কবিরঞ্জনেব গান লোকসাহিত্যের আসরে যে এক অপূর্ব্ব আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাব অনুকরণে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র গান রচিত হইতে লাগিল। এ জাতীয় গীতিকারের সঙ্খ্যা শতাধিক হইবে—উত্তম, মধ্যম ও অধম। অথচ এই গীতিসাহিত্য মামুলী পুথিনিবদ্ধ সাহিত্য নহে, অধিকাংশই মুখে মুখে প্রচারিত। অনুকরণকাবীদের মধ্যেও দুই একজন 'রামপ্রসাদ' ছিলেন—নীলু-রামপ্রসাদের দলভুক্ত ঈশ্বব গুপ্তের প্রায় সমকালীন কলিকাতা সিমল্যা-নিবাসী ব্রাহ্মণবংশীয় কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ঠাকুর অন্যতম বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু লক্ষ্য কবা আবশ্যক, গুপ্তকবির সংগৃহীত রামপ্রসাদী কবিতার মধ্যে একটিও কবিওয়ালার নহে—গুপ্তকবির সময়ে কবিওয়ালার পদ 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' কবির পদের সহিত মিশ্রিত হইবে, এরূপ কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আমরা নিম্নলিখিত পদটি ত্রিপুরা জিলায় আবিষ্কৃত প্রায় শত বৎসবের পুবাতন একটি পত্রে পাইয়াছিলাম—

মাগ তারা সুরেশ্বরি,
কেন অবিচারে আমার তরে কয়েন দুক্ষের ডিগিরিজারি ॥
একা আমি ছটি পেদা বল্ মা কিসে সমাই করি।
আমার মনে লয় বিশ খরচ দিএ ছয়জনারে প্রাণে মারি ॥
সদরে ওকিল জে জনা টিসমিসে তার আস ভারি।
সে জে বিসম সন্ধি মহাল বন্ধি কোন রূপে আমি হারি ॥
সদরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাব ইষ্টাম্বরি।
রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে দুর্গাং বলে মরি ॥

ইহা কবিরঞ্জন, কবিওয়ালা বা 'দ্বিজে'র রচনা নহে—চতুর্থ এক অজ্ঞাত ব্যক্তির রচনা।

ঈশ্বর গুপ্তের পর প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া যাঁহারা নানা ভাবে সংগ্রহ করিয়া রামপ্রসাদের গান বিপুলায়তন করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা কেহই গুপ্তকবির ন্যায় পরিশ্রম, সাবধানতা ও গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। তাহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ শক্তিসাধক ও সঙ্গীতকার 'দ্বিজ রামপ্রসাদে'র জীবনী ও রচনার সমুচিত আলোচনা বাঙ্গলা সাহিত্যের সমস্ত ইতিহাস হইতে বাদ পড়িয়াছে। রামপ্রসাদী গানের প্রায় চতুর্থাংশ এই দ্বিজরচিত এবং তিনি নিশ্চিতই কবিরঞ্জনের পরবর্ত্তী বা অনুকারী ছিলেন না। কবিরঞ্জনের জীবনীর এক স্থলে গুপ্তকবি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন—"পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্ব্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহারদিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না। কহে "বাসী কাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবে।"—(প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ৭)। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অনুচ্ছেদের প্রতি অদ্য পর্য্যন্ত কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই। দয়াল ঘোষ লিখিয়াছিলেন—"পূর্ব্ব-বাঙ্গলার অনেকেরই এরূপ অবগতি, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ 'দ্বিজ' ছিলেন।" (প্রসাদপ্রসঙ্গ, ১ম সং, ভূমিকা, পৃ. ১৩)। তিনি তাঁহার বাড়ীর সন্ধানও পাইয়া লিখিয়াছিলেন—"কেহ বলিল, তাঁহার বাড়ী মহেশ্বরদি পরগণায়," (ঐ, ঐ, পৃ. ৯) এবং কোন্ গান কবিরঞ্জনের রচিত ও কোন্ গান

দ্বিজের রচিত, তাহারও বিভাগ একমাত্র তিনিই অবগত হওয়ার অনেকটা সুযোগ পাইয়াছিলেন। এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন :—

"কবিরঞ্জনের 'কাব্যসংগ্রহে' যে সকল সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও কোন কোনটা দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন।"—(ঐ, পৃ. ১৫)। এই সকল মূল্যবান্ প্রমাণসূত্র অর্ব্বাচীনের মত উপেক্ষা করিয়া দয়াল ঘোষই দ্বিজ রামপ্রসাদের বিবরণাদি বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছেন। ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণায় সামান্য অনুসন্ধান করিলেই রামপ্রসাদের বিষয়ে বহু তথ্য তৎকালে জীবিত প্রাচীনদের নিকট তিনি জ্ঞাত হইতে পারিতেন। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে যে কয় জন লেখক দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহই পরিশ্রমসাধ্য কিছু মাত্র সত্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই, কেবল সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া গবেষণার ক্ষেত্রকে কলুষিত করিয়াছেন।[১৩]

আসাম-বঙ্গ রেলপথের ভৈরব-টঙ্গী শাখার জিনার্দ্দি স্টেশনের সংলগ্ন পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত "চীনীশপুরে"র কালীবাড়ী দ্বিজ রামপ্রসাদের সাধনক্ষেত্র। স্থানটি অত্যন্ত দুর্গম ছিল এবং রেল খোলার পরও খুব সুগম নহে। আমরা একাধিক বার ঐ কালীবাড়ী দর্শন করিয়াছি এবং তৎসম্পর্কিত দলীলপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। রামপ্রসাদ ঠাকুর (স্থানীয় ডাকনাম ছিল 'পেদুঠাকুর') প্রবাদ অনুসারে কামাখ্যায়

১৩। কৈলাস সিংহ 'সাধকসঙ্গীতে'র ২য় সংস্করণে (১৩০৬ সনে) রামপ্রসাদ 'ব্রহ্মচারী'র অস্তিত্ব প্রথম স্বীকার করেন, কিন্তু জন্মস্থান ব্যতীত তাঁহার বিবরণ কিছুমাত্র সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন নাই। কেবল, স্বকীয় মজ্জাগত বৈষ্ণববিদ্বেষের ফলে কবিরঞ্জনের প্রতি অবিচার করেন (অবতরণিকা, পৃ. ৪৬-৫৯)। অতুল বাবুর গ্রন্থে (পৃ. ২৪৬-৫৮) দ্বিজ রামপ্রসাদের প্রতি ততোধিক অবিচার করা হইয়াছে।

সিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে দেবী প্রসন্না হইয়া ব্রহ্মপুত্রের 'পূব পারে' (অর্থাৎ বর্ত্তমান ত্রিপুরা জিলার উত্তরাংশে) অবস্থিত স্বগৃহে যাইতে স্বীকৃত হন।[১৪] রামপ্রসাদ পথপ্রদর্শন করিয়া অগ্রে যাইবেন এবং দেবী পশ্চাতে নূপুরধ্বনি করিয়া চলিবেন, কিন্তু রামপ্রসাদ ফিরিয়া তাকাইতে পারিবেন না। ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে আসিয়া বর্ত্তমান চীনীশপুর গ্রামে চরের বালুকা ঢুকিয়া নূপুরধ্বনি বন্ধ হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে যে স্থানে একটি মনোহর "ত্রিবট" রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে রামপ্রসাদ ফিরিয়া তাকাইলেন। ঠিক যে স্থানে রামপ্রসাদকে মুহূর্ত্তের জন্য সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন, সেখানে পঞ্চমুণ্ডী আসন ও তদুপরি পরে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অদ্য পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর 'বৈশাখী অমাবস্যা'য় রামপ্রসাদের সাধনক্ষেত্রে সমারোহের সহিত উৎসব হইয়া আসিতেছে। প্রবাদ অনুসারে ঐ তিথিতেই তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ পার্শ্ববর্ত্তী টেঙ্গুরীপাড়া গ্রামে জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে দেবীর আদেশে বিবাহ করিয়া চীনীশপুরে বাস স্থাপন করেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা জন্মিয়াছিল, নাম জগদীশ্বরী। রামপ্রসাদের এক দৌহিত্রের দৌহিত্রীর পুত্র মহেশ্বরদির ব্রাহ্মণসমাজের শীর্ষস্থানীয় পারলীয়ার চক্রবর্ত্তিবংশীয় ঈশানচন্দ্র (২৬।৭।১৩২৬ সালে ৮৩ বৎসর বয়সে স্বর্গত) দেবোত্তর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের মালিক ছিলেন। তদীয় পৌত্র শ্রীমান্ কুলভূষণ

১৪। আর্য্যদর্পণে (১৩১৯-২০ সনে) দ্বিজ রামপ্রসাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটি অতি বিস্ময়কর কথা প্রচারিত হয় (মাঘ ১৩১৯, পৃ. ২৩২-৪০) যে, রামপ্রসাদ রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর ভাই ছিলেন—ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক (সা-প-প, ৫২, পৃ. ১০-১১ দ্রষ্টব্য)।

চক্রবর্ত্তী এম্ এ রামপ্রসাদের একমাত্র বংশধর।[১৫] সিদ্ধিলাভের পর বেশী বয়সে পুনঃ বিবাহ করিয়া রামপ্রসাদ প্রায় ১৭৪৫-৫০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে চীনীশপুরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি কবিরঞ্জন অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা, দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণ ও কতিপয় স্থানীয় সহচরের পরিচয়াদি আমরা অন্যত্র লিখিয়াছি (সা-প-প, ৫২, পৃ. ৯-১৬)। বিক্রমপুরে গত শতাব্দীতে রাজমোহন আম্বলী তর্কালঙ্কারের (৩০।৭।১২৩১—১৮।৩।১২৯৩ সাল) গান বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার জীবনী ও গান মুদ্রিত হইয়াছে (ঢাকা, ১৩২৪)। তিনি চীনীশপুরে আত্মকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন (জীবনী, পৃ. ১।০) এবং তিনটি গানে (৮৪, ৯২ ও ১০৩ সংখ্যক) 'রামপ্রসাদের বর' পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন। যথা,

হলি কেশ ফুলি কদলীবৃক্ষ, নাম রটেছে দেশবিদেশে।
অ, তুই রামপ্রসাদের বর পেয়ে, রাজমোহন হলি বর পরশে॥ (পৃ. ৭১)

রামপ্রসাদের তুলনা দেয় তার রোমের যোগ্য না হই রে ভাই।
যেন তৃণকে পর্ব্বত করে নামের প্রভায় আমিও তাই॥
রামপ্রসাদের বর পেয়েছি রাজমোহন কয় ঐ জোড়ে ভাই।
আমি দেশবিদেশে নাম রটালেম যমের সঙ্গে করে বড়াই॥ (পৃ. ৬৩)

১৫। নামমালা যথা :—রামপ্রসাদ—জগদীশ্বরী (=কেবলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)—মধুসূদন—ভৈরবী (=রামনরসিংহ চক্রবর্ত্তী)—বিশ্বেশ্বরী (=মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি)—ঈশান—চন্দ্রকিশোর (আর্য্যদর্পণের প্রবন্ধকার, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সনে স্বর্গত, নিঃসন্তান) ও কালীচন্দ্র—কুলভূষণ। নিঃসন্তান পুরুষের নাম পরিত্যক্ত হইল। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কুলভূষণের জ্ঞাতি বটেন।

রাজমোহন কস্মিন্ কালেও হালিশহরে আসেন নাই এবং কবিরঞ্জনের 'রা' পাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পূর্ব্বাঞ্চলে দ্বিজ রামপ্রসাদের উপর জনসাধারণের এবং শ্রেষ্ঠ সাধক ও পণ্ডিতদের অসামান্য ভক্তি প্রমাণসিদ্ধ করিয়া গুপ্তকবির পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির আশ্চর্য্য সমর্থন রাজমোহন এ স্থলে যোগাইয়াছেন। তাঁহার সহিত রামপ্রসাদের তুলনা হয় সাধন বিষয়ে ও গান রচনায়। রামপ্রসাদের মালসী গানের ভাব, ভাষা ও সুর কবিরঞ্জনের তুল্য এবং তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে "বেড়া বাঁধা" ঘটনাটি অতি প্রসিদ্ধ। রাজমোহনের তিনটি গানে (৩২, ১১৫ ও ২৯২ সংখ্যক) বেড়া বাঁধার উল্লেখ আছে। কবিরঞ্জন সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রচারিত আছে—গুপ্তকবি তদুপরি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এই সকল ঘোষণা প্রসাদ স্বয়ং কখনই করেন নাই, কেন না তাহা হইলে তাঁহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইহার কোন কথা উল্লেখ থাকিত।"—(পৃ. ৮)। পক্ষান্তরে, পূর্ব্ববঙ্গে নিম্নলিখিত গানে তাহা ঘোষিত হইয়াছিল :—

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তিদড়া॥
তনয় থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভাল বাসে বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে।
ক'রে দণ্ড দু চার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবরছড়া॥
ভাই বন্ধু সুত দারা, কেবলমাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কল্‌সি, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া॥

যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥
('প্রসাদপ্রসঙ্গ,' ১ম সং, পৃ. ১৫-৬)

গানটি গুপ্তকবি পান নাই এবং 'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহে'ও নাই। পূর্ব্ববঙ্গে গায়কের মুখে এই গান আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি। কবিরঞ্জনের পদাবলী হইতে পৃথক্ করিয়া দ্বিজ রামপ্রসাদের গান একত্র সঙ্কলিত হওয়া আবশ্যক—এই কার্য্য অধুনা দুরূহ ও পরিশ্রমসাধ্য, কিন্তু অসম্ভব নহে। বলা বাহুল্য, কবিরঞ্জনের ন্যায় দ্বিজ রামপ্রসাদ প্রযত্নসাধ্য কোন কাব্যাদি রচনা করেন নাই—তাঁহার সাধনসঙ্গীতই তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তাঁহার রচনার নিদর্শনস্বরূপ পাঁচটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

মন কেন রে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছো বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে, কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয় এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে, তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত॥
এ কি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত।
ও মন, মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত।
যে জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবে রে তোর তেম্নি মত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মন কর রে মনের মত।
ও মন, গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত॥
('প্রসাদপ্রসঙ্গ,' ১ম সং, পৃ. ২)

মা বসন পর।

বসন পর বসন পর মা গো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা পদে দিব আমি গো॥
কালীঘাটে কালী তুমি মা গো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী, গোকুলে গোপিনী গো॥
পাতালেতে ছিলে মা গো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো॥
কার বাড়ী গিয়াছিলে মা গো কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্ত জবা গো॥
ডানি হস্তে বরাভয় মা গো, বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো॥
অসিতে রুধিরধারা মা গো গলে মুণ্ডমালা।
হেট মুখে চেয়ে দেখ পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোনার মুকুট মা গো ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনে পাগল পতি পাগল মা গো আরও পাগল আছে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে গো॥

(ঐ, পৃ. ৪৩-৪)

আছে বলদ বয় না হালে।
আমার আবাদ জমি পতিত রইলে॥

এক হালের হালুয়া যারা, তাদের পঞ্চ রতন ফলে।
আমার তিনখানি হাল পোড়াকপাল, অন্ন পাই না কোন কালে॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে সঙ্গে ছিল মনা বেটা সে পড়িল বিষম ভুলে।
সে যে বীজ খেয়েছে, সব লুটেছে, ঘুম দিয়াছে ক্ষেতের আইলে॥

('আর্য্যদর্পণ,' আশ্বিন ১৩২০, পৃ. ১৩৩)

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দি, তালুক হয় না লাটে বন্দি, মা।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী॥
নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা, মা।
জয়দুর্গার নামে জমা আঁটা, ঐটা করি মালগুজারি॥
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ, মা।
আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারি॥

(প্রসাদপ্রসঙ্গ হইতে)

আমার ঘরে নবদ্বারে, শমন রইল থানা করে।
ঘরে গুরু নাভিস্থল, তাতে মনার বলাবল,
সে ঘরে মন বিরাজ করে॥
প্রহরি ফিরে দশ পাঁচ ছয়, মনে বড় সন্দ হয়,
কপাট নাই মা সে সব দ্বারে॥
ঘরচোরা যদি চুরি করে, মাটি দেয় কিবা পুড়ে তারে,
প্রসাদ বলে মাণিক গেলে, ঘরের আদর কেউ না করে॥

(আর্য্যদর্পণ, ১৩২০, পৃ. ১৩৩)

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

প্রকাশক

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্তিক ১৩৫৯

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

৭'২—১১।১১।১৯৫২

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৮—১৯২৯

বাংলা-সাহিত্যে লঘুরস-স্রষ্টা, বিচিত্র সন্দর্ভকার এবং সহৃদয় সমালোচকরূপে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও নিজের অক্লান্ত চেষ্টা ও অসামান্য ধীশক্তিবলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিতে এবং অবশেষে একজন কৃতী অধ্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হন। বস্তুতঃ ইংরেজী-সাহিত্যের অধ্যাপনায় তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন ও বিপুল যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিকার দিনেও বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ললিতকুমারের অধ্যয়নানুরাগ ছিল অপরিসীম। বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিয়া যে অমৃত তিনি আহরণ করিয়াছিলেন, শুভ্র অনাবিল হাস্যরসে অভিসিঞ্চিত করিয়া তাহা তিনি এমন উপভোগ্যরূপে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন যে, দীর্ঘকাল তাহা গৌড়জনের আনন্দবিধান করিবে।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১২৭৫ সালের ১৯এ কার্ত্তিক (৩ নবেম্বর ১৮৬৮) নদীয়া জেলার শান্তিপুরে দত্ত-পাড়ায় মাতামহ নসীরাম মুখোপাধ্যায়ের আলয়ে

ললিতকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নবীনচন্দ্রের নিবাস—নদীয়া জেলার মুড়াগাছার নিকটবর্ত্তী কাঁচকুলি গ্রামে। বংশের মধ্যে ইনিই প্রথম ইংরেজী শিক্ষা করেন। যৌবনকাল হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত তিনি ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নবীনচন্দ্রের পূর্ব্বগামিগণ সকলেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং অধ্যাপনাই তাঁহাদের উপজীবিকা ছিল; তাঁহার খুল্লতাত হরিনাথ ন্যায়রত্ন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

ললিতকুমারের মাতার নাম—কুসুমকামিনী দেবী। তিনি মাতার একমাত্র সন্তান, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পর বেশী দিন মাতৃস্নেহ উপভোগ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ললিতকুমারের বয়স যখন মাত্র দশ মাস, তখন সর্পাঘাতে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয় (শ্রাবণ ১২৭৬—ইং ১৮৬৯)। মাতৃবিয়োগের পর ললিতকুমার পিতামহীর নিকট প্রতিপালিত হন।

বিদ্যাশিক্ষা

নবীনচন্দ্র নিজে পুত্রকে শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার আয়াস ও যত্নে ললিতকুমারের শিক্ষার বুনিয়াদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৩১ সালের ১২ই আষাঢ় (ইং ১৯২৪), ৮২ বৎসর বয়সে নবীনচন্দ্র পরলোকগমন করেন। ললিতকুমারের জীবনে তাঁহার পিতার প্রভাব কম নয়। বিদ্যানুরাগ, অধ্যাপনাক্ষেত্রে কৃতিত্ব, মাতৃ-ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ ললিতকুমার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন।

ললিতকুমারের পিতা যখন নদীয়া জেলার হাতীশালা এম-ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সেই সময়ে এই বিদ্যালয় হইতে ললিতকুমার ১৮৭৯ সনে, ১১ বৎসর বয়সে, তৃতীয় বিভাগে মাইনর পরীক্ষা পাস করেন। পর-বৎসর ১৮৮০ সনে তিনি মুড়াগাছা এইচ-ই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন এবং এখানে দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ছাত্রজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৮৮২, নবেম্বর মাসে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১০৲ টাকা বৃত্তি পান।

দরিদ্র পরিবারের সন্তান হইলেও নিজের চেষ্টায় সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি উচ্চশিক্ষালাভের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন; একটি রস-রচনায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন :—

> "...লালনের বয়স পার হইয়া যখন বিদ্যালাভে ব্রতী হইলাম, মাতৃভাষায় বর্ণপরিচয়াদি শেষ করিয়া ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিলাম, তখন স্বগ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অপর একটি গ্রামে পিতৃদেব (তথায় ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন) পাঠের সুবিধার জন্ত আমাকে লইয়া গেলেন; তথাকার জমিদারগৃহে পরিবারস্থ বালকের ন্যায় আশ্রয় পাইলাম।...
>
> প্রবাস-জীবন যাপন করিয়া মাইনার্ পাস করিয়া স্বগ্রামে আসিয়া বসিলাম এবং গ্রাম হইতে মাইলখানেক দূরবর্ত্তী গ্রামান্তরের এনট্রান্স স্কুলে [মুড়াগাছা এইচ-ই স্কুলে] ভর্ত্তি হইলাম।...দুই বৎসর পাঠের পর এনট্র্যান্স পরীক্ষার বৎসর পিতৃদেব আমাকে গৃহবাস-সুখে বঞ্চিত করিয়া, পাঠের সুব্যবস্থার জন্ত জেলার সদরে, গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরে চালান দিলেন [ফেব্রুয়ারি ১৮৮২]। শান্তিময়

পল্লীজীবন হইতে, খাস্থ্যসুখময় গৃহস্থ-ঘরে বাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহরে ছাত্রাবাসে বাস করিতে সুরু করিলাম।...বৎসর না ঘুরিতেই ভাগ্যদেবতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মা-সরস্বতীর কৃপায় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস হইলাম। (এখনকার মত তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বিভাগে পাসের সদাব্রত খোলেন নাই, সুতরাং) মা-লক্ষ্মীরও দয়া হইল, পরীক্ষায় বৃত্তি পাইলাম। অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘুচিল, পিতৃদেবের কষ্টার্জিত অল্প আয়ের উপর আর শিক্ষাকর (Education cess) বসাইবার প্রয়োজন হইল না। উক্ত সহরেই এফ এ পড়িতে প্রবৃত্ত হইলাম, মেস হইতেও কলেজ-হোষ্টেলে উন্নীত হইলাম।... তাহার পর এফ এ পরীক্ষায় [এপ্রিল ১৮৮৫] আমার মত দরিদ্র-সন্তানদের পক্ষে মবলগ টাকা স্কলারশিপ পাইয়া কলিকাতায় [মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে, জুন ১৮৮৫] বি. এ. পড়িতে আসিলাম; ব্যয় বাড়িল বটে, কিন্তু আয়ও তেমনি বাড়িল, সুতরাং 'হরে দরে হাঁটু জল' দাঁড়াইল। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি না হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে ভর্ত্তি হইলাম—তাহাতে খরচার বেশ একটু সাশ্রয় হইল।...

যথাসময়ে সম্মানের সহিত বি. এ. পাস হইলাম। এবারও মোটা টাকা জলপানি পাওয়াতে সাবেক চাল বজায় রহিল। 'সব ভাল যার শেষ ভাল' এই প্রবাদবাক্যের উপর ভর করিয়া শেষ পরীক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে, (premier) সেরা কলেজে, [১৮৮৭, জুন মাসে] ভর্ত্তি হইলাম।" ("ভোজন-সাধন" : 'সাহারা' দ্র°)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ললিতকুমার বিবিধ বৃত্তি এবং পদকাদি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার পরীক্ষার ফলগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইং নবেম্বর ১৮৮২...এনট্রান্স...কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল—১ম বিভাগ, 'বয়স ১৪'।

এপ্রিল ১৮৮৫...এফ. এ....কৃষ্ণনগর কলেজ...শীর্ষস্থান।

১৮৮৭...বি. এ....মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশন, ১ম বিভাগ, ইংরেজীতে অনার্স—৮ম স্থান। ১ম বিভাগ, সংস্কৃতে অনার্স—প্রথম স্থান। সর্ব্বসাকল্যে শীর্ষস্থান।

১৮৮৮...এম. এ....প্রেসিডেন্সী কলেজ, ইংরেজীতে, ১ম বিভাগ, শীর্ষস্থান।

বিবাহ

উপনয়ন সংস্কারের (২৩-১-৮০) পর-বৎসর ১৮৮১, ১লা মার্চ (১৯ ফাল্গুন ১২৮৭) রংপুর জেলার কুণ্ডী-পরগণার চন্দনপাটের ছোট তরফের জমিদার উমানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা জগত্তারিণী দেবীর সহিত ললিতকুমারের বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বাল্যাবস্থা, বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। বিবাহের পর-বৎসর তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল। নিজের কোন রচনায় তিনি আভাসে ইঙ্গিতে সুগভীর পত্নীপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। বাল্যবিবাহের বিরোধী এক উকীল বন্ধুকে তিনি একবার বলিয়াছিলেন—"বাল্যাবস্থায় আমার বিবাহ হইয়াছে ; আমার স্বাস্থ্যের হানি ঘটে নাই এবং বিদ্যাশিক্ষারও কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই। বাল্যবিবাহ সত্ত্বেও আমি সম্মানের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলি লাভ করিয়াছি।"

অধ্যাপনা

অধ্যাপক-বংশে ললিতকুমারের জন্ম। তিনি ছাত্রাবস্থার অবসানে বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, অন্য চাকুরীর চেষ্টা না করিয়া ২০ বৎসর বয়সে অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হন। কিন্তু অধ্যাপক-জীবনের গোড়ার দিকে তাঁহার পক্ষে এক কলেজে বেশী দিন কাজ করা সম্ভবপর হয় নাই। এই সময় তাঁহাকে নানা ঘাটের জল খাইতে হইযাছিল।

ললিতকুমারের আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রখর—তাঁহার চরিত্রে ব্রাহ্মণোচিত জ্ঞানানুশীলন-তৎপরতার সঙ্গে তেজস্বিতার এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছিল। চাকুরী-জীবনের প্রারম্ভের দিকে যখনই কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় এবং অসঙ্গত ব্যবহারের সঙ্গে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছার সংঘাত বাধিয়াছে,—আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চাকরি করা অসম্ভব বলিয়া মনে হইযাছে, তখনই তিনি কর্ম্মত্যাগেও কুণ্ঠিত হন নাই।

ললিতকুমার প্রথমে বরিশালেব জমিদার আনন্দলাল রায় ও তদীয় ভ্রাতা ব্যারিষ্টার পি. এল. রায়-প্রতিষ্ঠিত রাজচন্দ্র কলেজে ১৮৮৯ সনের জুন মাসে ১৩০৲ টাকা বেতনে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। কিন্তু শীঘ্রই একটি কারণে এখানকার চাকরির উপর তাঁহার মন বিরূপ হইয়া উঠিল। জমিদাবী সেরেস্তায় যে-ভাবে চাকরি করিতে হয়, চাকরি বজায় রাখিবার জন্য ললিতকুমাবের পক্ষে এখানেও সেই ভাবে থাকিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা তাঁহার বরদাস্ত হইল না; ১৮৯০ সনের মে মাসে তিনি এই কাজ ছাড়িয়া দেন।

এই বৎসরেই জুলাই মাসে ললিতকুমার ভাগলপুর টি. এন. জুবিলী কলেজে মাসিক ১২৫৲ বেতনে যোগদান করেন। তাঁহার মাতুল—

হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ললিতকুমারকে নিজের কাছে লইয়া আসেন, কিন্তু ললিতকুমার মাত্র দুই মাস কাজ করিবার পর বাড়ীর কাছে হইবে বলিয়া বহরমপুর কলেজে চলিয়া আসেন।

বহরমপুর কলেজে ললিতকুমার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল (৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯০—২ আগষ্ট ১৮৯৩) যুক্ত ছিলেন। এই কলেজে তিনি ১৬০৲ বেতনে নিযুক্ত হন; তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন দার্শনিকপ্রবর ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে ললিতকুমারের জন্ম এবং তিনি বংশের ধারা বজায় রাখিয়া চলিতেন। কোন ব্রত উপলক্ষে মহারাণী স্বর্ণময়ীর কিছু দান তাঁহার বাড়ীতে প্রেরিত হয়। ললিতকুমার উহা গ্রহণ না করিয়া ফেরত দেন। এই ব্যাপারে তিনি রাজ-কর্ম্মচারীদের বিরাগভাজন হন। এ অবস্থায় অধিক দিন বহরমপুরে থাকা সুবিধা হইবে না বুঝিয়া তিনি নূতন কর্ম্ম লাভের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন।

সুযোগ মিলিয়া গেল। ললিতকুমার মাসিক ২০০৲ বেতনে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে যোগদান করিলেন (৭ আগষ্ট ১৮৯৩)। এই কলেজেও বেশী দিন চাকরি করা তাঁহার পোষাইল না। এখানে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা অধ্যাপকদের হীনচক্ষে দেখিতেন ও অবজ্ঞা করিতেন। তাহা ছাড়া ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন উত্তেজনায় রাজাশ্রয়ে থাকিয়া ব্রাহ্মেরা হিন্দু আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের নিন্দা করিতেন। ললিতকুমার প্রকাশ্যভাবে এই দুইটি জিনিসেরই প্রতিবাদ করেন ও তাহার জন্য স্থানীয় রাজশক্তির কোপে পতিত হন। আত্ম-সম্মান বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি কুচবিহারের কাজ ছাড়িয়া দেন (১৮ আগষ্ট ১৮৯৪) এবং মফস্বলের চাকরির উপর বীতস্পৃহ হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

প্রবাসে কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা ললিতকুমার তাঁহার একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। নীরস তথ্যও যে তাঁহার নিজস্ব সরস রচনাভঙ্গীর গুণে কিরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিত, উক্ত প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

> "বাল্যেই বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রবাসে গিয়াছিলাম ; কিন্তু সে বাসগ্রামের নিকটেই এবং সেখানে পরগৃহে নিজগৃহের মত আশ্রয় পাইয়াছিলাম। পঠদ্দশার শেষ কয় বৎসর কলিকাতাবাসী হইয়াছিলাম, কিন্তু বিদেশ হইলেও কিছু দিন বাসের পর কলিকাতা আর প্রবাসভূমি বলিয়া বোধ হইত না, সুহৃৎসতীর্থ-সমাজের সহবাসে সুখে কাল কাটাইতাম।
>
> কিন্তু এইবাব প্রকৃতই প্রবাসী হইতে হইল—একেবারে তিনটা জেলা পার হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের ববিশাল সহরে প্রথম চাকরি জুটিল।··· গ্রহের ফেরে এক বৎসর তথায় স্থিতিকাল—এই এক বৎসরকে 'অজ্ঞাতবাস' বলা যাইতে পারে।···আমি আহারের কষ্টে এই 'লক্ষ্মীমন্ত' (বালামের) দেশে 'লক্ষ্মীছাড়া' অবস্থায় এক বৎসরের অধিক কাল টিকিতে পারি নাই, গ্রীষ্মের ছুটিতে 'দেশে' ফিরিয়া আর 'সেমুখো' হই নাই।
>
> গ্রীষ্মের ছুটিব পর মাসখানেক বেকার বসিয়া থাকিয়া ('সো বি আচ্ছা') আবার প্রবাসযাত্রা করিলাম—এবার পূর্ব্বে না গিয়া 'পশ্চিমে'—ভাগলপুরে। তবে বেহারে গিয়াও বেঘোরে পড়ি নাই ; মাতুল মহাশয় তথাকার কলেজেব অধ্যক্ষ ছিলেন।···এমন সুখের মিলনেও সেখানে কিন্তু কার্য্যগতিকে দুই মাসের বেশী তিষ্ঠিতে পারিলাম না। · এক বৎসর পূর্ব্বে চাকরিতে প্রবৃত্ত হইবার সময় যে দুই সুট্ পোষাক তৈয়ার করাইয়াছিলাম, সেগুলি না ছিঁড়িতেই

ভাগলপুরের বাক্‌তায় দুই সুট্ পোষাক বড় মাপে তৈয়ার করাইয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম দিগ্বিজয় করিয়া আবার বাঙ্গালা মুলুকে ফিরিলাম।

শুধু বাঙ্গালা মুলুকে কেন, (বহরমপুরে) এক রকম নিজের 'দেশে'ই ফিরিলাম—কেন না, নদীয়া মুর্শিদাবাদ পাশাপাশি জেলা এবং কৃষ্ণনগর হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত একটি বাঁধা সড়ক আছে।... এখানে তিন বৎসর টিকিয়া ছিলাম। এক কলিকাতায় ভিন্ন আর কোথাও এত দিন থাকা ঘটে নাই। এই তিনটি বৎসর আমার চাকরির জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের দিন ছিল। এইখানে চাকরি-জীবনে প্রথম মাতৃসমা ঠাকুরমাতা ও সংসার-সঙ্গিনীকে আনিয়া ('নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধুঃ') প্রবাসকে সুখাবাসে পরিণত করিয়াছিলাম।...

'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্'—ইহা হইল সংসারবিরাগী আজীবন-সন্ন্যাসীর উপদেশবাক্য; সংসারী বাল্যবিবাহিত লেখক কি সেই উপদেশ-বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন? এক বার কিঞ্চিৎ আর্থিক উন্নতির লোভে, দেবোপম মাতুল মহাশয়ের সামীপ্য ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলাম, আবার আরও কিঞ্চিৎ লাভের লোভে 'কনক-মৃগতৃষ্ণাঙ্কিতধী' হইয়া বহরমপুরের পাতান সংসার উঠাইয়া, সাজান বাগান ভাঙ্গিয়া, নিজের অঞ্চল হইতে বহু দূরে 'উত্তরস্যাং দিশি' কুচবিহারে একাকী ট্রেনমারুহ্য উধাও হইলাম—'পূর্ব্বাপরৌ' অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিম দিগ্বিজয় হইয়াছিল, এইবার উত্তর দিকে উত্তরণ।...কিন্তু মন বসিল না। কেন না, গৃহিণী সে সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিলেও আমার সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এ অবস্থায় শুধু অর্থোন্নতিতে, তথা শেষ বয়সে রাজসরকার হইতে পেন্‌শানের আশায়ও মন বাঁধিতে পারিলাম না, প্রাণটা কেবলই

উড়ু উড়ু করিত।...অগত্যা বৎসর ঘুরিতেই কলিকাতার চাকরি স্বীকার করিয়া ইংরেজী কেতায় চরণযুগল হইতে কুচবিহারের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিলাম। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর তিন দিক্ জয় করিয়া বাকী দিক্‌টাও জয় করিতে দক্ষিণে যাত্রা করিলাম।

এত দিনে ঘুরণচক্রের শেষ হইল; পাঁচ বৎসরে পাঁচ জায়গায় না হইলেও চারি ঘাটের জল খাইয়া কলিকাতার কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র কলিকাতার কলেজেই ফিরিয়া আসিল।" ("ভোজন-সাধন": 'সাহারা' দ্র°)

কলিকাতায় ফিরিয়া ললিতকুমার আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত রিপন কলেজে (বর্ত্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ২১০৲ বেতনে যোগদান করেন (২০ আগষ্ট ১৮৯৪)। এই কলেজে তখন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আর গণিতের অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের কোন কাজে সুরেন্দ্রনাথ সকল অধ্যাপকের বেতন হইতে চাঁদা হিসাবে কিছু টাকা কাটিয়া লইয়া কলেজের মাহিনা দেন। এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া ললিতকুমার চাকরি ছাড়িয়া দেন (৩০ জুন ১৮৯৭)।

পরবর্ত্তী ৭ই জুলাই (১৮৯৭) হইতে ললিতকুমার একযোগে দুইটি কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন;—আচার্য্য গিরিশচন্দ্র বসুর বঙ্গবাসী কলেজে ১৩৫৲ বেতনে সপ্তাহে ১১ ঘণ্টা ও মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ১২৫৲ বেতনে সপ্তাহে ৯ ঘণ্টা। এই ভাবে পাঁচ বৎসর কাজ করিবার পর শেষে তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের কাজ ছাড়িয়া দিয়া ১৯০২ সনের ৭ই আগষ্ট হইতে মাসিক ২৫০৲ বেতনে বঙ্গবাসী কলেজে পুরাপুরিভাবে নিযুক্ত হন। এইখানেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটাইয়া গিয়াছেন; প্রায়

৩২ বৎসর তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। বহু ছাত্র তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়া এই কলেজে যোগদান করিয়াছে।

ললিতকুমার ছিলেন সুপণ্ডিত আদর্শ শিক্ষক—অধ্যাপনাকালে তিনি ছাত্রদিগকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যাপ্রণালী এতই হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, তাহা শুনিবার লোভে অন্যান্য কলেজের ছাত্রেরা প্রায়ই তাঁহার ক্লাসে আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার অধ্যাপনারীতির বৈশিষ্ট্য কি ছিল, এবং ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার কিরূপ হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে বিষয়ে তাঁহার প্রাক্তন ছাত্র,—একদা 'মাসিক বসুমতী'র অন্যতর সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে-সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক। নিম্নে তাঁহার রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "আমরা প্রথম যৌবনে অধ্যাপক ললিতকুমারের শিক্ষকতায় সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার একান্ত অনুরক্ত গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা কলেজ-জীবনে একাধিক য়ুরোপীয় ও দেশীয় অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তন্মধ্যে শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ বি, মুখার্জি, অধ্যক্ষ মিঃ য়ো, মিঃ ম্যান, মিঃ পার্সিভ্যাল, মিঃ হিল, পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ কয়েক জন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের সহিত ছাত্রবর্গের কেবল স্কুল-কলেজের সম্পর্ক ছিল না, ইঁহারা ছাত্রগণের অতি আপনার জন ছিলেন।...ছেলেদের আমোদ-প্রমোদে অধ্যাপকরা ত যোগদান করিতেনই, অধিকন্তু তাঁহারা কেবল 'লেক্‌চার' দিয়াই তাঁহাদের

কর্তব্য শেষ করিতেন না। আমাদের শিক্ষার জন্য তাঁহারা অশেষ পরিশ্রম করিতেন।...

কত যত্ন করিয়া তখনকার কালে অধ্যাপকরা পাঠ দিতেন।... তাঁহার নিকট যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চিতই বলিবেন, তাঁহার ন্যায় parallel passage দিয়া অর্থ বুঝাইতে তখনকার কালে (এখনকার কালে আছেন কি না জানি না) কেহ ছিলেন না।...কিন্তু অধ্যাপক ললিতকুমার কেবল ইংরাজী সাহিত্যে নহে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। এজন্য যখনই কোন বিদেশী কবির মনোরম কাব্যের কোন একটা ভাবের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হইত, তখনই তিনি মুহূর্তমধ্যে আমাদের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অগাধ সমুদ্র হইতে রত্ন আহরণ করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতেন। কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যেন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সেই উৎস হইতে উদ্গত ভাবধারার সহিত ইংরাজী রচনার যেখানে সামঞ্জস্য ঘটিত, ললিতকুমার তাহা তৎক্ষণাৎ পরম প্রীতিভরে প্রফুল্লচিত্তে সুষ্ঠু আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।

তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, যখন তিনি অমর কবি সেক্সপীয়ারের কোন নাটকের পাঠ দিতেন, তখন ছাত্রগণকে এক এক ভূমিকা আবৃত্তি করিবার ভার দিতেন এবং স্বয়ং কোন একটি ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। যেন প্রকৃতই মহাকবির নাটকীয় চরিত্রের অভিনয় হইতেছে, এইরূপই প্রতীয়মান হইত। মিঃ রো-ও এই ভাবে সেক্সপীয়ার পড়াইতেন। উহাতে শিক্ষার্থীর মনে চরিত্র-চিত্র যেরূপ স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত, তাহা কেবল 'লেকচার' ও 'নোট' দানে কখনই হওয়া সম্ভবপর হইত না।

ছাত্রগণের সহিত সুষ্ঠু ও সরস রসালাপে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার মধ্যে হাস্যরসের যে অফুরন্ত উৎস ছিল, তাহা

হইতে নানা পীযূষধারা দান করিয়া তিনি নীরস পাঠ্য পুস্তকের বিশ্লেষণে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিতেন। শিক্ষকের পক্ষে ইহা সামান্য গুণের কথা নহে।” (‘মাসিক বসুমতী,’ পৌষ ১৩৩৬, পৃ. ৪১৪-৬)

ললিতকুমার সারা জীবন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। সেক্সপীরিয়ান্ স্কলার হিসাবে তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। ‘কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব’ প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি সেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটকের চরিত্রসমূহের সঙ্গে বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্রাবলীর যে তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি যে সেক্সপীয়রের নাটকাবলী উত্তমরূপে অধিগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

মৃত্যু

শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের দুঃখদৈন্যপীড়িত কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসর-মুহূর্ত্তগুলিকে আনন্দময় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে রসরচনা পরিবেশনে যাঁহার ক্লান্তি ছিল না, উপর্য্যুপরি আত্মজবিয়োগজনিত শোকের আঘাতে তাঁহার শেষের দিনগুলি দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। “শেষ দিকে বিশ্বেশ্বরের বিধানে আমার হাসির ফোয়ারা শুকাইয়াছে। এক্ষণে চক্রীর চক্রের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে আমার জীবন সম্পূর্ণভাবে ‘সাহারা’য় পরিণত হইয়াছে”—ললিতকুমারের নিজের এই কথাগুলির মধ্যে তাঁহার শোকজর্জ্জর অন্তরের আর্ত্তি যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে তাঁহার জীবনসঙ্গিনী পর্য্যন্ত যখন চিরতরে তাঁহার মায়া কাটাইয়া লোকান্তরিতা হইলেন, তখন অপরিমেয় শোকের আঘাতে তিনি বেদনায় একেবারে

মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। এই সময় তিনি সহৃদয় বন্ধু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন :—"আমার সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে কি? মনে হয়,—না।"—"৪৮ বৎসর বিবাহিত জীবন—শেষ ৪০ বৎসর প্রায় অবিচ্ছেদ। এমন ভাগ্য কয় জনের হয়?" বিপত্নীক ললিত-কুমারকে কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। ইহার ছয় মাস যাইতে-না-যাইতেই ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ (২৯ নবেম্বর ১৯২৯) তারিখে, ৬১ বৎসর বয়সে মাত্র সামান্য কয়েক দিনের অসুস্থতায় তিনি মহাপ্রস্থান করেন।

রচনাবলী

ললিতকুমারের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনীমধ্যে মুদ্রিত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত :

১। **ছড়া ও গল্প** (সচিত্র, শিশুপাঠ্য)। ? (১ ডিসেম্বর ১৯১০)। পৃ. ৩২।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-লিখিত ভূমিকা সহ। "পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের দশটি গল্প।"

২। **ফোয়ারা** (রচনা-সংগ্রহ)। ১৩১৭ সাল (৩০ জানুয়ারি ১৯১১)। পৃ. ২২৯।

৩। **ব্যাকরণ-বিভীষিকা**। ১৩১৮ সাল (১৫ জুলাই ১৯১১)। পৃ. ৫৫।

বাংলা রচনার বিশুদ্ধি শিক্ষার জন্য সরস ভাষায় ব্যাকরণের শুষ্ক তত্ত্ব বিচার।

৪। **যোগেন্দ্র-স্মৃতি সভা**। ১৩১৯ সাল (১৯ আগষ্ট ১৯১২)। পৃ. ১৩।

'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী সভায় পঠিত।

৫। **আহ্লাদে আটখানা** (সচিত্র, শিশুপাঠ্য)। ইং ১৯১২ (১৭ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ৪০।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের কয়েকটি গল্প ও ছড়া।

৬। **সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা**। মাঘ ১৩১৯ (২৬-১-১৯১৩)। পৃ. ২৬।

৭। **বানান-সমস্যা**। আষাঢ় ১৩২০ (২২-৬-১৯১৩)। পৃ. ৪৩।

'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'র পরিশিষ্ট।

৮। **অনুপ্রাস**। ১৩২০ সাল (১৯ জুলাই ১৯১৩)। পৃ. ১৩৭।

"ভাষাতত্ত্বের একটি কৌতুকাবহ রহস্য প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য। কটুকষায়স্বাদ ভাষাতত্ত্বের কথা একটু মিষ্টরসে পাক করিয়া বাজারে বাহির করিয়াছি।"

৯। **ক-কারের অহঙ্কার**। ১৩২২ সাল (২ নবেম্বর ১৯১৫)। পৃ. ৯০।

"প্রকৃতপক্ষে 'অনুপ্রাস' নামক পুস্তকের ক্রোড়পত্র বা জের।"

১০। **কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব**। ফাল্গুন ১৩২২ (৬-৩-১৯১৬)। পৃ. ৯৯ + ১।

"বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র সমালোচনা।"

১১। **কাব্যসুধা।** ১৩২৩ সাল (২০ নবেম্বর ১৯১৬)। পৃ. ১৪২।

"বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য-গ্রন্থাবলি হইতে সংগৃহীত।"

১২। **পাগলা ঝোরা।** চৈত্র ১৩২৩ (৩-৪-১৯১৭)। পৃ. ২৪৪।

"১৩১৮ হইতে ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত মাসিকপত্রাদিতে প্রকাশিত রচনা-সমষ্টি।"

১৩। **প্রেমের কথা।** জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ (১৫-৫-১৯২০)। পৃ. ১৪২।

১৪। **সাত নদী** (সচিত্র, শিশুপাঠ্য)। আশ্বিন ১৩২৭ (১৪-৯-১৯২০)। পৃ. ৭১।

জামাতা অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে লিখিত। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী—এই সাতটি পুণ্যতোয়া নদীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যের কথা।

১৫। **রসকরা** (শিশুপাঠ্য)। আশ্বিন ১৩২৭ (৪-১০-১৯২০)। পৃ. ৭৪।

"আমার এ রসকরার উপাদান দেশী ভাষা ও বিদেশী গল্প। এদেশী বিদেশী মিলাইয়া খাঁটি স্বদেশী মাল তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

১৬। **সখী।** ১৩২৮ সাল (১১ মে ১৯২১)। পৃ. ১২৩।

"বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে।"

১৭। **মোহিনী** (গল্প-সমষ্টি)। ১৩২৯ সাল (১৪ মার্চ ১৯২৩)। পৃ. ১২০+৩।

১৮। **সাহারা** (রচনা-সংগ্রহ)। ১৩৩৪ সাল (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭)। পৃ. ২১০।

১৯। **'কৃষ্ণকান্তের উইল-এর আলোচনা'**। মাঘ ১৩৩৪ (ফেব্রুয়ারি ১৯২৮)। পৃ. ৭৭+৪।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা: সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় ললিতকুমারের বহু রচনা এখনও বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার একটি তালিকা দিতেছি :—

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' :	১৩০৭, ৩য় সংখ্যা	...	ভাষাতত্ত্ব
	১৩০৮, ১ম সংখ্যা	...	ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা
	১৩০৯, ১ম সংখ্যা	...	বাঙ্গালা কর্ম্মকারক
'বঙ্গদর্শন' :	১৩১১, চৈত্র	...	রঘুবংশ (দিলীপের পুত্রলাভ)
	১৩১২, বৈশাখ	...	রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ
	ভাদ্র	...	পুরাণপ্রসঙ্গ
	১৩১৩, জ্যৈষ্ঠ	...	ছাত্রদিগের অভিভাষণ
	১৩১৫, ফাল্গুন	...	কবি প্রতিভা [নবীনচন্দ্র সেন]
'প্রবাসী' :	১৩১১, চৈত্র	...	বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
	১৩১৩, শ্রাবণ	...	অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন
	১৩১৯, চৈত্র	...	বাঙ্গালীর কতকগুলি সংস্কার
	১৩২২, জ্যৈষ্ঠ	...	শিক্ষকের আশা ও আকাঙ্ক্ষা
	ভাদ্র	...	শিক্ষকের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ
	১৩২৪, ভাদ্র	...	সাহিত্যের পুরাতন ও নূতন ধারা

'সাহিত্য' :	১৩১২, বৈশাখ	...	ভবভূতি ও কালিদাস
	কার্ত্তিক	...	স্বদেশী আন্দোলন ও পলিটিক্স
	১৩১৩, আষাঢ়	...	বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য
	শ্রাবণ	...	অদ্ভুত-রামায়ণ
'ভারতী' :	১৩১২, অগ্র., চৈত্র,	...	প্রস্তাবিত জাতীয় বিদ্যালয়
	পৌষ	...	গোরাচাঁদ বনাম শ্যামা মা (শ্যামাবিষয়) (কবিতা)
'আর্য্যাবর্ত্ত' :	১৩১৭, ফাল্গুন	...	পুরাতন প্রসঙ্গের কথা [৺হরিনাথ ন্যায়রত্ন]
	১৩১৮, কার্ত্তিক	...	অচলায়তন (সমালোচনা)
'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	১৩১৮, ১ম সংখ্যা	...	সভাপতির অভিভাষণ
'মানসী' :	১৩১৯, অগ্রহায়ণ	...	৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ
'সাধক' :	১৩২০, মাঘ, চৈত্র	...	কাশীর কথা
'ভারতবর্ষ' :	১৩২১, আষাঢ়-ভাদ্র, কার্ত্তিক	...	সতীন ও সংমা
	১৩২৩, অগ্রহায়ণ	...	'দিদি' (সমালোচনা)
	১৩২৪, পৌষ-চৈত্র		
	১৩২৫, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	...	ছদ্মবেশ
'বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিন' :	ইং ১৯১৬, নবে.-ডিসে.	...	পল্লীস্মৃতি
'নারায়ণ' :	১৩২৬, শ্রাবণ-আশ্বিন	...	গণিকাতন্ত্র সাহিত্য

'মালঞ্চ' :	১৩২৬, কার্ত্তিক	...	লক্ষ্মী (গল্প)
'মাসিক বসুমতী' :	১৩২৯, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ		বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—মেদিনীপুর : সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
	১৩৩১, আশ্বিন	...	প্রেমপত্র (পূজার গল্প)
	১৩৩৫, আষাঢ়-চৈত্র ;		
	১৩৩৬, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ		৺কেদার-বদরী (ভ্রমণ-কাহিনী)
'বার্ষিক বসুমতী' :	১৩৩২, আশ্বিন	...	আমার দ্বিতীয় পক্ষ (গল্প)
	১৩৩৪, আশ্বিন	...	ছুটি

পত্রিকা-সম্পাদন

'বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিন' : ১৯০৩ সনের জানুয়ারি মাসে ললিতকুমারের পরিকল্পনায় ও উদ্যোগে এই পত্রিকার সৃষ্টি হয়। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কলেজ-ম্যাগাজিনের গৌরব ইহারই প্রাপ্য। ললিতকুমার আজীবন ইহার সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত বহু ইংরেজী-বাংলা রচনা এই পত্রিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে। ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যায় তিনি "বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা" করেন।

'সাধক' : ললিতকুমার নদীয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। কৃষ্ণনগর "নদীয়া-সাহিত্য-সম্মিলনী"র পক্ষ হইতে যখন 'সাধক' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা হয়, তখন ললিতকুমারকেই উহার

সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।* ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে 'সাধকে'র আবির্ভাব হয়। "নদীয়া জেলা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ ও নদীয়া জেলার পরলোকগত প্রধান প্রধান সাহিত্যসেবিগণের জীবনচরিত-সংগ্রহ এবং অন্যান্য বিভাগে নদীয়ার পূর্ব্বগৌরবকথা জ্ঞাপন এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য।" 'সাধক' একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকায় পরিণত হইয়াছিল; ইহার পৃষ্ঠায় ললিতকুমারের ও নদীয়া জেলার প্রবীণ সাহিত্যিকবর্গের বহু রচনা স্থান পাইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, সাধক' দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই; ইহার পরমায়ু মাত্র দুই বৎসর।

ললিতকুমার ও বাংলা-সাহিত্য

ললিতকুমার বাংলা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত—এই তিন সাহিত্যে সমভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার বহু রচনায় তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হইতে হয়। সংস্কৃত-সাহিত্যের বহু বিখ্যাত উক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তাঁহার লেখনীমুখে আসিয়া স্থানে স্থানে তাঁহার বাংলা রচনাকে শুধু অভিনবত্ব দানই করে নাই, শ্রীমণ্ডিতও করিয়াছে। সাহিত্যে ললিতকুমারের গভীর ব্যুৎপত্তিতে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন তাঁহাকে "বিদ্যারত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন (ইং ১৯১১)।

* "তিনি যখন 'সাধক' নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তখন আমাকে উহার সহকারী সম্পাদকের ভার দিয়া আমার কর্ত্তব্য অতি যত্ন সহকারে বুঝাইয়া দিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন।"—কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি: 'মাসিক বসুমতী,' পৌষ ১৩৩৬, পৃ. ৪৬৯।

ললিতকুমারের মধ্যে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসবোধ এবং রস-পরিবেশন-নৈপুণ্যের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার রচনা যেমন পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক, তেমনি তাহা তাহার রস-পিপাসাকেও পরিতৃপ্ত করে, বঙ্গসাহিত্যে নির্ম্মল শুভ্র হাস্যরসের পরিবেশনে ললিতকুমারের কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নহে—তাঁহার রসরচনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

রসগ্রাহী সূক্ষ্ম সমালোচকরূপেও ললিতকুমার বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন দাবী করিতে পারেন। তাঁহার সমালোচনার প্রধান গুণ সহৃদয়তা—সহৃদয়-হৃদয়-বেদ্য রসের বিচারে তিনি যে সম্পূর্ণ অধিকারী, সে পরিচয় তিনি 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব,' 'কাব্যসুধা' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। তিনি ছিলেন বঙ্কিম-সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ জহুরী—বঙ্কিম-সাহিত্যের অফুরন্ত রসমাধুর্য্য সম্বন্ধে বাঙালী পাঠককে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য তিনি অবিশ্রান্তভাবে লেখনী পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন।

এই সুপণ্ডিত অধ্যাপক শিশুসাহিত্য রচনাতেও তখনকার দিনে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। বাংলা শিশুসাহিত্যের সেই দৈন্যদশায় তাঁহার প্রচেষ্টার কথা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমাদের নবীন বংশধরদের ভাগ্যক্রমে আপনার মত লোক গুরু মহাশয়ের ভীষণ গৌরবের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন —যেখানে বেতের চাষ ছিল, সেখানে ইক্ষুর আবাদ আরম্ভ হইয়াছে।"

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে ললিতকুমার ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠার সঙ্গেই জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন বিদ্যামন্দিরের পুরোহিত, তেমনি বঙ্গবাণীর একজন বিশিষ্ট পূজারী।

সারা জীবন অক্লান্তভাবে জ্ঞানের প্রসূনরাজি আহরণপূর্বক তাহা দ্বারা একাগ্র নিষ্ঠাভরে তিনি বঙ্গভারতীর অর্চ্চনায় রত ছিলেন। তাঁহার এই সাধনা ব্যর্থ হয় নাই—বিদগ্ধ-সমাজে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রংপুর-শাখার ৬ষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশনে (২৫ জুন, ১৯১১) স্থায়ী সভাপতি যাদবেশ্বর তর্করত্নের আহ্বানে ললিতকুমার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত ও একটি সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। ১৩২৯ সালের ১-৩রা বৈশাখ মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া সাহিত্যিক সমাজ তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ললিতকুমারের অভিভাষণের (দ্র° 'মাসিক বসুমতী,' বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) মূল বিষয় ছিল শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কার।

সুপণ্ডিত অধ্যাপক, শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ললিতকুমারকে লোকে এক দিন ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু একজন নিষ্ঠাবান্ কৃতী সাহিত্য-সাধকরূপে তিনি অন্ততঃ বিদগ্ধসমাজে সে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ললিতকুমারের সরস লেখনীর সামান্যমাত্র পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার দুইটি রচনা অংশতঃ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

গরুর গাড়ী

গ্রীষ্মের ছুটীতে দেশে আসিয়া দেখিলাম, আমাদের গ্রামের পাশ দিয়া রেলের রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে, ছোট ছোট মালগাড়ী রেলের মালমশলা সাজসরঞ্জাম আনিয়া ফেলিতেছে। দেশের ইতরভদ্র স্ত্রীপুরুষ সকলেরই মনে উৎসাহ ও উল্লাস, বিদেশে যাতায়াতের সুবিধা হইবে, 'ছয় দিনে উত্তরিবে ছ' মাসের পথ!' অনেকে উৎসাহভরে

আমাকে বলিয়া ফেলিলেন, "এ বছর যা কষ্ট পেলে, আস্‌ছে বছর আর গরুর গাড়ীর কর্ম্মভোগ ভুগিতে হইবে না, একেবারে রেলগাড়ীতে আমাদের গ্রামের মাঠে আসিয়া নামিবে।"

কথাটায় আমার কিন্তু আশ্বাস না হইয়া কেমন একটা আপ্‌শোষ হইল ; প্রাণটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে হইল, হায়! বিলাতী সভ্যতার হিড়িকে আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথাগুলি একে একে লোপ পাইতেছে ; সহমরণ বহুবিবাহ উঠিয়াছে, অবরোধপ্রথা জাতিভেদপ্রথা একান্নবর্ত্তি-পরিবারপ্রথা যায় যায় হইয়াছে, আমাদের সনাতন চক্‌মকির স্থান 'বিলাতী অগ্নি দেশলাইরূপী' দখল করিয়াছে, নবাবী আমলের অম্বুরী খাম্বিরা ছাড়িয়া আজ ভারতবাসী মার্কিনের বার্ডসাই ফুঁকিতেছে ; আবার বুঝি বিধিবিড়ম্বনায় আমাদের সনাতন ঋষিগণের উদ্ভাবিত অপূর্ব্ব যান গরুর গাড়ীও বিলয় প্রাপ্ত হয়!

বাস্তবিকপক্ষে, গরুর গাড়ী যেন আমাদের ভারতের নিতান্তই অন্তরঙ্গ, 'আত্মীয় হ'তে পরমাত্মীয়'। আমাদের শাস্ত্রে বলে, 'যাদৃশী দেবতা তস্যাস্তাদৃগ্‌ ভূষণবাহনম্‌'। কথাটা বড় পাকা। প্রকাণ্ডকায় মন্থরগতি গম্ভীরবেদী হস্তী, মাংসপিণ্ড স্থূলোদর জড়ভরত জমীদারশ্রেণীর উপযুক্ত বাহন। নরস্কন্ধবাহিত আবৃতদ্বার শিবিকা, সুভগপুরুষহৃদিবাসিনী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা অবগুণ্ঠনবতী কুলনারীর উপযুক্ত বাহন। কঙ্কালসার অশ্বিনীকুমারযুগল-সংযোজিত কেরাঞ্চী গাড়ী, কলিকাতার কর্ম্মক্লিষ্ট কৃশকায় কেরাণীকুলের উপযুক্ত বাহন। অল্পপরিসর কর্ণজ্বালাকরধ্বনি-সঙ্কুল ধাক্কাকারী একাগাড়ী, কষ্টসহিষ্ণু স্বল্পে সন্তুষ্ট 'খোট্টা'-জাতির উপযুক্ত বাহন। অবিরতঘূর্ণিতনেমি দ্বিচক্রযান, আত্মনির্ভরক্ষম 'হস্তপদাদিসংযুক্ত' উষ্ণশোণিত নব্যসম্প্রদায়ের উপযুক্ত বাহন। রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, বাষ্পের জোরে, তাড়িতের বলে, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে, বায়ুবেগে

ছুটে; এ সকল যান, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের উপর প্রভুত্বপ্রয়াসী অবিশ্রান্তকর্ম্মা ধরাবিদ্রাবকারী তামসিক ইউরোপীয় জাতির উপযুক্ত বাহন।* তেজীয়ান্ ত্বরিতগতি তুরঙ্গম, বীরবিক্রান্ত যুদ্ধব্যবসায়ী রাজসিক রাজপুত জাতির উপযুক্ত বাহন; 'হঠধর্ম্মে হর্ষ অতি, হঠ হঠ সদা গতি, সদাগতি পরাভূত তায়'। আর শমদমাদিগুণালঙ্কৃত সাত্ত্বিক ভারতীয় ব্রাহ্মণপ্রকৃতির উপযুক্ত বাহনই গোযান। যেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা 'গোব্রাহ্মণহিতায় চ' এই অপূর্ব্ব যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হিন্দুর আরাধ্য দেবদেব মহাদেব পরমযোগী কর্ম্মমুক্ত, বৃষভাসনে সমারূঢ়। 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী'; ভক্ত দেবতার উপরও এক কাঠী চড়িয়াছেন। বৃষভপৃষ্ঠে বীবাসনে উপবিষ্ট হইয়া লগুড়দণ্ডে বারংবার বৃষভরাজকে তাড়না করিলে সমাধিভঙ্গের ভয় আছে, নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হইবার পথে বিঘ্ন আছে। তাই বলীবর্দ্দযুগলের পশ্চাতে যষ্টিহস্ত সারথি ও অপূর্ব্ব বংশময় যান স্থাপিত করিয়া সাত্ত্বিক আরোহী দারুব্রহ্মের ন্যায় নিশ্চল, সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় নির্লিপ্ত, যেন জগৎসংস্থিতিকারণ নারায়ণ ক্ষীরোদশয্যায় অনন্ত শয়নে কোটিকল্প ধরিয়া যোগনিদ্রায় বিভোর।

যতই চিন্তা করি, ততই দেখি, গরুর গাড়ী আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সহিত বড় পরিষ্কাররূপে খাপ খায়। রেলগাড়ীর সব দিকেই আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধি। রেলগাড়ী চলিবে, তাহার জন্য রেল পাতিতে হইবে, রাস্তা তৈয়ার করিতে হইবে। সেই রেল হইতে রেখামাত্র

---

* প্রবন্ধ-রচনাকালে মোটর গাড়ীর রেওয়াজ ছিল না। এক্ষণে ডাকাতির ডঙ্কা বাজাইয়া মোটরের যে নামডাক হইয়াছে, তাহাতে উহার নাম উহু রাখাই উচিত।—(দ্বিতীয় সংস্করণের টিপ্পনী।)

বিচ্যুত হইলেই প্রাণসংশয়, রেলের উপর কোনও কিছু থাকিলে তখনই বোঝাই ট্রেন পড়িয়া চুরমার, রাস্তা বেমেরামত থাকিলে তৎক্ষণাৎ ট্রেনের গমনাগমন বন্ধ। তাহার পরে, রেলের গাড়ীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে, তাহাকে হুঁসিয়ার করিতে, তাহার জল কয়লা সরবরাহ করিতে, অসংখ্য লোক ও অবিরত বন্দোবস্তের দরকার। রেলগাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য থামিবে, নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাইবে। কঠোর ব্যবস্থা, 'পদে পদে নিয়ম-অধীন'। ঠিক ইউরোপীয় সমাজের সভ্যতার অনুরূপ, সেই পোষাক-পরিচ্ছদের কড়াকড়ি, সেই কলার নেকটাই বেল্‌ট গার্টারের কসাকসি, সেই ডিনারটেব্‌লের ড্রয়িংরুমের এটিকেটের আঁটাআঁটি, সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সামাজিক রীতিনীতির বাঁধাবাঁধি, এক পাও স্বাধীনভাবে ইচ্ছানুযে এগোবার যো নাই।

গরুর গাড়ী হিন্দুসমাজের ন্যায় উদার সার্ব্বভৌমিক; জলে জঙ্গলে, বনে বাদাড়ে, পথে অপথে, ইহার অপ্রতিহত গতি; 'হাট-বাট-ঘাট-মাঠ ফিরি ফিরিছে বহু দেশ'। ইহা বাঁধা নিয়মের, কড়া আইনের নাগপাশে আবদ্ধ নহে। ধীরে ধীরে নীরবে নির্ব্বিকারে নির্ব্বিচারে ইহা সর্ব্বস্থানে গতায়াত করিতেছে। বিশাল বিরাট্ হিন্দুসমাজ যেমন 'গুঁড়িকাষ্ঠ নুড়িশিলা,' ঘেঁটু, মনসা, শীতলা, ওলাবিবি, ষষ্ঠীবুড়ী, কলাবৌ হইতে নির্গুণ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ছোট বড় সকল দেবতা নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিশেষে অঙ্কে স্থান দিয়া ধীর স্থির গতিতে ধ্রুব লক্ষ্য অভিমুখে চলিয়াছে, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, সেইরূপ গরুর গাড়ীও শ্যামল শস্যক্ষেত্রে, বালুকাময় নদীপুলিনে, তুঙ্গ শৈলশিখরে, বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে, গভীর খাতে, পঙ্কিল জলাভূমিতে, সমান প্রীতির সহিত ধীর সংযত গতিতে গন্তব্য পথে চলিয়াছে। সমাজ ও যান উভয়ই শান্তি ও প্রীতির লীলাস্থল।

পক্ষান্তরে, ইউরোপীয় সমাজ বাষ্পীয় এঞ্জিনের ন্যায় রক্তনেত্রে উদ্দাম উন্মত্ত বেগে ছুটিয়াছে; আর অণুমাত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই ধ্বংসমুখে উপনীত হইতেছে। কলুষিত প্রবৃত্তি, উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা, বিজাতীয় উৎসাহ, মর্ম্মবেদনাকর অতৃপ্তি, ইউরোপীয় প্রকৃতির ভালে কলঙ্কের কালি লেপিয়া দিতেছে, এঞ্জিনের কৃষ্ণাঙ্গার অবিশ্রান্ত ধূমোদ্গার করিয়া আকাশমণ্ডল কালিমাবৃত করিয়া দিতেছে। যান ও সমাজ উভয়েই অশান্তি ও অপ্রীতি স্পষ্ট প্রতীয়মান। তাই বলিতেছিলাম, গরুর গাড়ী শুদ্ধশীল সাত্ত্বিক ভারতীয় প্রকৃতির সুসদৃশ।

চুট্‌কী

আধুনিক প্রেমের কবিতা

আজকালকার প্রেমের কবিতাগুলিকে বাজারের খাবারের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা করে। খাবারের দোকান এখন অলিতে গলিতে, পঞ্চাশ বৎসর আগে এমনটা ছিল না; কবিতাও এখন ছাপাখানার কল্যাণে মাঠে ঘাটে। আগে লোকে মুড়ি ও ঝুনা নারিকেল খাইত, খাদ্যটা কিছু নীরস ও শুক্‌না গোছের, কিন্তু বড় পুষ্টিকর; এখন মুটে মজুরও গজা জেলাপি খায়। আগে লোকে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, কথকতা, কীর্ত্তন শুনিত; তখনকার চণ্ডীর গান, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মনসার ভাসান প্রভৃতিতে ধর্ম্মপ্রসঙ্গই থাকিত; জিনিসটায় তত রসকস ছিল না, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইত। আর তাহার জায়গায় এখন প্রেমের কবিতার ছড়াছড়ি, অজাতশ্মশ্রু বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত থিয়েটারী ছন্দে প্রেমের ছড়া কাটিতে ব্যস্ত।

খাবারের দোকানে থরে থরে হরেক রকম খাবার সাজান, দেখিতে বড় বাহার, কিন্তু খাইলেই অম্বল হয়, বুক জ্বলে, গলা* জ্বলে, দুই এক ঝলক বমি হইয়া উঠিয়াও যায়। মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও নানা কবি কবিতার পশরা সাজাইয়া বসিয়া আছেন; সে সব প্রেমের কাহিনী পড়িতে গেলেই কিন্তু হৃদয়ে জ্বালা ধরে, পাঠকেরও কবিত্বের ফোয়ারা এক আধটু ঝরিতে থাকে। টাট্‌কাভাজা কচুরি নিম্‌কি জেলাপি বেশ মুচ্‌মুচে, মুখে দিলে মিলাইয়া যায়; কিন্তু একটুখানি জুড়াইয়া গেলেই বাদামের তেলের গন্ধ ছাড়ে, মুখে দিতে ইচ্ছা করে না। কবিতাগুলিও, মাসিক পত্রিকার পাতা কাটিয়া পড়িবার সময়, বেশ মোহকর—বেশ প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া যায়; কিন্তু একটু জুড়াইয়া গেলে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, বাস্‌টে গন্ধ ছাড়ে, পুস্তক পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। খাবারের দোকানগুলি না উঠাইলে সহরের স্বাস্থ্য ভাল হইবে না, প্রেমের কবিতার হাট না ভাঙ্গিলেও সমাজের স্বাস্থ্য শোধ্‌রাইবে না [নবীন-নবীনা হয় ত বলিবেন, লেখককে অম্লরোগে ধরিয়াছে। অন্ত বড রোগ আছে]

ঘোম্‌টা

বঙ্গসুন্দরীগণের মাথায় ঘোম্‌টা দেখিলেই আমার ঘেরাটোপের কথা মনে পড়ে। অনুপ্রাসের অনুরোধে নহে, প্রকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া। মূল্যবান্ বাক্স-পেট্‌রার রং পাছে উঠিয়া বা জ্বলিয়া বা ময়লা হইয়া যায়, ধুলামাটি পড়ে, সেই জন্ত সৌখীন লোকে বাক্স পেট্‌রা

---

* আজকাল আমরা সুবিধাবাদী হইয়া পড়িয়াছি। সুবিধা মত গলে খাটে অভাব পূরণ করিয়া লই।

ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকিয়া রাখে। (অনেক সৌভাগ্যবতীকেও ক্যাশবাক্স বলিয়া ভ্রম হয়।) রূপসীদের চাঁদমুখ পাছে ময়লা হইয়া যায়, তাই ঘোম্‌টার সৃষ্টি। মুখখানি সর্ব্বদা ঢাকিয়া ঘিরিয়া রাখিলে বেশ কচি ঢল্‌ঢলে থাকে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কিরূপ বুঝেন জানি না, তবে আমার ধারণা যে, বিধাতা যদি চাঁদের উপর একটা চন্দ্রাতপ খাটাইয়া দিতেন, তাহা হইলে চন্দ্রে কলঙ্কের দাগ পড়িত না।

চোগা

চোগাটা ঠিক যেন গিন্নীমানুষের ঘোম্‌টা, মাথায় নামমাত্র দেওয়া অথচ মুখটা ঢাকা পড়িবে না। একটু না দিলেও আবাব কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। চোগাও ঠিক তাই, চাপকানের উপর না পরিলেও ভাল দেখায় না, অথচ পরিলেও আল্‌গাভাবে পরিতে হয, বোতাম আঁটিয়া বুকটা ঢাকিয়া ফেলা বিধি নহে।

সেকাল আর একাল

সেকালের লোকে স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে কোশাকুশী, টাট, তাম্রকুণ্ড লইয়া বসিতেন, তাহাতে পূজার উপকরণ, গঙ্গাজল, ফুল, বিল্বপত্র, তুলসী, চন্দন থাকিত। আর একালের যুবক যুবতীরা স্নানের পরেই আয়না, চিরুনী, ব্রুস্‌ লইয়া বসেন, পাউডার, রুষ্‌, পমেটম, এসেন্সের সদ্‌ব্যবহার করেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা'?

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৪

প্রমীলা নাগ, নিরুপমা দেবী

প্রমীলা নাগ, নিরুপমা দেবী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
৭২—১১।১১।১৯৫২

প্রমীলা নাগ

১৮৭১—১৮৯৬

'প্রমীলা' এবং 'তটিনী' নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের রচয়িত্রী প্রমীলা বসুর (নাগ) কথা আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু একদা কবি হিসাবে বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি সহজাত কবিত্বশক্তির অধিকারিণী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল। একুশ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রমীলা' প্রকাশিত হইলে তিনি ঈশানচন্দ্র, নবীনচন্দ্র-প্রমুখ সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেন এবং বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সে যুগের সাহিত্যরসিক মাত্রেরই মনে এই আশার সঞ্চার হয় যে, এই নূতনের অভ্যাগম বাংলা কাব্যসাহিত্য-গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে চিরস্থায়ী হইবে। কিন্তু কালের কঠোর আঘাত সে আশা অঙ্কুরেই বিনাশ করিয়াছে।

জন্ম : বংশপরিচয়

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাতুলালয় কৃষ্ণনগরে প্রমীলার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—বিজয়চন্দ্র বসু ; মাতা—লালমণি বসু, স্বনামধন্য মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা সহোদরা। প্রমীলার চরিত্র-গঠনে তাঁহার জননীর আদর্শ ও শিক্ষা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল।

মাতৃঋণ স্মরণ করিয়া প্রমীলা একটি কবিতায় লিখিয়াছেন—"তোমাতে গঠিত হৃদি, তোমারি যে ছায়া প্রাণ।"

প্রমীলার পিত্রালয় বিক্রমপুর। প্রমীলার শৈশবের সহিত তাঁহার মাতামহ—দেওয়ান রামলোচন ঘোষের আদি বাসস্থান ঢাকার নিকটবর্ত্তী বয়রাগাদি গ্রামের সুখস্মৃতি বিজড়িত। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাল্যকালে তাঁহার কবিত্বশক্তির উন্মেষের সহায়ক হইয়াছিল।

বিবাহ

১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (ইং ১৮৯০) মেডিকেল কলেজের ছাত্র (পরে বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার) গঙ্গাকান্ত নাগের সহিত প্রমীলার পরিণয় হয়। গঙ্গাকান্ত ঢাকার সুপরিচিত বারুদি ভূম্যধিকারিবংশীয়। বাল্যকালে ভক্তিমতী মাতামহীর সান্নিধ্যে থাকায় হিন্দুধর্ম্মের ভাব ও আদর্শ প্রমীলার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। আদর্শ হিন্দুনারীর ন্যায় স্বামীকে তিনি অন্তরের অন্তরতম স্থলে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহ উপলক্ষে জীবনের এই পরম পবিত্র দিবসটিকে অভিনন্দিত করিয়া তিনি "শুভদিনে" শীর্ষক যে কবিতাটি রচনা করেন, তাহাতে এই ভাবটি সুপরিস্ফুট হইয়াছে। উক্ত কবিতাটি হইতে সেই মহান্ উচ্চ ভাবের দ্যোতক পংক্তিগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"জানি না হৃদয় তব, দেখি নাই এ জীবনে,
হাতে বেঁধে দিতেছে সংসার,
আমি শুধু এই জানি,—দেবতাও অদৃষ্ট ত
পূজি তবু চরণ তাঁহার,
তোমায়(ও) দেবতা ভাবি

দিতেছি এ পুষ্পাঞ্জলি,
    দিতেছি এ হৃদি উপহার।
পেতেছি হৃদয়াসন এস তবে এস, সখা।
    লও প্রেম অঞ্জলি আমার ;
অদৃষ্টে জগতপিতা, শান্তিময় করে তুমি
    বেঁধে দাও যুগল হৃদয়,
পবিত্র বন্ধন এই কভু যেন নাহি ক্ষয়
    আশীর্ব্বাদ কর দয়াময়।

('প্রতিমা,' অগ্রহায়ণ ১২৯৭)

মৃত্যু

প্রমীলার দাম্পত্যজীবন সুখময় ছিল, স্বামীর অনাবিল প্রণয়ে তাঁহার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। . গার্হস্থ্য জীবন এই বঙ্গকুলবধূর কাব্যসাধনার পরিপন্থী না হইয়া বরং অনুকূলই হইয়াছিল। বিবাহের পর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'তটিনী' প্রকাশিত হইয়া তাঁহার খ্যাতির ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিল এবং প্রমীলার অনুরাগী পাঠকবৃন্দ তাঁহার কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকসিত রূপ দেখিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় তাঁহার দেহে গুরুতর ব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিল। এবং তিনি নিরাময় হইবার আশায় পতি-পুত্র সহ সমুদ্রপথে সিংহল দ্বীপে গমন করিলেন। কিছু দিন কলম্বোতে এবং লেভেনিয়া শৈলে অবস্থান করিয়া তিনি মান্দ্রাজে আসেন এবং সেখান হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বাহ্যতঃ মনে হয় যে, তিনি সুস্থ হইয়াছেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে

ব্যাধির পুনরাক্রমণ হইল, চিকিৎসকদের পরীক্ষায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল যে, তিনি নিদারুণ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বার বার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াও রোগের উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। অবশেষে ১৩০৩ সালের ২৭এ কার্ত্তিক মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে স্বামী পুত্র রাখিয়া এই কবিত্ব-প্রতিভাসম্পন্না সাধ্বী মহিলা অকালে লোকান্তরিতা হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু তাঁহার পরিবারের নয়, বাংলা-সাহিত্যেরও অপূরণীয় ক্ষতি হইল। প্রমীলার পরলোকগমনে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যে কবিতাটি লেখেন, তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। নিম্নে তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"না ঘুচিতে ভাল নিশার আঁধার,
না ফুটিতে ভালো আলো চারি ধার,
গেয়েছিল সে যে শুধু একবার
মধুর মোহন গান।—
আলোকে উজলি উঠিল গগন,
স্তব্ধ প্রকৃতি তন্দ্রা-মগন
চকিতে চমকি মেলিল নয়ন
পাইয়া নূতন প্রাণ;
না ফুটিতে ভাল
দিবসের আলো
হ'ল গীত অবসান।

* * *

সেই যে কোমল আঁখি ছল ছল—
আঁখিতে শুকায়ে গেছে আঁখিজল,

ব্যথিত হৃদয় হয়েছে শীতল
মরণের পর পায়।
খুলিতে খুলিতে মুদেছে সে আঁখি,
না গাইতে ভাল নীরবিল পাখী
এখনো যে তার গাহিবার বাকী
গেয়েছে সে একবার,
না জ্বলিতে হায়
আঁধারে মিশায়
মধুর আলোক তার!
('সাহিত্য,' পৌষ ১৩০৩)

রচনাবলী

প্রমীলার বয়স যখন বারো বৎসর মাত্র, তখন 'ভারতবাসী' নামক সংবাদপত্রে প্রথম তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে 'বামাবোধিনী পত্রিকা,' 'ভারতী,' 'আর্য্যদর্শন,' 'নব্যভারত,' 'সাহিত্য' (১২৯৮-১৩০০, ১৩০৪-৫), 'প্রতিমা' প্রভৃতি তখনকার শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রসমূহের অন্যতম লেখিকারূপে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন।

প্রমীলার জীবদ্দশায় তাঁহার দুইখানি গীতিকাব্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল; এগুলি—

১। **প্রমীলা**। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ (ইং ১৮৯০)। পৃ. ১২৫।

"বঙ্গীয় রমণীর—বিশেষতঃ ক্ষুদ্র কুমারী হৃদয় সম্ভূত অপরিস্ফুট এ কবিতাগুলি" পিতা বিজয়চন্দ্র বসুকে উৎসর্গীকৃত

২। **তটিনী**। ইং ১৮৯২। পৃ. ১৪৮।

প্রমীলা দেবীর রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার গীতিকাব্য দুইখানি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

'প্রমীলা' :

মস্ত ছবি

বাসন্তী সপ্তমী নিশি, বহিছে মৃদুল বায়,
প্রেমেতে বিভোর চাঁদ আধ হাসিমুখে চায়।
চারি পাশে তারারাজি—নয়নে ঘুমের ঘোর—
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণগুলি প্রেমের স্বপনে ভোর।
উছলি উঠিছে সুখে বিমল তটিনী-প্রাণ
কি জানি মৃদুল স্বরে গাহিছে কিসের গান,
উষা ভাবি রজনীরে, আধ ঘুমঘোরে পাখী
নীরব নিশীথ কোলে, থেকে থেকে ওঠে ডাকি ;
দুধারে তটিনী-তীরে, দাঁড়ায়ে কানন-কোলে
ক্ষুদ্র শ্বেত ফুলগুলি মধুর আনন তুলে,
ঘুমেতে অলস আঁখি, মুখে মৃদু মধু হাসি,
চাঁদিমার শুভ্রকর চুমিছে সৌরভরাশি ;
বিকচ বকুল ফুল কিরণ মাখিয়া গায়,
সমীরের পরশনে সরমে ঝরিয়া যায় !
পাপিয়ার "পিউ" তান দিগন্তে মিলায়ে যায়,
ঘুমন্ত জগত কানে বহিয়া আনিছে বায় !
বিমল জোছনা-স্রোতে ছাদখানি ভেসে যায়,
উপাধানে রাখি শির, শিশুটি শুইয়া তায়,

আকাশে মধুর চাঁদ মধুর মুরতি পানে
কি জানি কি ভেবে চেয়ে মোহিত বিহ্বল প্রাণে ;
দোলায়ে অলকাগুলি সমীর খেলিছে সুখে,
কি সুখস্বপন দেখি হাসিটি ঘুমন্ত মুখে !
গগনের চন্দ্রকরে আমাদের চাঁদ শুয়ে,
তুলনা নাই যে তার, চাহিয়ে দেখিনু নুয়ে,
আকাশের চাঁদিমার হাসিতে কলঙ্ক আঁকা !
এ যে হাসি সুপবিত্র, সরল, অমিয়া মাখা !
শৈশব স্বপনে ভোর শান্তির বিমল বুকে,
এমনি সরল প্রাণে, থাক বোন চিরসুখে,
সুখের কৌমুদী তলে ঘুমাক্ হৃদয় তোর
এমনি পুলক মাখা, শান্তির স্বপনে ভোর ॥

স্বপ্ন ভঙ্গে

একদিন স্বপনে ডুবিয়া
ভাবিতাম স্বরগ, ধরণী,
একদিন অমানিশি-কোলে
ভ্রম হ'ত চাঁদিনী যামিনী !
একদিন বরিষার বুকে
দেখিতাম বসন্তের হাসি,
গাছে গাছে ফুটিত কুসুম,
বাজিয়া উঠিত দূরে বাঁশী !
দেখিতাম জ্যোছনায় মাখা
সুশ্যামল সুখময় ধরা,

বিকশিত প্রণয়ের বুকে
সুখ শান্তি স্বপনেতে ভরা,
হায় সেই সুখের স্বপন,
কেন আজ ভাঙ্গিল আমার ?
প্রেম-ভরা হৃদিগুলি হায়
দেখিলাম কপট আগার !
দেখিলাম সুখের সাগরে
তলে তলে পাপের প্রবাহ,
ভাবিতাম ভালবাসা যারে
সেও সুধু হৃদয়ের মোহ !
ঢেকে গেল বিষাদ জলদে
ধীরে ধীরে পূর্ণিমার শশী !
সংসারেব কুটিল কটাক্ষে
মিশে গেল হরষের হাসি ।
চিনিলাম কেন এ ধবণী ?
কেন হায়, ভাঙ্গিল স্বপন ?
ডুবে গেল বিষাদ-সাগবে,
কল্পনার নন্দন কানন !

রোগে

এ কি গো রবির আলো নিবে গেছে আঁখি হ'তে,
ধীরে ধীরে আসিছে আঁধার,
কেমন উদাস ছায়া অচিন্ত্য বিষণ্ণ ভাব
ছাইতেছে হৃদয় আমার

জীবনের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে সব
নীরবতা সুধু চারি দিকে,
জগতের সুখ আশা প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সব
চলে যায় বিষাদিত মুখে।
কাল যারা ছিল কাছে কোথা তারা দূরে দূরে,
শুধায় না কেহ একবার,
সুখহীন ম্রিয়মাণ, কেমন বিষণ্ণ প্রাণ,
চারি দিক্ কেবলি আঁধার!
এ কি মরণের ছায়া নামিতেছে ধীরে ধীরে
রোগ-ক্লান্ত শিয়রে আমার?
তাই সব দূরে দূরে জ্যোতিহীন আঁখি তাই
ম্লান হৃদি ছায়ায় আঁধার;
কত দিন শয্যা-বুকে পড়িয়া নীরব দুখে,
হেরি সদা দৃষ্টিপথে কায়,
কেবলি করুণ মুখে নীরব ভাষায় মোরে
ডাকিতেছে "আয় আয় আয়"!
স্নেহ-কর রাখি বুকে বলে না একটি প্রাণী
দুটি কথা স্নেহময় স্বরে
ছায়াময়ী মৃত্যু সুধু বসিয়া শয়ন পাশে,
দীর্ঘশ্বাস প্রতিধ্বনি করে!
কে কোথায় আছ দূরে এমনি আঁধারে মোরে—
দেবে কি গো অন্তিম-বিদায়?
মরমে মরম ঢেকে এ যাতনা ধরি বুকে
প্রাণ-দীপ নিবে যাবে, হায়!

এস তবে এস মৃত্যু চিন্তাদগ্ধ হৃদিখানি
ঢাক তব স্নেহের ছায়ায় !
অশ্রুভরা আঁখি লয়ে ভ্রমিয়াছি কত দিন
নিরদয় নির্ম্মম ধরায়।
হেথাকার রবিকর পারিনে সহিতে আর
পথহারা প্রবাসীর প্রায়—
থাকিতে পারিনে আর জ্বলিয়া আতপতাপে
মরুময় নিঠুর ধরায়।
দেখিয়াছি আশা হেথা মরুভূমে মরীচিকা
স্নেহ মায়া সবি মিছে হায়
সংসারের সুখ সব, দেখিয়াছি বিষে ভরা
স্বার্থপূর্ণ মানবহৃদয় !
স্নেহ সুখ শান্তি তরে ঘুরিয়া সংসারে আজ,
শ্রান্ত পদ চলিতে না চায়,
শান্তির বিমল বুকে তোমার স্নেহের ছায়ে,
ক্লান্ত হৃদি ঘুমাইতে চায় !

'তটিনী' :

প্রেম ভাব

আঁখিতে পড়িলে আঁখি শরমে মরিয়া যায়
লাজেতে নয়ন যেন অমনি মুদিতে চায় !
কি যেন কি হয়ে গেছে হৃদয়েতে দুজনার,
কবে যেন বলেছিল কে কারে মরমভার !

অধরে আসিয়ে তাই বচন ফোটে না হায়
যাই যাই ক'রে কার(ও) পরাণ যেতে না চায়।
চাহনির মাঝে ভাসে কত স্নেহ ভালবাসা
নীরবে প্রকাশে যেন প্রাণের লুকানো ভাষা।
কাছে যেতে হ'লে যেন চরণে চরণ বাধে
তবুও আকুল প্রাণ সদা মিলনের সাধে।
কভু বা অধরপাতা কি যেন বলিতে চায়
চাহিলে মুখের পানে বচন বাধিয়া যায়।
কাতরে নয়ন তুলে উভয়ে চাহিয়া হায়
একটি কথা না ক'য়ে নীরবে চলিয়া যায়।

যাই

আমায় রেখ না ধ'রে ফুরায়ে এসেছে দিন
কালের সাগরে আয়ু চাহিছে হইতে লীন।
যেতেছে বরষ মাস পিছনে ডাকিয়া মোরে,
ছিন্ন এ জীবন গ্রন্থি কত আর বাঁধ জোরে?
একটি তরঙ্গাঘাতে যায় যায় খসে যায়
আর কেন মায়াবলে ধরিয়া রেখেছ তায়?
প্রকৃতি বাসনা আশা বিদায় দিয়েছে মোরে
কবিতা কল্পনা সাধ নীরবে গিয়েছে স'রে।
সংসার কুহেলি মাখা, হৃদয় হ'য়েছে হীন
দিন দিন তিল তিল এ দেহ হ'তেছে ক্ষীণ।
চোকে ভাসে চারি দিকে হাহাকার অশ্রুজল
প্রাণে জাগে হা হুতাশ প্রতিদিন প্রতিপল।

বহে যার শিরোপরে রোগ শোক জ্বালা কত
জীবন-সমরে শ্রান্ত, হৃদয়ে শতেক ক্ষত!
দুরবল শিরে লয়ে এত বোঝা এত ভার
যুঝিতে জীবন-যুদ্ধে আমি ত পারি নে আর!
দিন পরে রাত যায় নীরবে ডাকিয়া মোরে,
যাইতে পারি নে, বাঁধা তোমাদের মায়া ডোরে!
যদি, এক দিন, যেতে হবে, কেন তবে টানাটানি?
কত আর রাখিবে গো বেঁধে ক্ষীণ প্রাণখানি?
ফুরায় জীবন-বেলা, আঁধার আসিছে ঘিরে
প্রশান্ত মরণ ছায়া নয়নে নামিছে ধীরে,
হৃদয়ে দারুণ ভার, আর কেন রাখ ধ'রে?
দুখের সংসার এ যে, যেতে দেও ত্বরা ক'রে,
ব্যথা অশ্রু হৃদিমাঝে লুকায়ে একটি দিন,
হাসি মুখে থাক চেয়ে দেখে যাই শেষ দিন,
বৃথা আর আকিঞ্চন, মরণ ডাকিছে ওই,
খুলে নেও মায়া-ডোর, অনন্ত বিদায় লই।

কেন স্মৃতি?

কেন স্মৃতি বরিষা আঁধারে
দেখাইছ চাঁদিনী যামিনী?
দামিনীর চকিত অধরে
এঁকে দিয়ে মধু হাসিখানি?
গুরু গুরু মেঘ গরজনে
তুমি আন কোথাকার কথা

কার, মায়া মাখা সুমধুর স্বর,
কবেকার সুখ ভরা ব্যথা ?
কেন, পরাণের ঘোর অন্ধকারে
জাগাও গো হরষের হাসি ?
কেন, নীরব এ প্রকৃতির কোলে
বাজাও সে মধুময় বাঁশী ?

শুভদিনে

শুভদিনে শুভক্ষণে এস আজ এস সখা !
শূন্য এই হৃদয়-আসনে,
ও তোমার আঁখিতারা আঁধারে আলোকধারা—
চিরদিন ঢালে যেন প্রাণে,
যেন, উজলিয়া হৃদি-সর ফুটে থাকে নিরন্তর
ও চরণ-কমল তোমার,
তোমারি আননে সখা ! পূরে যেন জীবনের—
সৌন্দর্য্যের পিপাসা আমার !
ফুটিলে প্রভাত-রবি কুসুমের চারু ছবি
দেখি যেন তোমারি নয়নে,
উষার তরুণালোকে সৌন্দর্য্য তৃষিত বুকে
যেন, নাহি হয় ছুটিতে কাননে !
যখন, দেখিয়া সন্ধ্যার তারা হৃদয় উদাস পারা,
চেয়ে রব গোধূলী আকাশে,
তুলি ওই আঁখিতারা, ঢালিয়া প্রণয়ধারা
তুমি এসে দাঁড়াইও পাশে,

যখন তৃষিত বুকে, ভ্রমিব মলিন মুখে,
মরুময় নিঠুর সংসারে
ও প্রণয়-সিন্ধু হ'তে বারিবিন্দু দিও, নাথ!
শীতলিয়া তাপিত অন্তরে,
জীবনের সব সাধ প্রাণের বাসনা নাথ!
ঘুমাক্ ও চরণে তোমার,
তোমারি স্নেহের স্বরে মেটে যেন চিরদিন
প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা আমার!
জানি না হৃদয় তব, দেখি নাই এ জীবনে,
হাতে বেঁধে দিতেছে সংসার,
আমি শুধু এই জানি দেবতা ও অদৃশ্য ত
পূজি তবু চরণ তাঁহার,
তোমায়(ও) দেবতা বলি দিতেছি এ পুষ্পাঞ্জলী,
দিতেছি ও হৃদি উপহার,
পেতেছি হৃদয়াসন এস তবে এস সখা!
লও প্রেম-অঞ্জলি আমার!
অদৃশ্যে জগতপিতা! শান্তিময় করে তুমি
বেঁধে দাও যুগল হৃদয়,
পবিত্র বন্ধন এই কভু যেন নাহি ক্ষয়,
আশীর্ব্বাদ কর দয়াময়।

প্রার্থনা

এই কুসুমিত বনে এইখানে নিরজনে
আমার সমাধি-স্থান বোলো সখি রচিবারে,

শ্মশানে জলন্ত চিতা	সে যে বড় নিঠুরতা !
দিও না এ ক্ষীণ দেহ দিতে সে অনলপরে !
জীবন্তে তাপিত যে রে	অন্তিমে অনলে তারে
ফেলো না, ধরার বুকে একবিন্দু দিও স্থান,
সংসারে সর্ব্বস্ব দিয়ে	শূন্য এ হৃদয় নিয়ে
প্রকৃতির স্নিগ্ধ বুকে জুড়াব ব্যথিত প্রাণ !
এ দেহ, মাটির দেহ	এ প্রাণ প্রকৃতি স্নেহ
ওদেরি হৃদয়ে বাঁধা এ ক্ষুদ্র হৃদয়খানি,
ওই প্রকৃতির হাসি	চিরদিন ভালবাসি
ভালবাসি মেদিনীর শ্যাম স্নিগ্ধ রূপখানি !
ওই তটিনীর পাশে	ওই ফুলময় দেশে
ওইখানে রব শুয়ে শান্তির কোমল কোলে,
নীরব নিশার বুকে	নীহার আদরে সুখে
পরাবে মুকুতা হার আমার সমাধি-গলে,
আমায় চুম্বন করি	জ্যোছনা পড়িবে ঝরি
চাঁদিমার বুক হ'তে বিজন পাতার তলে !
তারাগুলি চেয়ে চেয়ে	নীরবে নীরবে গেয়ে
স্বরগ সঙ্গীত সদা শুনাবে মধুর বোলে,
লইয়া কুসুম ভূষা	নীরবে আসিবে উষা
ঝরিবে বকুল-রাশি বিজন সমাধি পরি,
মধুরে মধুরে ডাকি	শিয়রে গাহিবে পাখী
প্রভাত-রবির কর নীরবে পড়িবে ঝরি !
তুলি সুমধুর তান	তটিনী গাহিবে গান
দিবানিশি শিয়রেতে শান্তি সুধা যাবে ঢেলে !

দু এক করুণ মন স্নেহময় পরিজন
পথেতে যাইতে কভু আঁখিনীর যাবে ফেলে !
দেখ' সখি রেখো মনে এ জীবন অবসানে
এই কুসুমিত বনে করিও সমাধি দান !
এ জগতে কোনও আশা কোনও সাধ ভালবাসা
পুরিল না দিনে দিনে আঁধারে ডুবিছে প্রাণ
ধীরে ধীরে মৃত্যুছায়া ছাইতেছে ক্ষীণ কায়া
ধীরে ধীরে সঙ্গোপনে গুথায়ে আসিছে প্রাণ,
সকলি করেছি দান চাহি নাই প্রতিদান !
অন্তিমের এই ভিক্ষা সখি রে করিও দান।

প্রমীলা নাগ ও বাংলা-সাহিত্য

প্রমীলার স্ফুটনোম্মুখ প্রতিভা কোরকেই ঝরিয়া পড়ে। সেই জন্য নব নব অবদানে বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। মুখ্যতঃ তিনি গীতিকবিতাই রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বতঃস্ফূর্ত্ততা, সরলতা, আন্তরিকতা এবং শব্দচয়ননৈপুণ্য তাঁহার কবিতার প্রধান গুণ। তাঁহার কবিতায় এক দিকে একটা বিষাদের সুর যেমন পাঠকের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে, অন্য দিকে তেমনি

"নিরজন নির্ঝরিণী-বুকে প্রণয়ের দেখ নিদর্শন
জাহ্নবীর পবিত্র হৃদয়ে হের ওই আত্মবিসর্জ্জন
রবি শশী অটল হৃদয়ে সমভাবে সাধে নিজ কাজ
শিক্ষা দেয় মহাবীর্য্য বল প্রভঞ্জন হৃদয়ের মাঝ"

প্রভৃতি পংক্তি পাঠে হৃদয় আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, অন্তরে নিষ্ঠার সহিত স্বকার্য্য সাধনের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। প্রকৃতির সহিত তাঁহার একাত্মতাবোধও মনকে মুগ্ধ করে।

গদ্য রচনাতেও প্রমীলার কৃতিত্বের নিদর্শনের অভাব নাই।* কিন্তু তিনি প্রধানতঃ গীতি-কবি; নিজের হৃদয়ের সহজ সরল অভিব্যক্তিতে কবিতাগুলি স্বাভাবিক ও সুন্দর। তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে একটা অনাগত প্রচ্ছন্ন বিষাদের প্রলেপ আছে, হয় ত তাঁহার কবি-মানসে অকাল-বিদায়ের ছায়া পড়িত। নিজের শৈশব ও কৈশোর জীবনের স্মৃতিতে তাঁহার কবিতাগুলি মধুর; অকপট সরলতার সহিত তিনি নিজের বিবাহের ঘটনাকেও কাব্যের বিষয় করিয়াছেন; একটা অনাবিল শুচিশুভ্রতা তাঁহার যাবতীয় কবিতায় মিলিয়া আছে।

প্রমীলা কল্যাণ করে ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া নীরবে বঙ্গবাণীর পূজারতি করিয়া গিয়াছেন। সেই অম্লান দীপশিখা লোকচক্ষুর অগোচরে বঙ্গভারতীর একটি অন্ধকার কক্ষকে আলোকিত করিয়া আজও ভাস্বর দ্যুতি বিকীর্ণ করিতেছে।

---

* "লেভেনিয়া শৈল"—'প্রয়াস,' জুলাই ১৮৯৯, পৃ. ৪৩৫-৩৬ দ্রষ্টব্য।

নিরুপমা দেবী

১৮৮৩—১৯৫১

বাংলা-সাহিত্যে যে কয় জন প্রতিভাশালিনী লেখিকার আবির্ভাব হইয়াছে, 'দিদি,' 'অন্নপূর্ণার মন্দির,' 'শ্যামলী' প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িত্রী নিরুপমা দেবী তাঁহাদের অন্যতমা। নিরুপমা সহজাত কবিত্ব-শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। কিশোর-বয়সে লোকচক্ষুর অন্তরালে কবিতা-ফুলের ডালা সাজাইয়া তিনি বঙ্গভারতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কিছু কাল অতিবাহিত হইয়াছিল ভাগলপুরে। সেখানে তখন তরুণ কথা-শিল্পী শরৎ চন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়, তাহা নিরুপমার স্ফুটনোন্মুখ কাব্য-প্রতিভার বিকাশের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে অবশেষে তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের মোড় ফিরিয়া গেল—কবি নিরুপমা উপন্যাস-রচয়িত্রী নিরুপমাতে রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বাংলা-কথাসাহিত্য-ক্ষেত্রে নিজের আসন স্থায়ী করিয়া লইলেন।

নিরুপমার ব্যক্তিগত জীবন বড়ই দুঃখময়। শান্তি ও সান্ত্বনালাভের জন্য তিনি ধর্ম্মসাধনার আশ্রয় লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সারা জীবন সাহিত্য-রচনায়ও তাঁহার নিষ্ঠার অভাব ছিল না। ধর্ম্ম-সাধনার মতই সাহিত্যসাধনাকেও তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যে যাহা তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমাণে প্রচুর না হইলেও উৎকর্ষের দিক্ দিয়া উপেক্ষণীয় নয়।

জন্ম : বংশ-পরিচয়

বহরমপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসে (মে ১৮৮৩) খ্যাতনাম্নী লেখিকা নিরুপমার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নফরচন্দ্র ভট্ট সরকারী বিচার-বিভাগের একজন কৃতী কর্ম্মচারী এবং কর্ম্মজীবনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কন্যার জন্মকালে তিনি আলিপুরের সাব-জজ।

বিবাহ : বৈধব্য

সঙ্গতিপন্ন পিতৃগৃহে পরম আদরে প্রতিপালিতা নিরুপমার বিবাহ হয়—১৮৯৩ সনের মার্চ মাসে (ফাল্গুন ১২৯৯) নদীয়া জেলার সাহার-বাটী গ্রাম-নিবাসী নবগোপাল ভট্টের সহিত। নিরুপমা তখন দশ বৎসরের বালিকা মাত্র। নফরচন্দ্র তৎকালে হুগলীতে সাব-জজরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তিনি বারো দিনের ছুটি লইয়া বহরমপুরের বাটীতে যান। ঐ বাটীতেই বিবাহ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়।

বিবাহের অব্যবহিত পরে চুঁচুড়ায় পিতার নিকট অবস্থানকালে নিরুপমার সহিত স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী প্রায়-সমবয়স্কা অনুরূপা দেবীর বিশেষ সৌহার্দ্য হয়; উভয়ে গঙ্গাস্নানের পর "গঙ্গাজল" পাতাইয়াছিলেন। এই প্রীতির সম্বন্ধ চিরদিন অটুট ছিল।

১৮৯৫, ২১এ অক্টোবর প্রধান সাব-জজরূপে নফরচন্দ্র ভাগলপুরে বদলি হন। ইহার দুই বৎসর পরে—১৮৯৭ সনে নিরুপমার অকাল-

বৈধব্য ঘটিল ; বি. এ. ক্লাসে অধ্যয়নকালে যক্ষ্মারোগে তাঁহার স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নিরুপমা তখনও অনতিক্রান্ত-কৈশোর—বয়স চৌদ্দ-পনর বৎসর মাত্র। এই সময় কলিকাতায় স্বামীর নিকটে অবস্থান কবায় তিনি তাঁহার অন্তিম রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারিয়াছিলেন।

বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় নিরুপমার জীবনে দারুণ বিপর্য্যয় দেখা দিল। সদ্যবিধবা নিরুপমা ভাগলপুরে পিতার নিকট ফিরিয়া আসেন। ইহার অল্প দিন পরেই অনুরূপা দেবী স্বাস্থ্যান্বেষণে ভাগলপুরে আসেন ; তাঁহার পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তখন তথাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দীর্ঘ বিরহের পর দুই প্রিয় বান্ধবীর যখন পুনর্ম্মিলন হয়, অনুরূপার নিপুণ লেখনীতে সে বর্ণনাটি এমন অপরূপ ভাবে ফুটিয়াছে যে, তাহা পাঠকের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে। তিনি লিখিয়াছেন :

> দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আবার আমাদের মিলন হলো, কিন্তু এ সেই পুরোণ অধ্যায়ের জের নয়, একেবারেই সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়। নিরুপমা মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তার রূপ-গুণবান্ স্বামী নবগোপালকে হারিয়ে তপস্বিনী উমার মত সংযত মূর্ত্তিতে আমাদের অশ্রু-আবিল আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে আবির্ভূতা হলো। সেই হাস্যময়ী সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা আদরিণী কিশোরী নয়, সর্ব্বত্যাগিনী শান্ত-মূর্ত্তি কৃচ্ছ্রব্রতী বিধবা। অশ্রুস্রোতের ত্রিবেণীধারায় দিদি আমি ও সে বোধ হয় সেই দিনই গঙ্গাজলের চেয়েও নিকটতর ও সুদৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেম, যা আজ মৃত্যুও ছিন্ন করতে পারবে না।
> ('কথাসাহিত্য,' পৌষ ১৩৫৭)

সাহিত্য-সাধনা

সপ্তবিধবা নিরুপমা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনে এবং লেখাপড়ার চর্চায় মন দিলেন। তাঁহার সাহিত্যসাধনার সূচনা হইল কবিতা রচনা দ্বারা। তাঁহার বেদনাবিদীর্ণ অন্তর হইতে কবিত্বের স্রোত স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে উৎসারিত হইয়া উঠিল। নিরুপমা কৈশোরেই বাণীর আরাধনায় ব্রতী হইলেন।

সে-সময়ে কথা-সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র কলেজ ছাড়িয়া আমোদ-প্রমোদে মাতিয়াছেন। ভাগলপুরে তিনি সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মাতুল ও জনকয়েক যুবককে লইয়া একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভাও গঠন করিয়াছিলেন। ভট্ট-পরিবারের বিভূতিভূষণ এই সাহিত্যসভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। নিরুপমাও নেপথ্যে থাকিয়া ভ্রাতার সাহায্যে সাহিত্য-সভায় পাঠের জন্য কবিতাদি পাঠাইতেন। তিনি কবিতা-রচনায় কি ভাবে শরৎ চন্দ্রের উৎসাহবাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গে নিরুপমা স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন :—

> আমি সে সময়ে অজস্র কবিতা লিখিতাম। ছোট্দা তাঁহার নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাঁহার সম্মানিত বন্ধুকে দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরে ঐ সব কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। একদিন দেখি—ছোট্দা আমার একটি নূতন কবিতার মাথায় লিখিয়া দিয়াছেন 'আরো যাও—আরো যাও—দূরে—থামিও না আপনার সুরে'। পরে শুনিলাম শরৎদাদা নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন 'ঐ একটি ভাব আর একটি কথা ছাড়া বুঝি যদি আর পাঁচ রকম ভেবে লেখে তো লেখায় আরও উন্নতি হবে।' এই কথাই ছোট্দার হাতে

উক্ত কবিতাকারে আমার লেখার মন্তব্যরূপে বর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহাদের এইরূপ মন্তব্যের পর আমি যে কবিতাটি লিখিয়া তাঁহাদের খুশী করি তাহার কয়েক ছত্র মনে পড়িতেছে; সেও একটি 'সমাধি'র উদ্দেশেই কল্পনার সকরুণ—এও হয়ত অলক্ষ্যে পূর্ব্বতন কবিদিগের কবিতার অনুসরণ বা অনুকরণ?

'ধরণীর সুস্নিগ্ধ বুকেতে কত শান্তি ঢাকা আছে ভাই
নদীতীরে কোমল শয্যায় কে গো তুমি লুকায়েছ তাই।

*　　　*　　　*

নদী গায় সকরুণ তান, হুহু ক'রে উঠিছে বাতাস
এ বুঝি তোমারি খেদ গান, এ বুঝি তোমারি দীর্ঘশ্বাস।'

ইত্যাদি। সেই ক্রম-বর্দ্ধিতাকার খাতাখানার কথা আজও মনে আছে—যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায় বা আশেপাশে তাঁহার তরুণ জীবনের সাহিত্যরুচির প্রচুর প্রমাণ ছিল। তিনি নাকি ছোট্‌দাকে বলিয়াছিলেন যে, 'বুড়ি যদি চেষ্টা করে তো গল্পও লিখিতে পারিবে।'

…ক্রমে তাঁহাদের "সাহিত্য-সভা" ও 'ছায়া'র কথাও জানিতে পারি। আমার লেখাও তাহাতে 'শ্রীমতী দেবী' নামে তাঁহারা দিতে লাগিলেন। একটু আধটু গল্প লেখার চেষ্টা আসিলেও শরৎদাদার গল্প পাঠে সে ধৃষ্টতা প্রকাশে তখন বোধ হয় আমাদের লজ্জা আসিত। সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, আমার ছোট্‌দা—ইঁহাদের সঙ্গেই আমার কবিতার প্রতিযোগিতা চলিত। শরৎদাদাই বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন এবং ছোট্‌দার মারফৎ তাহা আমি পাইতাম।…

গল্প-রচনায় শরৎ চন্দ্র নিরুপমাকে উৎসাহ প্রদান করেন বটে, কিন্তু গল্পলেখার প্রেরণা যে তিনি প্রধানতঃ অনুরূপা এবং ইন্দিরা—এই

ভগ্নীদ্বয়ের নিকট হইতে লাভ করেন, এই স্মৃতিকথায় নিরুপমার নিজের জবানীতে তাহার স্বীকৃতি আছে :

> এইরূপে তিনি সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার সভ্যগুলির আদি গুরুস্থানীয় ছিলেন। তবে আমার লেখা 'তারার কাহিনী' 'প্রায়শ্চিত্ত' ও এইরূপ ছোট ছোট গদ্যাকারে গল্প তাঁহাদের 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইলেও গল্প লেখার ক্ষমতা অন্ততঃ আমার মধ্যে সে সময়ে আসে নাই। শ্রীমতী অনুরূপা এবং স্পর্শমণির লেখিকা সুরূপা দিদি (৺ইন্দিরা দেবী)র উৎসাহেই আমি পথমে একটা বড় গল্প লিখি। 'উচ্ছৃঙ্খল' নামে বহু পরে সেটা প্রকাশিত হয়।

নিরুপমাব সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে তাঁহার সহোদব শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> নিরুপমার সাহিত্য-সাধনা প্রায় রান্নাবান্না, ঠাকুবসেবা, এই সবেব মধ্যে রান্নাঘরে ভাঁড়ার-ঘরের মধ্যেই সাধিত হইত। তবে এটাও ঠিক যে, আমাদের বাড়াতে cultuiod লোকের আসা-যাওয়া পিতার আমল হইতেই ছিল এবং আমাদের আমলেও ছিল। সেই জন্য মেয়েরাও নিতান্ত অজ্ঞ নিরক্ষরের মত লালিত পালিত হয় নাই। নিরুপমা গৃহকার্য্যের মধ্যেই সময় করিয়া পড়াশুনা করিত—বাংলা মাসিকপত্রাদি যাহা আসিত, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিত; বিশেষতঃ মাঝে মাঝে তীর্থযাত্রাদি করিয়া বাহিরের সহিতও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা রাখিত। এই তীর্থযাত্রার মধ্যেই এমন অনেক স্ত্রীলোকবন্ধুর সহিত পরিচয় হইয়াছিল, যাঁহারা তাহার জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বাল্যবন্ধু অনুরূপা দেবী, সুরূপা দেবী ছাড়াও এই সকল বন্ধুর প্রভাব তাহার জীবনের উপর যে কতখানি প্রভাব

বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলা কঠিন। নিরুপমা যখন পুরীক্ষেত্রে প্রথম বার যায়, সেখানে পান্নামণি দাসীনাম্নী একজন সুশিক্ষিতা মহিলার সহিত এতই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয় যে, উভয়ের মধ্যে "মহাপ্রসাদ" পাতাইয়া তাহাদের স্নেহের সম্বন্ধ অতিদৃঢ় করিয়াছিল। এই পান্নামণিকে আমরা মহাপ্রসাদ-দিদি বলিতাম। তিনি বাল্যকালে Bethune কলেজে পড়িয়াছিলেন এবং ইংরাজী বেশ ভাল জানিতেন। ইঁহার সাহচর্য্যে এবং আমার ও আমার বন্ধুগণের সাহচর্য্যে ইংরাজী ও অন্যান্য সাহিত্যের সহিত নিরুপমার যথেষ্ট পরিচয় হয়। নিরুপমা নিজে সংস্কৃত বা ইংরাজী কিছুই তেমন শিখিতে পারে নাই। কিন্তু বাড়ীতে নানা সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনা, দর্শনের আলোচনা যথেষ্ট চলিত বলিয়া সাধারণভাবে সংস্কৃত-সাহিত্য এবং দর্শনাদিতে তাহার মোটামুটি দখল হইয়াছিল। শেষ বয়সে তাহার এমন গুরু লাভ হইয়াছিল, যাঁহার নিকট হইতে তাহার জ্ঞানের প্রসারও যেমন হইয়াছিল, তেমনই সেই গুরুর প্রভাবে তাহার লেখারও মোড় ঘুরিয়া গিয়াছিল।...

নিরুপমার জীবনে আরও একটি লেখিকার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনি ছদ্ম নামে (হেমনলিনী নামে) কিছু কিছু কথাসাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত পরিচয় আমাদের পারিবারিক জীবনে একটা বিশেষ ঘটনা। পূর্ব্বোল্লিখিত পান্নামণি দাসীও আমাদের ভাই-বোনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

নিরুপমার শেষের দিকের জীবনে তাহার গুরু ৺গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামীর প্রভাবও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নিরুপমার 'আমার ডায়েরী' ও 'অনুকর্ষ' বই দুখানির উপর তাঁহার এই গুরুর চরিত্রের প্রভাব

সুস্পষ্ট। নিরুপমার 'বিধিলিপি' বইখানিতে তাঁহার মাতৃচরিত্রের এবং জীবনের প্রভাব পরিস্ফুট। 'শ্যামলী'র মূল চরিত্রও আমাদের পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই লিখিত।

নিরুপমার চিত্ত এবং experience অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল বলিয়াই তাহার রচনার প্রাচুর্য্যের অভাব ঘটিয়াছিল, ইহা ঠিক। কিন্তু তিনি তাঁহার সামান্য সাহিত্যিক সম্পত্তিকে প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়া তাহাই বাংলা-সাহিত্যকে দান করিয়া গিয়াছেন।

সমাজ-সেবা

১৯০৩, ১৪ই অক্টোবর (২৭ আশ্বিন ১৩১০) নফরচন্দ্র কাশীতে পরলোকগত হন। কাশীতেই তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়। ইহার এক মাসের মধ্যেই—অগ্রহায়ণের প্রথম দিকে ভট্ট-পরিবার ভাগলপুরের বাস ত্যাগ করিয়া বহরমপুরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। তথায় ভ্রাতা বিভূতিভূষণের নিকটেই নিরুপমা জীবনের দীর্ঘ দিন কাটাইয়াছেন। এইখানেই তিনি অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

সেবা ও সাধনা, এই দুইটিই ছিল নিরুপমার জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি যেমন গৃহে মায়ের সেবায় নিরতা ছিলেন, তেমনই পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরেও নারীকল্যাণ-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। এমনি ভাবে ঘরে বাহিরে উভয়ত্রই তিনি নিরলসভাবে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। এই কর্ম্মসাধনা তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পরিপন্থী হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। বহরমপুর মহিলা-সমিতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী। উচ্চপদস্থ সরকারী

কর্ম্মচারীদের পত্নীগণকে লইয়া তিনি মহিলা-সমিতি গঠন করেন ; ইহার সম্পাদিকার কার্য্যও তিনি বহু দিন করিয়াছেন। অধ্যাপক সত্যশরণ সিংহের পত্নীর সাহচর্য্যে নিরুপমা একটি বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

জীবন-সন্ধ্যা

কঠোর বার-ব্রত, জপ-তপ এবং তীর্থপর্য্যটনেও নিরুপমার জীবনের দীর্ঘ দিন কাটিয়াছে। তিনি বৈষ্ণব-মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা অনেক দিন কাশীতে অবস্থান করিবার পর বৃন্দাবনবাসিনী হন। নিরুপমা মাতার সেবার জন্য কাশী ও বৃন্দাবনে মাঝে মাঝে কাটাইয়াছেন। বৃন্দাবনে অষ্ট সখীর গলিতে "শ্রীগোবিন্দকুঞ্জে" তাঁহারা বাস করিতেন। বাড়ীখানি নিরুপমার ভগিনীপতি গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ; তিনি শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে আমরণ বসবাসের জন্য উহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই বাড়ীতেই তাঁহার মাতা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (চৈত্র ১৩৫৬)।

নিরুপমা স্বেচ্ছায় মাতার সেবার ভার আপন হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর সর্ব্ববিধ সাংসারিক ভোগসুখে বঞ্চিতা, কঠোর ব্রতচারিণী নিরুপমার সংসারের প্রধান আকর্ষণ ছিন্ন হইয়া গেল, কর্ত্তব্যভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তিনি বুঝি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, তাহার পর বৎসর না ঘুরিতেই ১৯৫১, ৭ই জানুয়ারি (২২ পৌষ ১৩৫৭) বৈষ্ণবের পরমতীর্থ বৃন্দাবনে তাঁহারও দেহান্ত হয়।

গ্রন্থাবলী

নিরুপমার রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির বিবরণী হইতে গৃহীত :—

১। **অন্নপূর্ণার মন্দির** (উপন্যাস)। ? (২ আগস্ট ১৯১৩)। পৃ ১৭৬।

১৩১৮ সালের কার্তিক-চৈত্র-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত।

২। **দিদি** (উপন্যাস)। (২৫ এপ্রিল ১৯১৫)। পৃ. ৪৩৫।

১৩১৯-২০ সালের 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত। ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার "গুণ-বিবেচন—Appreciation" লিখিয়াছিলেন।

৩। **অষ্টক** (গল্প-সংগ্রহ) : ? (২৪ মে ১৯১৭)। পৃ. ২৫৬।

ইহাতে নিরুপমা দেবীর ব্রতভঙ্গ, চাঁদের আলোর প্রার্থী, প্রত্যর্পণ ও অপমান না অভিমান—এই চারিটি গল্প আছে, বাকী চারিটি গল্প তাঁহার অগ্রজ বিভূতিভূষণ ভট্টের।

৪। **আলেয়া** (গল্প-সমষ্টি) : আষাঢ় ১৩২৪ (২০-৬-১৯১৭)। পৃ. ২১৭।

সূচী : আলেয়া, প্রত্যাখ্যান, নূতন পূজা, প্রায়শ্চিত্ত, সুখী।

৫। **বিধিলিপি** (উপন্যাস) : ? (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯) পৃ. ৩২৪।

৬। **শ্যামলী** (উপন্যাস) : (৪ অক্টোবর ১৯১৯)। পৃ. ৩৯৩।

৭। **উচ্ছৃঙ্খল** (উপন্যাস): ৫ আশ্বিন ১৩২৭ (২-১১-১৮২০)। পৃ. ১৬২।

ইহাই লেখিকার রচিত প্রথম উপন্যাস। শ্রীঅনুরূপা দেবীকে উৎসর্গ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন:—"শত-ছিন্ন কীট-জীর্ণ খাতা হইতে কত কাল পরে এ গল্পের উদ্ধার, তুমিই তাহা ভালো জানো। সে হিসেবে ইহার নাম "অষ্টাদশী" রাখাই উচিত ছিল। ইহার অধ্যায়ও অষ্টাদশ—ইহার উদ্ধারও অষ্টাদশ বৎসর পরে এবং আরও একটা কথা তোমার জানা আছে। তোমার বন্ধুর এই প্রথম লেখা উপন্যাসটিও কত না ত্রুটিতে ভরা,…। জন্মাষ্টমী ১৩২৬।"

৮। **বন্ধু** (উপন্যাস): (৭ নবেম্বর ১৯২১)। পৃ. ১৭৫।

৯। **পরের ছেলে** (উপন্যাস): (১৩ মে ১৯২৪)। পৃ. ২১৩।

১০। **দেবত্র** (উপন্যাস): শ্রাবণ ১৩৩৪ (১০-৭-১৯২৭)। পৃ. ৪০০।

১১। **আমার ডায়েরী** (উপন্যাস): ১৩৩৪ সাল (ইং ১৯২৭)। পৃ. ১৭৮।

১২। **যুগান্তরের কথা** (উপন্যাস): ? (৪ এপ্রিল ১৯৪০)। পৃ. ২০৫।

১৩। **অনুকর্ষ** (উপন্যাস): (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১)। পৃ. ২০১।

নিরুপমা ও বাংলা-সাহিত্য

উপন্যাস-লেখিকারূপেই বাংলা-সাহিত্যে নিরুপমার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তিনি কবিতাও কম লেখেন নাই। তাঁহার বহু কবিতা 'যমুনা,' 'ভারতবর্ষ,' 'প্রবাসী,' 'মানসী,' 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়া পাঠক-সমাজের তৃপ্তি বিধান করিয়াছিল। কিন্তু সেগুলি সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মগোপন করিয়া আছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

এ বিষয়ে দ্বিমত নাই যে, বাংলা-কথাসাহিত্য নিরুপমার দানে সমৃদ্ধ হইয়াছে। এই কথাসাহিত্যের আসরে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব 'অন্নপূর্ণার মন্দির' নামক উপন্যাসের রচয়িত্রী-রূপে। এই 'অন্নপূর্ণার মন্দির'ই নিরুপমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, প্রকাশকাল—১৩২০ সাল (ইং ১৯১৩)। কিন্তু ইহা তাঁহার রচিত প্রথম উপন্যাস নহে। 'উচ্ছৃঙ্খল' উপন্যাসখানি নিরুপমা রচনা করেন ইহার বহু আগে—১৩০৮ সালে (ইং১৯০১)। কিন্তু ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮ বৎসর পরে। এই প্রথম রচনাতেই ভ্রাতা প্রমোদ ও ভগিনী অনুর চরিত্র-চিত্রণে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তাহা ভবিষ্যতের সাফল্য-দ্যোতক।

'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রকাশের দুই বৎসর পরে নিরুপমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দিদি' প্রকাশিত হইয়া বাংলার পাঠক-সমাজকে চমকিত করিল, বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জহুরীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং অকুণ্ঠ অভিনন্দন তাঁহার অদৃষ্টে জুটিল। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মনের জটিল রহস্যের উদ্‌ঘাটনে লেখিকা যে শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় প্রদান

করিলেন, তাহা মহিলা-কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে বিরল বলিয়াই উপন্যাসখানি বিশেষভাবে পাঠক ও সমালোচকদের মন জিতিয়া লইল।

নিরুপমা আত্মগোপন-প্রয়াসী ছিলেন, নাম-যশ তাঁহার কাম্য ছিল না; কিন্তু প্রতিষ্ঠা আপনি আসিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়াছিল। বাংলা দেশ এই প্রতিভাশালিনী লেখিকার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ১৩৪৩ সালের ভাদ্র মাসে শৈলবালা ঘোষ-জায়ার নেতৃত্বে বর্দ্ধমান-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক তিনি সম্বর্দ্ধিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯৩৮ সনে ভুবনমোহিনী-স্বর্ণপদক ও ১৯৪৩ সনে জগত্তারিণী-স্বর্ণপদক দান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। ১৯৩৯, ২রা সেপ্টেম্বর হইতে চারি দিন কলিকাতা সাহিত্যবাসরের উদ্যোগে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-হলে যে কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়, তাহার কথাসাহিত্য-বিভাগের সভাপতির পদ নিরুপমাই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

যে শুচিতা ও সংযম ছিল নিরুপমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাহা তাঁহার সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইয়াছে। এই নিষ্ঠাবতী সাধিকা শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ বঙ্গভারতীর চরণে যে স্রক্‌চন্দন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার পবিত্র সুরভি দেবীর পুণ্য পাদপীঠকে দীর্ঘকাল আমোদিত করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৫০

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ,
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৩
মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—২২. ৯. ৫৬

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

(১৮১৯—১৮৭৫)

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম—ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত-শাস্ত্রচর্চ্চা, পত্রিকা পরিচালনা, বাংলা সাহিত্য ও স্বদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতি প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সকল কর্ম্মসাধনে যাঁহারা তাঁহার একান্ত সহায় হন, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। আনন্দচন্দ্র সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। দর্শন ও তত্ত্ববিভাগীয় বহু গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন, কতকাংশ বাংলাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতসাহিত্য হইতে সংগৃহীত বহু কাহিনীর তৎকৃত বঙ্গানুবাদ পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল। আনন্দচন্দ্র প্রধানতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহকারী-রূপে কার্য্য করিলেও, ঐ সকল গ্রন্থ তাঁহার জীবনকে কীর্ত্তিময় করিয়া রাখিয়াছে।

বংশ-পরিচয় : জন্ম

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ দাক্ষিণাত্য বৈদিক পণ্ডিতবংশে আনন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গৌরহার চূড়ামণি সে যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। প্রকাশ যে, হিন্দু আইন সংকলনে তিনি তৎকালীন ইংরেজ সরকারকে সবিশেষ

সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে একটি টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল। সুপণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, চূড়ামণি মহাশয়ের একজন প্রখ্যাত ছাত্র। গৌরহরি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। সে যুগের বড় বড় পণ্ডিত এবং রাজা রাধাকান্ত দেবপ্রমুখ সংস্কৃতশাস্ত্র-চর্চ্চা-নিরত হিন্দু-প্রধানগণের নিকট হইতে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

আনন্দচন্দ্র ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে পিতার চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন তাঁহার পরিচয় হয়, তখন তিনি সাধারণ ভাবে সংস্কৃতশাস্ত্রে ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বেদচর্চ্চার নিমিত্ত কাশী-প্রবাস

দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মজীবনী'তে আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সংশ্রবের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন:

> "তখন বেদপাঠ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারে, এমন সকল সুবিজ্ঞ লোকের নিতান্ত অভাব ছিল। অতএব শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্র সংগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিলাম। বিজ্ঞাপন দিলাম, যিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভায় থাকিয়া শিক্ষা লাভের জন্য ছাত্রবৃত্তি পাইবেন। পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিনে পাঁচ ছয় জন [রামচন্দ্র] বিদ্যাবাগীশের নিকট পরীক্ষা দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র ও তারকনাথ মনোনীত হইলেন। আমি এই দুই জনকেই খুব ভালবাসিতাম। আনন্দচন্দ্রের দীর্ঘ কেশ ছিল বলিয়া তাঁহাকে আদরের সহিত সুকেশা বলিয়া ডাকিতাম।" (পৃ. ৮১)

যত দূর মনে হয়, ইহা ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এই বৎসরের ২১শে ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ যে কুড়ি জন সঙ্গী লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকেও আমরা দেখিতে পাই। দেবেন্দ্রনাথ তথা তত্ত্ববোধিনী সভা এই সময়ে বেদের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু বেদ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল নিতান্তই সামান্য, বঙ্গদেশে বেদচর্চ্চার সুবিধাও তেমন ছিল না। আবার মূল বেদও এতদঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ হইতে মূল বেদের পুথি সংগ্রহ এবং বেদবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্য চারি জন ছাত্রকে কাশীধামে প্রেরণ করা হইল। এই চারি জনের মধ্যে প্রথম, ১৭৬৬ শকে যান আনন্দচন্দ্র। এই সম্পর্কে "১৭৬৮ শকের সাম্বৎসরিক আয়-ব্যয়-স্থিতির নিরূপণ" পুস্তকে (পৃ. ।৽, ।/৽) এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :

> "এতদ্দেশে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদক বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনার চালনার নিমিত্তে ঐ ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া চারি জন ছাত্রকে উপনিষৎ অধ্যাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মূল বেদ সমুদয় এদেশে নিতান্ত অপ্রাপ্য দেখিয়া দূর দেশ হইতে তাহা সংকলন করিতে সভা বাধ্য হইলেন। এক জন ছাত্র ১৭৬৬ শকে কাশীধামে প্রেরিত হইয়া তথায় বেদান্তদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ সকল ও মূল বেদ সমুদায় ক্রমে ক্রমে প্রতিনিধি বা ক্রয়দ্বারা সংগ্রহ পূর্ব্বক শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। তাহার এক বৎসর পরে এমত বিবেচনা হইল যে, সমুদায় বেদ শিক্ষা করিতে একজন দ্বারা বহুকাল সাধ্য হয়, চারি জন ছাত্রের দ্বারা শিক্ষা হইলে অল্পকালে সম্পন্ন হইতে পারে ইহাতে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের বিশেষ আনুকূল্য দ্বারা আর তিন জন ছাত্র ১৭৬৭ শকে কাশীধামে গমন করিয়া বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। তদবধি চারি

জন ছাত্রের চারি প্রকার বেদ ও তাহার ভাষ্য অর্থ সহিত অধ্যয়ন হইতেছে।"

এই উদ্ধৃতি হইতেও বুঝা যাইতেছে, ১৭৬৬ শকে (১৮৪৪ খ্রীঃ) আনন্দচন্দ্রকেই কাশীধামে প্রথম পাঠানো হইয়াছিল ; পরবৎসর অন্য তিন জন যান ; তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে—তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং রমানাথ ভট্টাচার্য্য। বাণেশ্বর পরে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার নামে পরিচিত হন। কালীপ্রসন্ন সিংহের তত্ত্বাবধানে মহাভারতের অন্যতম অনুবাদকরূপে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মূল বেদের পুথি-সংগ্রহের ফলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে আগষ্ট ১৮৪৮ খ্রীঃ হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ ঋগ্‌বেদের অনুবাদ করা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

আনন্দচন্দ্র প্রায় চারি বৎসর কাল কাশীধামে মূল বেদ উপনিষদাদির পুথি সংগ্রহে এবং বেদবিদ্যার অনুশীলনে নিরত ছিলেন। ১৮৪৭ সনে দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তথাকার বেদবিদ্যাচর্চ্চা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত সেখানে গমন করেন। ফিরিবার সময় তিনি আনন্দচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। আনন্দচন্দ্র কাশীধামে বেদ উপনিষদ্ কি কি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'তে সে সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় :

> "চারি জন ছাত্রকে বেদ সংগ্রহ ও বেদ শিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উপনিষদের মধ্যে কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, তলবকার, শ্বেতাশ্বতর, বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ, ও বৃহদারণ্যকের কিয়দংশ, বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত ও ছন্দ, বেদান্তদর্শন বিষয়ে সটীক সূত্রভাষ্য, বেদান্তপরিভাষা, বেদান্তসার, অধিকরণমালা, সিদ্ধান্তলেশ, পঞ্চদশী ও সটীক গীতাভাষ্য,

কর্ম্ম-মীমাংসার মধ্যে তত্ত্বকৌমুদী অধ্যয়ন করিয়া আমার সঙ্গে ফিরিয়া আইসেন।" (পৃ. ১৫৩)

অপর তিন জন ছাত্রকে পরবৎসর, ১৮৪৮ সনে ফিরাইয়া আনা হইল। আনন্দচন্দ্র সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মজীবনী'তে (পৃ. ১৫৪) আরও লিখিয়াছেন, "ইহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকে শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান্ ও নিষ্ঠাবান্ দেখিয়া বেদান্তবাগীশ উপাধি দিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যপদে নিযুক্ত করিলাম।"

তত্ত্ববোধিনী সভা ও কলিকাতা (পরে, আদি) ব্রাহ্মসমাজ

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আনন্দচন্দ্র তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯-৫৯) এবং ব্রাহ্মসমাজ, উভয়েরই কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন গ্রন্থাধ্যক্ষসভা হইতে শ্রীধর বিদ্যারত্ন অবসর গ্রহণ করিলে তৎপদে আনন্দচন্দ্র ১৭৬৯ শকের (১৮৪৮) মাঘ মাসে সদস্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৭০ শকের প্রথম হইতেই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যরূপে কার্য্য করিতে দেখি। এই সনের ১৪ই শ্রাবণ দিবসের বিশেষ অধিবেশনে আনন্দচন্দ্র তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।*

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত হয়। "ইহার সমুদয় কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ। আনন্দচন্দ্র তখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকপদে বৃত হন। তদবধি এই পদে কার্য্য করিয়া ১৭৮৫ শকের ৯ই অগ্রহায়ণ (১৮৬৩)

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ভাদ্র ১৭৭০ শক।

অবসর লন।* তাঁহার স্থলে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমাজের সহকারী সম্পাদক হইলেন। কিন্তু আনন্দচন্দ্রকে অধিক দিন অবসর গ্রহণ করিয়া থাকিতে হয় নাই। সমাজের কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতদ্বৈধ· হেতু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে একদল নবীন ব্রাহ্ম বিভিন্ন কর্ম্মকর্ত্তৃপদ পরিত্যাগ করেন, প্রতাপচন্দ্রও সহকারী সম্পাদকের পদ ছাড়িয়া দিলেন। তখন, ১৭৮৬ শকের শেষভাগে আনন্দচন্দ্র পুনরায় ঐ পদে নিযুক্ত হন।† কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরে নিম্নের বিজ্ঞপ্তিটিতে এই নিয়োগ-সংবাদ ঘোষিত হয়:

> "ট্রষ্টিদিগের অনুমত্যনুসারে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হইলেন, এবং শ্রীযুক্ত আনন্দ-চন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক হইলেন।"‡

আদি ব্রাহ্মসমাজ

এই সময় হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্বীয় মতাবলম্বীদের লইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে আলাদা হইয়া গেলেন। তাঁহারা ১১ই নবেম্বর ১৮৬৬ তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বৎসরাধিক কাল পরে, ১৭৯০ শকের (১৮৬৮) পৌষ মাস হইতে পুরাতন সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে অভিহিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য,

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—অগ্রহায়ণ ১৭৮৫ শক।

† ঐ —ফাল্গুন ১৭৮৬ শক।

‡ ঐ —জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক।

আনন্দচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজেরই কার্য্যে লিপ্ত রহিলেন। তিনি ১৭৮৯ শকের (১৮৬৭) আষাঢ় পর্য্যন্ত একাই মূল ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শ্রাবণ মাস হইতে তিনি এবং নবগোপাল মিত্র, উভয়েই উক্ত পদে নিযুক্ত হন।*

১৭৯৩ শকের মাঘ মাসে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) আদি ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মবোধিনী সভা গঠিত হয়। ইহার সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু এবং সম্পাদক নবগোপাল মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মবোধিনী সভার অধীনে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় ছিল; এখানে প্রতি মাসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে উপদেশ দেওয়া হইত। আনন্দচন্দ্র চতুর্থ রবিবারে বেদান্ত ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন।†

কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, তথা নব্য ব্রাহ্মদল কতকগুলি নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইহার মধ্যে অন্যতম প্রধান কার্য্য ছিল—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করানো। এই বিষয়টি লইয়া প্রথমে প্রবীণ ও নবীন ব্রাহ্মদের মধ্যে কিছু আলোচনাও হইয়াছিল। কিন্তু আইনটি ক্রমে যে রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল, তাহাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ কোন মতেই সায় দিতে পারেন নাই; তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। আনন্দচন্দ্র শাস্ত্রীয় উক্তি উদ্ধার এবং পণ্ডিতগণের অভিমত সংগ্রহান্তর আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্ত্তিত বিবাহ-পদ্ধতি যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত, তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্র সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন:

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—শ্রাবণ ১৭৮৯ শক।

† ঐ —জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক।

"আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, তিনি খাঁটি আমার দলের লোক, তিনি আর কারুর কথা শুনতেন না, কাউকে আমল দিতেন না।"*

সাহিত্য-সাধনা

সাহিত্য-সাধনাকে আনন্দচন্দ্র জীবনের মুখ্য ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের বৈষয়িক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও, সাহিত্যানুশীলনে তিনি নিয়ত নিরত ছিলেন। ১৮৫০, ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ বা সংক্ষেপে অনুবাদক সমাজ প্রথমে ইংরেজী গ্রন্থাদি হইতে সহজ সরল ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থকার দ্বারা অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করেন। পরে এই সমাজের আনুকূল্যে মৌলিক গ্রন্থ এবং সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সরল অনুবাদ-পুস্তকও প্রকাশিত হইতে থাকে। আনন্দচন্দ্র 'বৃহৎকথা' নামক অনুবাদ-পুস্তক দুই খণ্ডে লিখিয়া উক্ত সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত করেন (১৮৫৭ ও ১৮৫৮)। তিনি নিজ দায়িত্বেও বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আনন্দচন্দ্র রাজনারায়ণ বসুর সহযোগে রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। একক ভাবে এবং কখনও অন্যের সহযোগে তিনি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির কয়েকখানি মূল্যবান্ পুস্তক সম্পাদনা করিয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্র বেদান্তে সুপণ্ডিত ছিলেন। বেদান্ত সম্পর্কীয় কয়েকখানি পুস্তক তিনি সানুবাদ প্রকাশিত করেন। তাঁহার রচিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের পরিচয় একটু পরেই দেওয়া হইবে।

* সাহিত্য—শ্রাবণ ও কার্ত্তিক ১৩১৮ : "কথালাপ"—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্রষ্টব্য।

মৃত্যু

মাত্র ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে ১৮৭৫ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর (১ আশ্বিন ১৭৯৭ শক) আনন্দচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র রাখিয়া যান—জ্ঞানচন্দ্র ও গুণচন্দ্র। আনন্দচন্দ্রের বেদান্ত-দর্শনে পাণ্ডিত্য সমসময়ে সকলের নিকট সুবিদিত ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সবিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ তারিখে আনন্দচন্দ্র সম্বন্ধে লেখেন :

"আমরা অত্যন্ত দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক যে চারি জন পণ্ডিত বেদাধ্যয়নার্থ কাশীতে প্রেরিত হন, বেদান্তবাগীশ তাঁহাদেরই মধ্যে এক জন। বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের এই অধ্যয়নের ফল আমরা অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি বেদের অনেক প্রধান প্রধান অংশ অনুবাদ করিয়া আমাদের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন।"

আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (কার্ত্তিক ১৭৯৭ শক) একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। ইহাতে তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান বিষয় বিবৃত হইয়াছে ; ইহা হইতে কিছু কিছু নূতন কথাও আমরা জানিতে পারি। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রস্তাবটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :

"আমরা শোকার্ত্ত হৃদয়ে আমাদিগের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় গত ১ আশ্বিন দিবসে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি যৌবন কালাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজেরই কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় বত্রিশ বৎসর হইল তিনি এবং আর তিনটি ছাত্র কাশীতে বেদাধ্যয়ন জন্য প্রধান আচার্য্য মহাশয় দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি চারি বৎসর তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক অথর্ব্ব বেদ এবং বেদান্ত-দর্শন বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ তেমনি কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তিনি সমাজের বৈষয়িক ও আচার্য্যের কর্ম্ম অতি নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞতা নিবন্ধন তিনি সাধাবণ হিন্দু সমাজের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পঞ্চদশী, বেদান্তসার, উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা গ্রন্থ সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশে ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার প্রকৃষ্ট সোপান উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ন্যায় বেদান্ত-দর্শনবিৎ অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থ ব্যতীত তিনি ব্রাহ্মবিবাহের শাস্ত্রসম্মত বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি ব্রাহ্মবিবাহ আন্দোলনের সময় আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বিবাহপ্রণালীর শাস্ত্রসিদ্ধতা প্রমাণ করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন অমায়িক ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।”

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

প্রথমে কলিকাতা ও পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমৃত্যু যোগরক্ষা হেতু আনন্দচন্দ্রকে নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন বলিয়া এ সমুদয়ই অকাতরে সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি স্বগ্রামবাসীর হিতসাধনে সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন। নিজ কোদালিয়ার দক্ষিণ সীমায় যে বৃহৎ জলাশয় আছে, ইহা তাঁহারই সম্পত্তি ছিল। প্রকাশ, গ্রামবাসীদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে উহা খনন করাইয়া দেন। এখনও ঐ জলাশয় "বেদান্তবাগীশের দীঘি" বলিয়া খ্যাত।

গ্রন্থাবলী—রচিত ও সম্পাদিত

বাংলা

বৃহৎকথা। প্রথম খণ্ড। ১৮৫৭

ঐ। দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮৫৮

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে (২১ চৈত্র ১৭৭৮ শক) লিখিয়াছেন:

> "বৃহৎকথার প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা সোমদেব ভট্টকৃত সংস্কৃত বৃহৎকথা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছে, অবিকল অনুবাদ নহে, কিন্তু সংস্কৃত পুস্তকে যেরূপ রীতিক্রমে নীতি বিষয় সকল লিখিত আছে, ইহাতে সেই রূপেই সঙ্কলিত হইয়াছে। অশ্লীল ও অলৌকিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতিবিষয়ক মনোহর আলাপ সকল গ্রহণ করা গিয়াছে।

"কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়দিগের অনুমত্যনুসারে বিশেষত শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ও শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জে, লং মহোদয়ের আগ্রহাতিশয়ে আমি ইহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে ইহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।"

'বৃহৎকথা' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে রচনার কিছু কিছু নিদর্শন এখানে প্রদত্ত হইল :

"হরপার্ব্বতী সংবাদ।

"হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্বপ্রধান শিখরের নাম কৈলাস। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান চরাচরগুরু মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত সেই কৈলাসশিখরে অবস্থিতি করেন। এক দিবস পার্ব্বতী দেবী কুতূহলে মহাদেবের সেবা করতঃ পরিতোষ জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাতে মহাদেব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে কি কার্য্য করিলে তোমার প্রীতি হয় বল। পার্ব্বতী উত্তর করিলেন, প্রভো! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই প্রার্থনা যে, আমাকে একটী রমণীয় নূতন উপাখ্যান শ্রবণ করাও। ইহাতে মহাদেব প্রিয়ার প্রীতির নিমিত্তে কহিলেন, পূর্ব্বে কোন সময়ে ব্রহ্মা ও নারায়ণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে নানা কষ্টসাধ্য তপস্যা দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করিয়া নারায়ণ প্রার্থনা করেন, ভগবন্! আমি যেন সর্ব্বদা তোমার সেবায় রত থাকি। তাহাতেই তিনি শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিলেন। সেই নারায়ণ তুমি, আমারই পূর্ব্ব পত্নী। ইহা

শুনিয়া পার্ব্বতী প্রার্থনা করিলেন, কি প্রকারে আমি তোমার পূর্ব্ব-পত্নী ছিলাম, তাহা শুনিতে বাসনা করি। মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! পূর্ব্বে তুমি দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ছিলে, পরে তাঁহার নিকটে আমার নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর। তথায় বর্দ্ধমানা হইতে লাগিলে, এমত সময়ে আমি তপস্যার্থ হিমালয়ে গমন করিলাম, এবং তিনি আমার শুশ্রূষার নিমিত্তে তোমাকে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর তোমার তীব্র তপস্যার দ্বারা আমি ক্রীত হইলাম। এই রূপে তুমি আমার পূর্ব্বপত্নী ছিলে। এই উপাখ্যান শ্রবণে ভগবতীর পরিতোষ না হওয়াতে মহাদেব তাঁহাকে অন্য এক অপূর্ব্ব নূতন আখ্যান শ্রবণে প্রবৃত্ত করিলেন, এবং কহিলেন, আমি যতক্ষণ উপাখ্যান কহিব, ততক্ষণ যেন এ গৃহে কেহ না আসিতে পারে। ইহা বলিবামাত্র ভগবতী নন্দীকে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন, এবং মহাদেব কহিতে আরম্ভ করিলেন।" (১ম খণ্ড; ২য় সং, পৃ. ১-৩)।

"যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন, মহারাজ! স্বামীর প্রিয়কার্য্য সাধন মাত্রেই রাজ্ঞীরা দেবীশব্দের বাচ্য হয় না, পতির যে হিতৈষিতা, তাহাই দেবীশব্দ প্রাপ্তির কারণ। আর একান্ত চিত্তে রাজার কার্য্যভার চিন্তা করাই মন্ত্রীর লক্ষণ, নতুবা চিত্তানুবর্ত্তন মন্ত্রীর কার্য্য নহে, তাহা উপজীবীর লক্ষণ। অতএব আপনার শত্রু মগধরাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবার জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য সংস্থাপন নিমিত্তে আমরা এই অভিসন্ধি করিয়াছিলাম। মহারাজ। ইহাতে দেবীর কোন অপরাধ নাই, বরং ইনি মহৎ

উপকারই করিয়াছেন। এইরূপ মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ পরম হৃষ্টমনে তাঁহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি এত দিনের পর জানিলাম যে, সকলই আমার দোষ, তোমরা আমার এই রাজ্যের অব্যাহতি সাধনার্থ মন্ত্রণা করিয়াই এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলে। এক্ষণে আমি দেবীর প্রতি যে সকল উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম, সে কেবল প্রণয়ের কার্য্য জানিবে। অতিপ্রণয়-কালে কথনই সমুদায় বিচারসহ বাক্য প্রয়োগ করা হয় না, অবশ্যই কোন না কোন বিষয়ে স্খলিত হইয়া থাকে, তাহাতে ক্ষোভ করিও না, ইত্যাদি নানা প্রকার সন্তোষজনক বাক্যদ্বারা বৎসরাজ বাসবদত্তার লজ্জা শান্তি করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।" (২য় খণ্ড, পৃ. ৯১-২)।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান। ১৮৫৯।

"মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক অবিকল অনুবাদিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে এবং তাহাতে দুষ্মন্ত রাজা ও শকুন্তলা প্রভৃতির চারিখানি চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি নিবেশিত হইয়াছে।"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৮১ শক।

দাক্ষিণাত্যের কুলীন বৈদিক শ্রেণীর প্রচলিত কুলসম্বন্ধ প্রথা পরিবর্ত্ত করা উচিত কি না? ২০ ভাদ্র ১৭৮৪ শক (ইং ১৮৬২)।

দশোপদেশ। ১৮৭০।

"১৭৯১ শকের ১ মাঘ অবধি ১০ মাস পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানপূর্ব্বক যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।"

পুস্তকখানির দশম উপদেশ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের। দশম উপদেশ হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :

"এই ব্রাহ্মধর্ম্মোপদিষ্ট ঈশ্বরোপাসনাতে কোন সম্প্রদায়ের বিপ্রতিপত্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ যিনি যে সম্প্রদায়ী হউন প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানই যে উপাসনা, তাহা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। যিনি যেরূপে ঈশ্বরকে কল্পনা করুন, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান যে তাঁহার উপাসনা, কখনই তাঁহারা ইহার অন্যথা বলিবেন না। কেবল এই প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যের ভাব বিকৃত করিয়া লওয়াতে তাঁহারা অমৃতলাভে বঞ্চিত ও অনর্থে নিপতিত হইতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, গললগ্নী-কৃত-বস্ত্রে গদ্‌গদ বাক্যে অর্থ না বুঝিয়াও সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেই প্রীতি করা হইল এবং পশুবলি প্রভৃতি নৃশংস আড়ম্বর সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। প্রীতি যে হৃদয়ের ভাব ও প্রিয়কার্য্য যে হৃদয় হইতে উদিত হইয়া বাহ্য আকারে পরিণত হয়, তাহা তাঁহারা মনেও করেন না। তাঁহারা যেরূপেই বিকৃত করুন, প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান ভিন্ন যে উপাসনা হয় না, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াই থাকেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার-দিগের কিছুমাত্র বিপ্রতিপত্তি নাই। যেমন পিতাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতে কোন পুত্রের আপত্তি হয় না, কিন্তু পিতার ত্যজ্য বিষয় লইয়াই ভ্রাতায় ভ্রাতায় নানা বিরোধ হইয়া থাকে। সেইরূপ যিনি যে ভাবে বিকৃত করুন, প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান যে ঈশ্বরের উপাসনা, তাহাতে কাহারো কোন বিরোধ নাই, কেবল বাহ্য আড়ম্বর লইয়াই নানা দেশে নানা মত ও নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ মতভেদ অবলম্বন করিয়াই এ দেশে শৈব, শাক্ত, সৌর,

গাণপত্য ও বৈষ্ণব, এই পাঁচ প্রকার সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এক্ষণে আরও নানা প্রকার সম্প্রদায় দৃষ্ট হইতেছে। তাহারদিগের মধ্যে এতদূর মতভেদ ও এত বিদ্বেষ আছে, যে এক সম্প্রদায় যেরূপ অনুষ্ঠান করেন, অন্য সম্প্রদায় তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এবম্প্রকার বিদ্বেষ ও বিরোধের মধ্যস্থলে আবির্ভূত হইয়া সেই সকল বিরোধের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। অতএব কালে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সর্ব্বতোমুখী উপদেশ বাক্য সকল সর্ব্বসাধারণ্যে বিস্তৃত হইলে আর কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ বিসম্বাদ থাকিবে না, সকলেই অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। (পৃ. ৭২)

ব্রাহ্মবিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কি না? নানা সমাজস্থ প্রধান প্রধান অধ্যাপকদিগের নিকট হইতে গৃহীত ব্যবস্থাপত্র ও অভিমত সহিত। ২৩ জানুয়ারি ১৮৭৩।

আনন্দচন্দ্র 'বিজ্ঞাপনে' ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ক আইন প্রণয়ন কালে, কি কি অবস্থায় ব্রাহ্মবিবাহের সিদ্ধতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপকগণের নিকট হইতে অভিমত সংগ্রহ করা হয়, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। 'বিজ্ঞাপন'টি এই :

"ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ম্মেরই মূল। ইহা হইতেই অধিকারিভেদে নানা প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম শাখাপল্লবিত হইয়া ক্রমশঃ বহুকালে শেষে আসিয়া পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে। তজ্জন্য অপৌত্তলিক ব্রাহ্মগণ যেমন উপাসনায় পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইরূপ গৃহ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার সময়েও অপৌত্তলিকতা রক্ষা করিবার নিমিত্তে ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান পদ্ধতির স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া তাহা হইতেই অপৌত্তলিক ভাব গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দু প্রণালী অনুসারে অনুষ্ঠানকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলিন চঞ্চলস্বভাব লোক, সম্প্রতি আপনারদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে অস্বীকৃত হইয়া, হিন্দু পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি নানা জাতীয় কিছু কিছু প্রণালী লইয়া বিবাহাদির এক নূতন প্রণালী গঠন পূর্ব্বক বিবাহ ক্রিয়া প্রচলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারদিগের সেই বিবাহ প্রণালী কোন প্রকারেই ধর্ম্মশাস্ত্রসিদ্ধ নহে, সুতরাং তাঁহারদিগের রাজনিয়ম দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিবার আবশ্যক হওয়াতে, তাঁহারা আপনারদিগের ঐ বিবাহ রাজনিয়ম দ্বারা বিধিবদ্ধ হইবার প্রার্থনায় রাজদ্বারে আবেদন করেন। কিন্তু ঐ আবেদনপত্রে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া উল্লেখ থাকাতে আদি ব্রাহ্ম-সমাজস্থ হিন্দু ব্রাহ্মেরা উহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া রাজবিধিতে উল্লেখ করিতে আপত্তি করেন। তাহাতে আধুনিক ব্রাহ্মেরা ভাবিলেন যদি আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্রাহ্মদিগের বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কোন কৌশলে অসিদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই ইহার-দিগের আর আপত্তি থাকিবে না। এই বিবেচনায় আধুনিক ব্রাহ্মেরা আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্রাহ্মদিগের বিপক্ষতাচরণ পূর্ব্বক কুশণ্ডিকাদি ব্যতীত বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হয় কি না, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া কাশীস্থ ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকদিগের নিকট ব্যবস্থাপত্র প্রার্থনা করেন, কিন্তু তথা হইতে তাঁহারা যে ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা ঐ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যদিও অধ্যাপকেরা তাঁহারদিগকে যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহারদিগের বিপরীত ফল ফলিত হইয়াছে এবং আদি ব্রাহ্মদিগের বিবাহ পদ্ধতি ধর্ম্মশাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্রাহ্মেরা নানা সমাজ হইতে তদ্বিষয়ে যে ব্যবস্থা-

পত্র আনয়ন করিয়াছেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় তাহাতে আরও যতদূর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তৎসমুদায় সংগ্রহপূর্ব্বক আমি ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচারিত করিলাম। বোধ হয় ইহা দেখিয়া আধুনিক ব্রাহ্মেরা আদি ব্রাহ্মদিগের বিবাহ পদ্ধতি অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় আর কোন কথা উত্থাপন করিতে পারিবেন না। ইতি

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশস্য।"

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী। ১৮৮১

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও রাজনারায়ণ বসু সম্পাদিত। রাজনারায়ণ বসু বৈশাখ ১৭৯৫ শকের (১৮৭৩) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় লেখেন, "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থসকল দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা যাইতেছে।" গ্রন্থাবলীর প্রকাশ আরম্ভের অল্পকাল পরেই অন্যতর সম্পাদক আনন্দচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

সংস্কৃত ও বাংলা

বেদান্তসারঃ / পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীসদানন্দকৃতঃ / বঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ / শ্রীনৃসিংহ সরস্বতীকৃতা সুবোধিনী নাম্নী / শ্রীরামতীর্থযতিবিরচিতা বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী / নাম্নী টীকা চ / তথা / হস্তামলক গ্রন্থঃ / বঙ্গভাষানুবাদসম্বলিতঃ / শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদবিরচিতা তট্টীকা চ / ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৭৭১ শক [১৮৪৯]।

আনন্দচন্দ্র 'অনুষ্ঠানে' লেখেন :

"অনেক দিবস হইতে এদেশে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা লুপ্ত হওয়াতে সুতরাং তাহার গ্রন্থ সকলও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, কিন্তু এইক্ষণে অনেক ভদ্র সন্তানেরা বেদান্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করিয়াও পুস্তকাভাব প্রযুক্ত সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে দুরূহ বোধ করিতেছেন। অতএব এইক্ষণে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বেদান্ত পুস্তকের প্রাপ্তি সুলভ করা অতি আবশ্যক বোধ হয়, কিন্তু সাধারণের সাহায্য ব্যতীত এ বিষয় সুসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর।

"কেবল সংস্কৃত মাত্র মুদ্রাঙ্কিত করণে অনেক বিষয়ীর অসম্মতি অথচ এ বিষয়ে পণ্ডিত, বিদ্যার্থী, বিষয়ী, সকলেরই উৎসাহ প্রয়োজন এ প্রযুক্ত বাঙ্গলা সাধু ভাষায় অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার গ্রন্থ দুই টাকা মূল্য স্থির করিয়া প্রথমতঃ মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, পরে সাধারণের উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ পঞ্চদশী ও সূত্রভাষ্য প্রভৃতি বেদান্ত শাস্ত্র মুদ্রিত হইবে···

"১৭৭০ শকের ১ শ্রাবণ দিবসীয় এই উক্ত প্রস্তাবানুসারে বেদান্তসার গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কিত করণ সমাপ্ত হইল··· ।"

পঞ্চবিবেক-পঞ্চদীপ-পঞ্চানন্দা-বয়বাত্মিকা / **পঞ্চদশী** / শ্রীমস্তারতীতীর্থ বিদ্যারণ্যমুনীশ্বরকৃতা। / শ্রীরামকৃষ্ণাখ্যবিদ্বদ্বিরচিতটীকাসহিতা। / বঙ্গ-ভাষানুবাদসম্বলিতা চ। /

গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ও প্রচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রথম বারের 'বিজ্ঞাপনে' এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

"অনেক দিবস হইতে এদেশে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি লুপ্ত হওয়াতে সুতরাং তাহার গ্রন্থ সকলও দুষ্প্রাপ্য

হইয়াছে, অথচ ইদানীং অনেকে বেদান্তের মর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করিয়াও পুস্তকাভাব প্রযুক্ত সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে দুরূহ বোধ করিতেছেন, এক্ষণে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বেদান্ত পুস্তকের প্রাপ্তি সুলভ করা অতি আবশ্যক বোধ করিয়া ১৭৭০ শকের ১লা শ্রাবণ দিবসে বেদান্তসার গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ হয়, তাহাতে কতিপয় বিদ্যোৎসাহি কর্ত্তৃক উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্তি হওয়াতে পরে টীকা সহিত এবং বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ সম্বলিত পঞ্চদশী প্রভৃতি বেদান্ত গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু সাধারণের সাহায্য ব্যতীত এ বিষয় সুসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর, কারণ পুস্তক অনেক ও বৃহৎ বৃহৎ, সুতরাং মুদ্রিত করণে বহুকাল বিলম্ব ও অধিক ব্যয়ের সম্ভাবনা। পরন্তু যদি এক এক পুস্তক সমুদায় মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হয় তবে মূল্যাধিক্য প্রযুক্ত অনেকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবেন, অতএব এই পরামর্শ স্থির করা গেল যে, যে মাসে যে কয়েক ফারমা মুদ্রিত হইবেক তাহা একত্রিত করিয়া সেই মাসেই স্বাক্ষর-কারিদিগের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক, মূল্য প্রতি ফারমা ৴০ আনা স্থির হইল। যে মাসে যে কয়েক ফারমা একত্রিত করিয়া প্রেরণ করা যাইবেক তাহার পর মাসের প্রথম দিবসে প্রতি ফারমা এক আনা হিসাবে তাহার মাসিক বিল প্রেরণ দ্বারা ঐ মূল্য আদায় করা যাইবেক, তাহা হইলে অনায়াসে মুদ্রিত হইবে এবং সাধারণে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন, অতএব প্রার্থনা যে সাধারণে এতদ্বিষয়ে সাহায্য প্রদান করেন। ইতি

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।"

'পঞ্চদশী' গ্রন্থের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৬২।

বেদান্তদর্শনম্‌। প্রথম খণ্ড। ১৭৮৪ শক [১৮৬২]

"ব্রহ্মমীমাংসা—শারীরক সূত্র, শাঙ্কর ভাষ্য ও আনন্দগিরি টীকা এবং বাঙ্গলা ভাষা অনুবাদ সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া মুদ্রিত হইতেছে, এক্ষণে তাহার প্রথম খণ্ড অর্থাৎ প্রথম পাদ প্রকাশ হইয়াছে··· ।"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৭৮৪ শক।

ঐ। অধিকরণমালা। ১৭৮৫ শক [১৮৬৩]

"বেদান্ত দর্শনের অধিকরণমালা পুস্তক সমুদায় মুদ্রিত হইয়াছে··· ।" —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৭৮৫ শক

সংস্কৃত

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্‌। পূর্ব্বকাণ্ডম্‌। কুলাবধূতশ্রীমদ্ধরিহরানন্দনাথ ভারতী বিরচিতয়া টীকয়া সহিতম্‌। শ্রীযুক্ত রায় কালীকিঙ্কর রায় বাহাদুরস্য অভিমতানুসারতঃ ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশেন সংস্কৃতম্‌। ১৭৯৮ শক।

পুস্তকখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' শ্রাবণ ১৭৯৬ শক সংখ্যায় ইহা প্রথম সমালোচিত হয়। তখন আনন্দ-চন্দ্রের সহযোগে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের (বিদ্যারত্ন) নামও সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে' আছে:

> "তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণতন্ত্র একখানি অতি প্রধান গ্রন্থ। ইহাতে ব্রহ্মোপাসনা, কৌলিকোপাসনা, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, দশসংস্কার প্রভৃতি যথাক্রমে বর্ণিত রহিয়াছে। অন্যান্য তন্ত্রের ন্যায় ইহারও ভাষা অতি সরল। পাঠকগণ অধ্যয়নকালে অনায়াসেই সমস্ত ভাব

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাঁহারা তন্ত্র শাস্ত্রের মর্ম্মাবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ইহা দ্বারা বিশেষ সুখানুভব করিতে পারিবেন।

"প্রায় আট বৎসর হইল এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার প্রথম যত্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে এক খণ্ড ভিন্ন হস্তলিপির সংগ্রহ না হওয়াতে উহা সম্পন্ন হইতে পারে নাই। পরে ১২৭৯ সালের কার্ত্তিক মাসে জেলা ২৪ পরগণ'র অন্তর্গত পাটদহ নিবাসী রাজা নৃসিংহচন্দ্র দেব রায় বাহাদুরের বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের পুস্তকালয়ের এক খণ্ড ও কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয় হইতে এক খণ্ড এই দুই খণ্ড হস্তলিপি সংগৃহীত হয়। এই তিন খণ্ড হস্তলিপি অবলম্বন করিয়া মহানির্ব্বাণ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইল। কিছু দিন পরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুস্তকালয় হইতে আর এক খণ্ড সটীক দেবনাগর হস্তলিপি প্রাপ্ত হওয়া গেল। তখন পূর্ব্বমুদ্রিত কতিপয় ফর্ম্মা পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রথম হইতে সটীক মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করা হয়। অনন্তর যন্ত্র পরিবর্ত্তন প্রভৃতি নিবন্ধন সম্পূর্ণ গ্রন্থ একেবারে প্রকাশে বিলম্বের আশঙ্কা করিয়া খণ্ড ক্রমে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সংস্করণে টীকানুযায়ী পাঠ মূলে সন্নিবেশিত করিয়া অন্যান্য পাঠক মহাশয়দের সুবিধার জন্য নিম্নে সন্নিবেশিত করা গিয়াছে।

"আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য ও সহকারী সম্পাদক পণ্ডিতবর ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়, রামায়ণ প্রচারক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছী নিবাসী ৺কালীকিঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউসনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন মহাশয় অংশ ক্রমে এই গ্রন্থের

সংস্করণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বেদান্তবাগীশ মহাশয় সংস্করণ কার্য্যের অধিকাংশ সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থমুখে তাঁহারই নামোল্লেখ করা গেল।"

ভগবদ্গীতা। ১৮৮২ (?)।

ইহা আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একযোগে সম্পাদন করেন।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রবর্ত্তিত "Bibliotheca Indica" গ্রন্থমালার অন্তর্ভু্ক্ত কয়েকখানি গ্রন্থও সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন তালিকা হইতে এইগুলির নাম ও প্রকাশ-কাল জানা যাইতেছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-তালিকায় প্রদত্ত প্রকাশ-কাল প্রধানতঃ অনুসৃত হইল :

গৃহ্যসূত্র, ১ম খণ্ড (?)

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সহযোগে সম্পাদিত।

ঐ **২-৪ খণ্ড**	১৮৬৮, '৬৯
তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ, ১-১২ খণ্ড	১৮৬৯, '৭০
ঐ, **উত্তর ভাগ**	১৮৭৪ (?)
শ্রৌতসূত্র, ১-৭ খণ্ড	১৮৭০

এতদ্ব্যতীত ১৮৭০-৭১ সালে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ২১০, ২১৩, ২১৯ ও ২২৫ সংখ্যক গ্রন্থও তিনি সম্পাদন করেন।

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল অসামান্য। দুঃখের বিষয়, এরূপ একজন নিষ্ঠাবান্ সাহিত্য-সাধকের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অযোধ্যানাথ কর্ম্মজীবনে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবার তথা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের প্রথম দিকে। তাঁহার গুণপনা ও বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে কলিকাতা (পরে, আদি) ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মীরূপে গ্রহণ করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবক হিসাবে তিনি অনতিকাল মধ্যে সকলের শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

পাকড়াশী মহাশয়ের ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা সে যুগের ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতাদের একটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। তাঁহার ভাষা ছিল লালিত্য-পূর্ণ, মাধুর্য্যমণ্ডিত ও প্রাণস্পর্শী। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং অন্যান্য সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা হইতে তাঁহার এই সময়কার কার্য্যকলাপের বিষয় কিছু কিছু জানা যাইতেছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ঠাকুর-পরিবারের সহিত সংস্রব ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ অযোধ্যানাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারে স্ত্রীশিক্ষায় কার্য্যে ব্রতী হন। এ সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন :

"আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার সেজদাদা মহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিন জন, মাতুলানী, দিদি ও আমার ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদেব পাঠ্য হইল।"*

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বলিয়াছেন: "অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে পড়াইতেন।"†

অযোধ্যানাথ ১৭৮৬ শকে (১৮৬৪-৫) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ-সভার সভ্য নিযুক্ত হন। তখন কেশবচন্দ্র সেন ইহার সম্পাদক। এই বৎসর পৌষ মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং ট্রষ্টীর ক্ষমতাবলে অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে সমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন।‡

পরবর্ত্তী ফাল্গুন মাসেই (১৮৬৫) অযোধ্যানাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক হইলেন। তাঁহার স্থলে ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক হইলেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।§ ১৭৮৮ শকের চৈত্র মাস (১৮৬৭) পর্য্যন্ত অযোধ্যানাথ পত্রিকার সম্পাদনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পুনরায় ১৭৯১ শকের বৈশাখ মাস (১৮৬৯) হইতে মৃত্যুর (ভাদ্র ১৭৯৫ শক) কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। প্রথমে কলিকাতা, পরে

---

* "আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা। ও তাহার সংস্কার।" —প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬।

† জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। পৃ. ১১৯।

‡ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—পৌষ ১৭৮৬ শক।

§ ঐ —ফাল্গুন ১৭৮৬ শক।

(পৌষ ১৭৯০ শক হইতে) আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ-সভারও তিনি বরাবর সভ্য ছিলেন।

সমাজ সম্পৃক্ত নানা কার্য্যের সঙ্গেই পাকড়াশী মহাশয়ের যোগ ছিল। তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বাংলায় বক্তৃতা করিতেন। এ সম্বন্ধে আষাঢ় ১৭৮৭ শকের (১৮৬৫) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ :

"ব্রহ্মবিদ্যালয়। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার অপরাহ্ণ চারিটায় ও অন্যান্য রবিবার প্রাতঃকালে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ইংরাজী ও বাঙ্গলায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ হইয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ রায়, বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় উপদেশ প্রদান করেন।"

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার অধীনস্থ ব্রহ্ম-বিদ্যালয়েও অযোধ্যানাথ প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবারে ধর্ম্মনীতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন।*

অযোধ্যানাথ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের বিশেষ আস্থাভাজন হইয়া-ছিলেন। তাঁহাদের একটি প্রস্তাবে দেখিতেছি :

"১৭৮৬ শকের ১ পৌষ অবধি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল দান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উপকারার্থে ব্যয় করিবার ভার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই তিন জনের উপর সমর্পিত হয়।"†

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক।

† ঐ —বৈশাখ ১৭৮৮ শক।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহায়তা লাভ করিলেও অযোধ্যানাথ জীবন-সায়াহ্নে তাঁহার বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন।* তিনি ভীষণ অর্থকষ্টেও পতিত হন।

মৃত্যু

অযোধ্যানাথ ১৮৭৩ সনের ২৮শে আগষ্ট ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমসাময়িক বহু পত্রিকা গভীর শোকপ্রকাশ করেন। ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ দিবসীয় 'ভারত সংস্কারক' লেখেন :

> "গত ১৩ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট) পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন···। ইনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ, সুলেখক ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্ম ছিলেন। গত ১০ বৎসর ইনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং ঐ সমাজের পতন অবস্থায়ও তাঁহার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকে উপাসনা স্থানে যাইতেন। ইনি কয়েক বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার নির্ব্বাহ করেন···। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

---

* 'হিন্দু পেট্রিয়ট' অযোধ্যানাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া লেখেন :

"The late murder of his brother somewhere at Chagdah under suspicious circumstances, and the alienation of Babu Debendra Nath Tagore's sympathy from him, which resulted in his resignation of his seat at the Somaj preyed upon his mind keenly, while his body was undermind by a protracted attack of dysentery."—রামগোপাল সান্যাল কৃত *Reminiscences and Ancedotes of Great men of India, both European and Native, Part II*—পৃ, ১০৩-এ উদ্ধৃত।

সাংবৎসরিক বক্তৃতা সকল একত্র করিয়া 'মাঘোৎসব' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহার শেষে পাকড়াশী মহাশয়ের বক্তৃতাটি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা উক্ত সমাজের উৎকৃষ্ট বক্তৃতা সকলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট...। ইনি 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে অতি সরস ও মধুর ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক অনেকগুলি মূল সত্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইনি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুবাদেরও সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি জীবনের শেষাংশে অনেক দুরবস্থায় পড়িয়া এবং ৩ মাস কাল শয্যাগত থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

পাকড়াশী মহাশয়ের মৃত্যুতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (আশ্বিন ১৭৯৫ শক) লেখেন :

"আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে আমাদের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য ও এই পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় গত ১৬ ভাদ্র শনিবার দিবসে পরলোক গমন করিয়াছেন। পাকড়াশী মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ বক্তা ও সুলেখক ছিলেন। এমন অল্প লোক আছেন যাঁহারা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কুশল সম্পাদন করুন।"

গ্রন্থ ও রচনার নিদর্শন

উপরে 'মাঘোৎসব' ও 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' দুইখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। 'মাঘোৎসব'-এর ভূমিকা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সম্বলিত, এবং ভূমিকায় প্রদত্ত তারিখ ১১ই মাঘ ১৭৮৭ শক

(১৮৬৬ খ্রীঃ)। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' পুস্তকখানি সম্পূর্ণ পাকড়াশী মহাশয়ের রচনা। এখানি ১৮৭০ সনের প্রথমে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া 'দশোপদেশ' পুস্তকখানিতেও পাকড়াশী মহাশয়ের একটি উপদেশ (দ্বিতীয়) স্থান পাইয়াছে। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' পুস্তকখানির পরিচয় আগে দিয়া পরে এই তিনখানি হইতেই রচনার নিদর্শনস্বরূপ অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিব।

ব্রহ্মবিদ্যালয়। ১৮৭০।

বিজ্ঞাপনে অযোধ্যানাথ লিখিতেছেন :

"যখন আমরা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ দান করিতাম, তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য, আমার পূজনীয় গুরুদেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে কহিয়াছিলেন যে, শিক্ষাদানকালে ছাত্রগণ অপেক্ষা উপদেষ্টা স্বয়ং অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃই আমি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং যে উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহাই রক্ষা করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম এবং তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে অষ্টাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে শেষ কয়েকটি উপদেশ ভিন্ন আর সমস্তই তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে অনাবশ্যকবোধে তাহার একটি উপদেশ পরিত্যাগ ও অবশিষ্ট সমুদায়ের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয় নামেই ইহা গ্রথিত করিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও ভাব ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবলম্বন করিয়া এই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, সুতরাং ইহার প্রস্তাব সকল তদনুসারেই বিন্যাস করা হইয়াছে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
৬ চৈত্র, ১৭৯১ শক

শ্রীঅযোধ্যানাথ পাকড়াশী"

পুস্তকে সতরটি প্রস্তাব রহিয়াছে :

"১। শিক্ষার আবশ্যকতা, ২। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ, ৩। ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার উদ্দীপন, ৪। ব্রহ্মানুরাগ ও তাহার উদ্দীপন, ৫। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী, ৬। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার, ৭। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ, ৮। জগৎ ও ঈশ্বর, ৯। ঈশ্বরের সত্য ভাব ও আমাদের উপর তাঁহার অধিকার, ১০। ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছা, ১১। ঈশ্বরের অনন্ত-শক্তি ও মহাপ্রলয়, ১২। ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ, ১৩। ঈশ্বর বাক্য মনের অগোচর, ১৪। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মানন্দ, ১৫। ঈশ্বরের সহিত বাস, ১৬। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন, ১৭। ব্রহ্মানন্দ ও অভয় লাভ।"

পুস্তকের চতুর্থ প্রস্তাব "ব্রহ্মানুরাগ ও তাহার উদ্দীপন" হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"মনুষ্য অপূর্ণ-স্বভাব ; ভৌতিক প্রকৃতি, পশুভাব ও স্বাধীনতা, তিনই মানুষে জড়িত হইয়া আছে। এখানে আকর্ষণ ও বিয়োজনকে অতিক্রম করা যেমন অসম্ভব, পশুভাবের হস্ত হইতে একেবারে পরিত্রাণ পাওয়াও সেইরূপ অসাধ্য। এখানে এমন প্রত্যাশা কখনই করা যাইতে পারে না যে, মানুষ লোভ ও ভয়ে কিছুমাত্র পরিচালিত না হইয়া প্রতি কার্য্য অনুরাগের সহিত স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিয়া উঠিবে। যিনি এরূপ প্রত্যাশা করেন, তিনি মানব জাতির প্রকৃতি ও ইহলোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ কিছুই আলোচনা করেন নাই ; এবং যিনি মানুষের হস্তে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের কার্য্য দেখিতে পান না বলিয়া তাহার প্রতি দোষারোপ করেন, তিনি এক লতায় অন্ত পুষ্প উৎপন্ন হয় না বলিয়াও বিলাপ করিতে পারেন। মানুষ পশু অপেক্ষা একটিমাত্র সোপান উপরে উঠিয়াছে ; মানুষ যে মহোচ্চ-

প্রাসাদে উত্তীর্ণ হইবে, এখানে কেবল তাহার আরোহণের সূত্রপাত হয়। আমরা মনে মনে প্রেমের যে লক্ষণ নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছি, একমাত্র পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরই তাহার আধার; মানুষকে অনন্তকাল সেই প্রেমের অনুকরণ করিতে হইবে। এখানে মানুষ কখন প্রেমের, কখন লোভের, কখন উভয়েরই অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। পতি পত্নীকে যে প্রীতি করেন, পত্নী পতির প্রতি যে প্রেম প্রকাশ করেন, তাহা নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ প্রেম নহে। উভয় হইতে উভয়ের যে স্বার্থ সাধন হয়, তাহা হইতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন কর, তখন পরস্পরের যে প্রীতি দেখিতে পাইবে, তাহাই বিশুদ্ধ। পুত্র পিতামাতাকে, পিতামাতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও বন্ধু বন্ধুকে যে প্রীতি করেন, তাহাও সকল স্থানে একেবারে স্বার্থসম্পর্ক-পরিশূন্য নহে; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে একটি দূর্ব্বা-ঘাস অবধি কমল-বন পর্য্যন্ত, আপনার পুত্র অবধি উদাসীন পর্য্যন্ত, সকলেই সমভাবে আমাদের প্রেমভাজন হইত। নিরন্তর সহবাস ও মমতা-বুদ্ধি আমাদের প্রীতিকে ইতর বিশেষ করে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এখানে এমন কতকগুলি অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক আছে যে, তদ্দ্বারা আহত হইয়া আমাদের প্রীতি পক্ষপাতিনী হইয়া উঠে; ইহাই আমাদের প্রীতির অপূর্ণতার চিহ্ন। আমরা সকলকে সমভাবে প্রীতি করিতে পারি না, কেবল ইহাই যে আমাদের প্রীতিকে অবিশুদ্ধ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা নহে; স্থান-বিশেষে ও সময়-বিশেষে আমাদের প্রীতি একেবারে সীমা প্রাপ্ত হয়। প্রীতির সীমা বিদ্বেষ। পৃথিবীতে যত মনুষ্য আছে, অদ্যাপি সকলের সহিত সকলের সম্বন্ধ বদ্ধ হয় নাই। যাহার সহিত যাহার কোন প্রকার সম্বন্ধের সংস্থান হয়

নাই, তাহারা পরস্পরকে না প্রীতি করিতে পারে, না দ্বেষ করিতে যায়। যাহাদের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা ইষ্টকারী, তাহারা প্রীতিকে আকর্ষণ করে; আর যাহারা অনিষ্টকারী, তাহারা বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে। প্রীতির অপূর্ণতাই এই বিদ্বেষ ভাবকে প্রসব করে। যাঁহার স্বার্থপরতা যত অল্প হইয়া যায়, তাঁহার বিদ্বেষ ভাবও তত সংকুচিত হইয়া আইসে; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মানুষ সকলকে সমভাবে প্রীতি করিতে পারে না এবং কোন কোন স্থানে বিদ্বেষ করিয়া থাকে, এ জন্য অপূর্ণ-স্বভাব মানুষের প্রতি দোষারোপ করা উচিত নয়। পাপের প্রতি ও পাপীর সংসর্গের প্রতি বিদ্বেষভাব, অপূর্ণ-স্বভাব মনুষ্যের পক্ষে দোষ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়।" (পৃ. ৩৬-৮)

মাঘোৎসব পুস্তকের শেষ বক্তৃতাটি পাকড়াশী মহাশয়ের। ইহার কিয়দংশ এই:

"কেন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আমাদিগকে এ প্রকার করিল? কেন আমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এমন পক্ষপাতী হইলাম? কেন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আমাদিগকে চিরকালের জন্য আকর্ষণ করিয়া রাখিল?

এই জন্য যে—ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আমাদিগকে সেই আরামস্থান ব্রহ্ম-নিকেতনে লইয়া যায়; সেই প্রাণাধিক বন্ধুকে আমাদের হৃদয়ে আনিয়া আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া দেয়; যখনি চাই, তখনি সেই সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে আনিয়া দেয়; পাপে পতিত হইলে সেই পতিতপাবনকে স্মরণ করিয়া দেয়; সকল কার্য্যে সেই মঙ্গল হস্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতিকে দ্বিগুণিত করিয়া দেয়; শোক-দুঃখে আকুল হইলে সেই

প্রেমচক্ষুর সম্মুখে লইয়া সান্ত্বনা প্রদান করে এবং অন্তরের রিপুসকল উদ্বেল হইয়া আত্মাকে অশান্ত করিবার উদ্যোগ করিলে সেই শান্ত স্বরূপের গুণগান করিয়া শান্তি শিক্ষা দেয়, মরুভূমি সদৃশ সংসার ক্ষেত্রে যে একমাত্র ছায়া আমাদের বিশ্রামস্থান, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অতি সহজে অতি নিকটে তাহা আমাদিগকে আনিয়া দেয়। আমাদের চরম স্থান পরমাত্মা নিষ্ঠুর নিয়ন্তা নহেন, কিন্তু পিতার ন্যায় হিতার্থী ও জননীর ন্যায় কোমল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই মধুময় ভাব। তিনি কেবল অপূর্ণ মনুষ্যদিগের দোষ দর্শন করিবার নিমিত্তই বিশ্বতশ্চক্ষু নহেন, কিন্তু ভক্তজনের বাঞ্ছাকল্পতরু; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই আশাকর উপদেশ। তিনি উদাসীন ও মূক সাক্ষী নহেন, কিন্তু আমাদের চির-জীবন-সহায় ও চিরন্তন উপদেষ্টা; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই নিগূঢ় মত। তিনি কেবল পাপের দণ্ডদাতা নহেন, কিন্তু পাপী জনের পরিত্রাতা; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই শীতলকর সান্ত্বনা। যে তাঁহার একান্ত আজ্ঞাকারী, তিনি কেবল যে তাহাকেই পরিত্রাণ করিবেন এমন নহে, চির জীবন যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তিনি তাহাকেও পরিত্রাণ করিবেন; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই অসাধারণ উদারতা। স্বর্গধামে অপেক্ষা করিতে হইবে না, স্বাধীন ভাবে একটি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান কর, নিজ হৃদয়ের মধ্যেই সেই স্বর্গ দেখিতে পাইবে; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই অমূল্য উপদেশ। আপনার উপর কর্তৃত্ব কর, স্বাধীন হইবে; ঈশ্বরে প্রেমবন্ধন কর, পরিতৃপ্ত হইবে; ইচ্ছাকে সাধু কর, কর্ত্তব্যের পথ সরল হইবে; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই তৃপ্তিকর আদেশ। ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে নির্ভর কর, আপনার পৌরুষ অবলম্বন কর, পাপের উপর জয়লাভ কর, অকুতোভয়ে চলিয়া যাও; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই তেজস্কর বাক্য। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই

এই সকল মহত্তম উপদেশ। এই জন্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এত গৌরব ও এত আকর্ষণ।

এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই অদ্যকার উৎসবভূমি নির্ম্মাণ করিল, উৎসবদ্বার উদ্ঘাটিত করিল, সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক এখানে সমবেত করিল, স্বর্গের আনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিল, আমাদের মুদ্রিত চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিল, অতএব আজি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই জয় ঘোষণা কর, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের গুণ-গরিমা গান কর; আর মহোৎসবের আনন্দ, যত পার, উপভোগ কর। কেবল ব্রাহ্মদের জন্য নয়, কেবল ভারতের জন্য নয়, সমুদায় পৃথিবীর জন্যই এই উৎসবদ্বার উদ্ঘাটিত আছে। সকলের মন সমভাবে আকর্ষণ করিতে পারে, এমন বাহ্য সৌন্দর্য্য এ উৎসবে কিছুই নাই; তবে এখানকার এই সামান্য বাহ্য সৌষ্ঠব যদি কোন দীন হীনের নয়ন মন আকৃষ্ট করে, করুক, কিন্তু ইহার যে স্থান হইতে আকর্ষণ-শক্তি বিনির্গত হইতেছে, তাহা তোমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যাঁহারা ধন চান, রত্নগর্ভা পৃথিবীকে খনন করুন, মান সম্ভ্রম চান, রাজ-প্রাসাদে গমন করুন, কেবল প্রবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিতে চান, স্বেচ্ছাচারের সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত আছে, তথায় প্রস্থান করুন; প্রভুত্ব চান, আপনার দাসদাসীর নিকটেই অবস্থান করুন, যদি ধর্ম্মবল চান, প্রেমবল চান, আরাম চান, শান্তি চান, ঈশ্বরকে চান, এই উৎসবের অংশভাগী হউন। এখানে ধনের অনুরোধ নাই, সম্ভ্রমের অনুরোধ নাই; প্রভুত্বের অনুরোধ নাই, পদের অনুরোধ নাই; এখানে ঈশ্বরের অনুরোধ, প্রেমের অনুরোধ, ধর্ম্মের অনুরোধ, কর্ত্তব্যের অনুরোধ। সংসারে যাহা লইয়া শ্রেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্বের বিচার হয়, এখানে তাহা নাই,

এখানে যিনি ঈশ্বরের যত নিকটবর্ত্তী, তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এখানে সকলই বিপরীত; যিনি এখানকার আপনার শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই চান না, তিনিই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি এখানকার কোন কার্য্যের প্রভুত্ব করিতে চান না; তিনিই সকল কার্য্যের প্রভু। যিনি যশের বিন্দুমাত্রও চান না, তিনিই এখানকার প্রধান যশস্বী। যিনি এখানে মান সম্ভ্রম চান না, এখানে তাঁহারই মান সম্ভ্রম অধিক। যিনি আপনার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্। যিনি আপনার জন্য কিছুই রাখেন না, এখানকার সমস্তই তাঁহার জন্য থাকে। অধিক কি, সংসারে যখন রাত্রি, এখানে তখন দিবা, সংসারে যখন দিন, এখানে তখন রাত্রি, সংসারে যিনি নিরন্তর জাগিয়া আছেন, এখানে তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত; সংসারে যিনি নিদ্রিত, এখানে তিনি জাগ্রৎ। আমাদের উৎসবের এই অবস্থা, এই গতি, এই ভাব, এই ভঙ্গী; ইচ্ছা হয় উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ কর, আমাদিগকে আপ্যায়িত কর, আপনারাও আপ্যায়িত হও। বাহিরে থাকিয়া দর্শন করিলে ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, হয় ত সকলই বিশৃঙ্খলা—সকলই প্রহেলিকা দেখিবে। অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবে। 'ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চ নাসীৎ; তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।' 'পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।' এইটুকু এই প্রকাণ্ড ব্যাপারের ভিত্তিভূমি। 'তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।' 'তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা,

সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, শর্ব্বশক্তিমান্ স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।' ইহাই জীবন। 'একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।' 'একমাত্র তাঁহার উপাসনাদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।' এইটি ইহার ফল। 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।' 'তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।' এইটি আমারদের উৎসব।" (পৃ. ২০৮-১১)

আমরা আগেই জানিয়াছি, **দশোপদেশ** সম্পাদন করেন পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় শ্রাবণ ১৭৯২ শকে (১৮৭০)। অযোধ্যানাথকৃত দ্বিতীয় উপদেশ হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:

"সেই আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।" মনুষ্যের এক অংশ শরীর আর এক অংশ আত্মা। শরীর যে পৃথিবীর বস্তুতে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিছুকাল পরেই সেই পৃথিবীর সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহার গর্ভে যে আত্মা প্রতিপালিত হইতেছে, সে অনন্তকাল বিদ্যমান থাকিয়া লোক লোকান্তরে পরিভ্রমণ করিবে। এই আত্মা শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে, কিন্তু শরীর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেমন আমি এই গৃহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্তু গৃহের মধ্যেই অবস্থান করিতেছি, সেইরূপ আত্মা বিভিন্ন-প্রকৃতি শরীররূপ নিকেতনে ঈশ্বরের আজ্ঞায় অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীর সহিত কথোপকথন করিতেছে; এই আত্মাই আমি। আত্মা এই শরীরে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু শরীরের সর্ব্বাংশের সহিত তাহার সাক্ষাৎ যোগ নাই; শরীরে অংশবিশেষ যে মস্তিষ্ক, কেবল তাহারই সহিত আত্মার সাক্ষাৎ যোগ। সেই মস্তিষ্ক আভ্যন্তরিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

অস্ত্র সহকারে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ সংঘটন করিয়া দিতেছে, এবং কেবল সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিতই এই বাহ্য জগতের সাক্ষাৎ যোগ দৃষ্টিগোচর হয়। দেখ! আত্মা এই ভৌতিক জগৎ হইতে কত দূরে অবস্থান করিতেছে এবং কত প্রকার যন্ত্র সহকারে ইহার সহিত সম্মিলিত হইতেছে।

আত্মা যে শরীর হইতে ভিন্ন ও এই জগৎ হইতে ভিন্ন, ইহা সকলেই বলিবেন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই ভিন্নতা স্পষ্টরূপে অনুভব করানই অদ্যকার উদ্দেশ্য। যদি কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, যদি আপনাদের ধ্যানপথে জড় হইতে বিভিন্নপ্রকৃতি আত্মা অবভাসিত হইয়া থাকে, তবে ক্ষণকালের নিমিত্তে সমুদায় বিষয় হইতে চিন্তাকে পৃথক্ করিয়া আপনাতে নিয়োজিত করুন। আমি যদি হস্ত নই, পদ নই, চক্ষু নই, কর্ণ নই, শিরা নই, মস্তিষ্ক নই, তবে আমি কি, একবার ধ্যান করিয়া দেখুন। কি দেখিতেছেন? যেমন জড় বস্তুকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা জড় বস্তুর প্রতিকৃতি কল্পনাসহকারে মনে মনে ধ্যান করা যায়, আত্মাকে সেরূপ করিয়া গ্রহণ করিবার উপায় নাই। আমরা জড় বস্তুকেও স্বরূপতঃ গ্রহণ করিতে পারি না, ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল জড়ের গুণ সকল প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু সেই সমস্ত গুণের আধারস্বরূপ বস্তুকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না; আত্মাকেও আমরা স্বরূপতঃ গ্রহণ করিতে পারি না, কেবল আত্মার গুণ সমস্ত মানস প্রত্যক্ষের গোচর হয়। দেখ! আমরা আপনাকে আপনি স্বরূপতঃ জানি না। অতএব আপনাকে সেরূপ করিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হউন; আমি সমুদায় জড় হইতে পৃথক্ এবং জ্ঞান প্রাণ ভাব শক্তি সমন্বিত আত্মা—আমি চক্ষু নই, কিন্তু আমি চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া থাকি; আমি হস্ত নই, কিন্তু হস্তদ্বারা গ্রহণ করিতে পারি; আমি বাহিরের কোন বিষয় নই, কিন্তু আমি বিষয়ের দ্রষ্টা, শ্রোতা, জ্ঞাতা ও মন্তা; আমরা এইরূপ আপনাকে জানিতে অধিকারী হইয়াছি।" পৃ. ৭-৯।

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে]
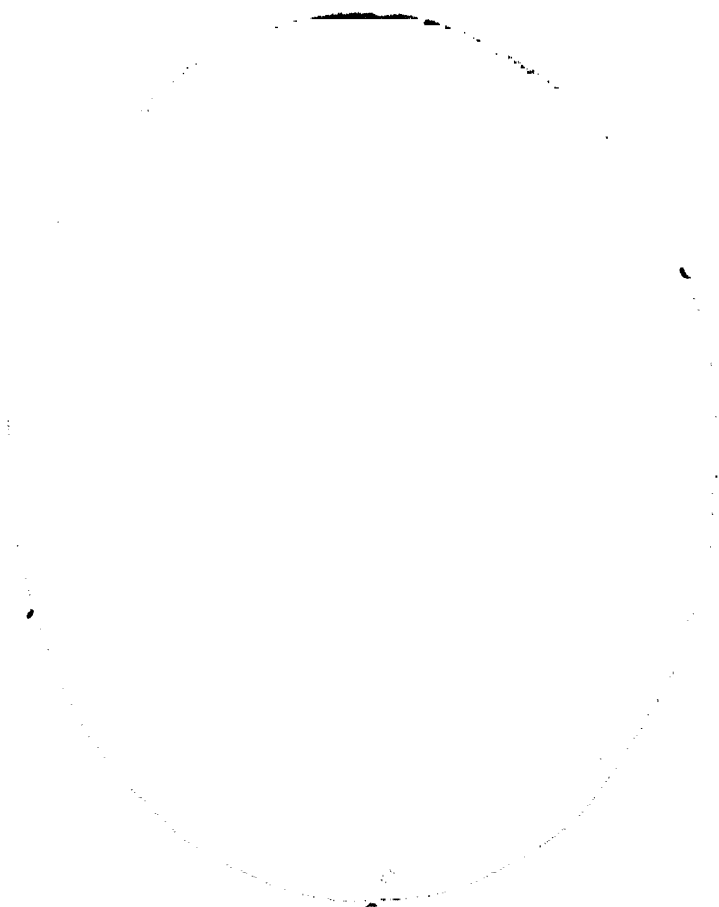
হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

(? ১৮৩১—১৯০৬)

ভূমিকা

পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মূল বাল্মীকি রামায়ণের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদক বলিয়া প্রখ্যাত। তিনি সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিদ্ এবং বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর মত হেমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তথা আদি ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করিয়া পরিপুষ্ট ও ফলপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত উভয় ব্যক্তির ন্যায় হেমচন্দ্রও তাঁহার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য এবং বাংলা সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি আদি ব্রাহ্মসমাজের সেবায় পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র-মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট; কিন্তু বিরাট্ মহীরুহের আশ্রয়ে থাকায় তিনি সাধারণের দৃষ্টি হইতে কতকটা অন্তরালে পড়িয়াছিলেন; আজিও যেন তিনি অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ মাত্র অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পরলোকগত হইলেও, হেমচন্দ্রের জীবন-কথা উপযুক্ত মালমশলার অভাবে যেন কতকটা ধোঁয়াটে হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি সমসময়ের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' তদ্‌রচিত গ্রন্থসমূহ, তাঁহার আশ্রিত পুত্রোপম ডাঃ শ্রীযুত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের* পত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি

---

* ডাঃ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: তিনি [হেমচন্দ্র] ছিলেন আমার 'বন্ধুশ্রেষ্ঠ, গুরু ও শিক্ষাদাতা'।

এবং অন্যান্য সূত্র হইতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহার নিরিখে এখানে তাঁহার জীবন-কথা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

বংশ-পরিচয় ঃ জন্ম

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যবংশীয়। দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলে তাঁহার জন্ম। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কর্ত্তৃক উৎকল প্রদেশ আক্রান্ত হইলে হেমচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা আদিনিবাস যাজপুর হইতে বঙ্গদেশে চলিয়া আসেন এবং যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে হোমড়া গ্রাম ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। কিন্তু সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের হস্তে রাজা প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর রাজ্যে যেরূপ লুঠতরাজ ও বিশৃঙ্খলা সুরু হয়, তাহাতে তাঁহারা উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান মজিলপুর গ্রামে আগমন করেন।* মজা গঙ্গার গর্ভোত্থিত গ্রাম বলিয়া 'মজিলপুর' এই নাম। টোল চতুষ্পাঠী তথা সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য এই গ্রামের একদা প্রসিদ্ধি ছিল। হেমচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ এখানে আগমনানন্তর অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিরত হন। এই বংশে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন। গত শতাব্দীতে মজিলপুরনিবাসী হরানন্দ বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা এবং রসিকতাপ্রিয়তা সুবিদিত ছিল। তিনি মূল মহাভারত হইতে বিষয়বস্তু লইয়া 'নলোপাখ্যান' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র

* বঙ্গে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক—শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য। ২য় সং, পৃ. ২৩।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা এবং কবি ও সাহিত্যিক। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন শিবনাথের জ্ঞাতিভ্রাতা। শিবনাথ 'আত্মজীবনী'তে হেমচন্দ্রকে একাধিক বার 'জ্ঞাতি-দাদা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের পিতা রামধন ভট্টাচার্য্য সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—হেমচন্দ্র, মথুর ও শ্রীনাথ।

প্রথম জীবন : শিক্ষা ও কর্ম্ম

হেমচন্দ্র কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষ হইলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আনুকূল্যে সরকারী বিদ্যালয়-পরিদর্শক বিভাগে সহকারী পরিদর্শক বা সাব্-ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। দূরদেশে যাইতে হইবে বলিয়া কিছুকাল পরে তিনি ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করেন।

স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণের সহায়তায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাভারতের অনুবাদ-কার্য্য আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক ছিলেন; হেমচন্দ্রও একজন অনুবাদক নিযুক্ত হন। মহাভারতের ১৭শ বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ শকে (১৮৬৬)। ১৭শ খণ্ডের শেষে কালীপ্রসন্ন "অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার" শীর্ষে এই অনুবাদ-রচনার যে বিবরণ দেন, তাহার মধ্যে হেমচন্দ্রের উল্লেখ আছে। মৃত পণ্ডিত-অনুবাদকগণের কথা বলিয়া কালীপ্রসন্ন লেখেন :

"এখনকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র

ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসে মহাভারত-স্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম।"

অতঃপর তিনি "খণ্ডাকারে রঘুবংশ ও ভারবি অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েন ও পরে আদি ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষিদেবের নিকট পরিচিত হয়েন কিন্তু তখনও স্থায়ীভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবাব্রতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।"*

হেমচন্দ্র স্বাধীনভাবে বাল্মীকির রামায়ণ বাংলা ভাষায় অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। "বহুকাল ধরিয়া মহাভারতের অনুবাদ-কার্য্য সম্পাদন হইলে বিদ্যারত্ন স্বাধীনভাবে বাল্মীকি রামায়ণের সমূল সটীক ও সানুবাদ অতি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই রামায়ণের প্রথম অনুবাদ, যাহা বঙ্গদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়। রামায়ণ প্রকাশের সময় বিদ্যারত্নের যশঃসৌরভ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। এবং তিনি বঙ্কিমবাবু, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রবাবু [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] প্রভৃতি অনেকানেক মনীষিগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয়েন। রামায়ণ প্রকাশের সময়ে ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন করিলে বিদ্যারত্ন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার কার্য্য গ্রহণ করেন। মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদ-কার্য্যে বিদ্যারত্নের জীবনের প্রায় ৩০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।"†

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হেমচন্দ্র রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। "মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। পূর্ব্বকাণ্ডম্" সম্পাদনে হেমচন্দ্র আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহযোগী ছিলেন।

---

* 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা'—পৌষ ১৮২৮ শক।

† 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'—পৌষ, ১৮২৮ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ব্বে পরিচিত হইলেও, মহাভারত অনুবাদ সমাপ্তির (১৮৬৬) পর হইতেই হেমচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঐকান্তিক ভাবে মিলিত হইলেন। এই দুই সংস্কৃত মহাকাব্য [মহাভারত ও রামায়ণ] অনুবাদে বিদ্যারত্নের সংস্কৃত রচনা ও বাংলা ভাষায় যেরূপ দক্ষতা জন্মিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই অনুকরণীয়। হেমচন্দ্র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৭৮৯ শক) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক-পদে বৃত হন। এই পদে তিনি পূর্ণ দুই বৎসর কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পরেও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক-পদে তিনি কিছুদিন কার্য্য করেন। হেমচন্দ্র কয়েক বৎসর আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক, যন্ত্রাধ্যক্ষ প্রভৃতি পদেও নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন বর্ষের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁহার ঐ সব পদে নিয়োগের সংবাদ যথারীতি বাহির হয়। ইহার প্রধান প্রধান কয়েকটির বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক : বৈশাখ ১৭৮৯ শক—চৈত্র ১৭৯০ ;
বৈশাখ ১৭৯৯ শক—ভাদ্র ১৮০৬ শক

যন্ত্রাধ্যক্ষ : আশ্বিন ১৮০৬ শক—বৈশাখ ১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী
সম্পাদক : জ্যৈষ্ঠ ১৮০৭ শক—অগ্রহায়ণ (?) ১৮১৪;
বৈশাখ ১৮২১* হইতে মৃত্যুকাল (অগ্রহায়ণ ১৮২৮ শক) পর্য্যন্ত।

---

* "শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন"—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' বৈশাখ ১৮২১ শক। বৈশাখ ১৮২৬ শক হইতে সহকারী সম্পাদকরূপে তাঁহার নাম পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী

সম্পাদক : মাঘ ১৮০৪*—ভাদ্র ১৮০৬ শক ;

পৌষ(?) ১৮১৪—চৈত্র ১৮২০ শক

হেমচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যরূপে দীর্ঘকাল সমাজের উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। মাঘোৎসবকালে প্রথম দশ দিনের বক্তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম বক্তা থাকিতেন। তাঁহার ধর্ম্মভিত্তিক বক্তৃতাগুলি বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইত। হেমচন্দ্রের রচনাও ছিল ধর্ম্মভিত্তিক। "আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ভাব যাহাতে সঙ্কুচিত না হয়, বিদ্যারত্নের লেখনীর তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল।"† হেমচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকৃত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি

হেমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ছিল সুবিদিত। এই কারণেই এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে 'বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা'র অন্তর্গত দর্শনের পুথি সম্পাদনে নিযুক্ত করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে অণুভাষ্য নামক বেদান্তের ভাষ্য তাঁহার সুনিপুণ সম্পাদনায় বাহির হয়।

* প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের স্থলে।

† 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'—পৌষ ১৮২৮ শক।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 'ভড়জি'

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হেমচন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা ছিল। উভয়ে উভয়ের গুণে একান্ত মুগ্ধ ছিলেন। সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে সরস ও হাস্যপূর্ণ আলোচনায় শুধু হেমচন্দ্রের নিজগৃহ নহে, পল্লীও সরগরম হইয়া উঠিত। এ সম্বন্ধে আমরা নিম্নরূপ বিবরণ পাইতেছি; দ্বিজেন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রকে 'ভড়জি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন:

> "৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভড়জি'র (বিদ্যারত্ন) সহিত আলোচনা না করিয়া নিজের লেখা প্রায় প্রকাশ করিতেন না। এই সব আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত এবং তর্জন-গর্জন ও কড়ি-ফাটান হাস্যে পাড়া সরগরম হইয়া যাইত। ইংরাজীতে অপণ্ডিত হইয়াও বিদ্যারত্ন পুরাদমে আলোচনা চালাইতেন। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায় এ আলোচনা ছিল গজকচ্ছপের যুদ্ধের মত। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ একবার নিজে আসিতে না পারিয়া ৺হেমেন্দ্রনাথ সিংহের হাতে এক পত্র দিয়া পাঠান। তাহার এক স্থানে ছিল:— 'এবার দ্বিজে গজে নয়, এবার সিংহে গজে বোঝাপাড়া।' 'ভড়জি' সম্বন্ধে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথের আরও দুই ছত্র:—'ভড়জি'র অট্টহাসি বড্ড জমকালো, বুড্ঢার সদনে তাঁর আড্ডা জমে ভাল'।"

আবার পাই:

"দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—

'পাষাণ মূরতি-মন্দ, সর্দ্দারের প্রায়,
লাঠি হাতে ভাবে ভোর বাল্মীকির জয়।'

"তাঁহার 'ভাবে ভোর' অবস্থায় একটি সুন্দর photoও তুলিয়াছিলেন ৺গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ photo'র কোন কাপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।"*

সাহিত্য-চর্চা

হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ প্রকাশের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে কতকটা বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাইতেছে। মুদ্রণ-পারিপাট্যের প্রতি হেমচন্দ্রের আগ্রহ লক্ষণীয়:

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সংস্রবে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, এবং পরে ঐ সমাজের উপাচার্য্য হন। ব্রাহ্মসমাজ-লাইব্রেরীর আশ্রয়ে আসিয়া তিনি রামায়ণের রসমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হন। নানা স্থান হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তিনি রামায়ণের পাঠোদ্ধার করেন এবং নানা পাঠান্তর ও টীকা সমেত সানুবাদ রামায়ণ প্রকাশ করিতে সংকল্প করেন। কিছু মাত্র মূলধন না লইয়া এই বিরাট্ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন, অথচ কাগজে ছাপাই-এ কোথায় কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহার মতে সস্তায় ছাপাইয়া বিষয়বস্তুর অপমান করা হইত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য লইয়া মাসে মাসে কয়েক ফর্ম্মা করিয়া বাহির করিতে লাগিলেন মাসিক পত্রের আকারে। ইহার অর্দ্ধেকটায় থাকিত সংস্কৃত মূল ও টীকা, এবং বাকীটায় থাকিত অনুবাদ।"†

---

* বর্ত্তমান লেখকের নিকট লিখিত ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্র। পরে শুধু 'পত্রাংশ' বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

† পত্রাংশ।

খণ্ডশঃ রামায়ণ প্রকাশে হেমচন্দ্রের উত্তম দেখিয়া দ্বারকানাথ ভঞ্জ তাঁহাকে সটীক ও সানুবাদ রামায়ণ প্রকাশে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই অর্থ সাহায্যের ফল শুভ হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে মকদ্দমা হয়। আইনত হেমচন্দ্র অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত তাঁহাকে অর্পণ করেন। সমস্ত টাকা শোধ করিতে তিনি নিজেকে নিঃস্ব করিয়াছিলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মূল বাল্মীকি রামায়ণের হেমচন্দ্র-কৃত সংক্ষিপ্ত অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত-সম্পাদিত হিন্দুশাস্ত্র—ষষ্ঠভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের সাহিত্য-চর্চ্চা শুধু সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। তিনি অধিক বয়সে পাশ্চাত্ত্য দর্শনাদি আয়ত্ত করিবার জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। এ সম্বন্ধে জানিতে পারি :

> "তিনি ইংরাজী নির্ভুল লিখিতে বা বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পড়িয়া কষ্টে অর্থগ্রহ করিতে পারিতেন। এবং এইরূপ কষ্টে অর্থগ্রহ করিয়া শেষ বয়সে Abbott's Life of Nelson আদ্যোপান্ত পড়িয়াছিলেন।"*

বিদ্যারত্নের ইংরেজী ভাষায় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সংস্কৃত কবিতা রচনা সম্বন্ধেও জানা যায়।

তাঁহার "অপ্রকাশিত অনেকগুলি সংস্কৃত কবিতা আছে। সেগুলি বাস্তবিকই অতি সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী, ইহাতে আধুনিকতার গন্ধ লেশমাত্র নাই। বিদ্যারত্নের হৃদয় কবিত্বপূর্ণ ছিল, তিনি ইংরাজীও জানিতেন

* পত্রাংশ।

এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনাদির যথাযথ ভাবার্থ নিজ প্রতিভাবলে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"*

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ কর্তৃক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' ১৩০৮, আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে তেইশ সংখ্যায় হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন "রাগ-বিবোধ" নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত গ্রন্থের তেত্রিশটি শ্লোকের অনুবাদসহ বিস্তৃত আলোচনা করেন। এই গ্রন্থখানিতে মোট দুই শত পঁচিশটি শ্লোক রহিয়াছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তু তিনি পৌষ ১৩০৮ সাল হইতে মধ্যে মধ্যে পনর সংখ্যায় উক্ত 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা'য় প্রকাশিত করেন।

হেমচন্দ্র বিশিষ্ট সংস্কৃতবিদ্ হইলেও বাংলা-সাহিত্য-সাধকদের সবিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁহার উচ্চ ধারণা নিম্নের সরস উক্তিটিতে সুপ্রকট :

> "একবার আমরা সরস্বতী পূজা করি। প্রতিমা কিনিয়া আনা হয়। আনিবার পর দেখা গেল দেবীর হাতে বীণা নাই। দেখিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন—'জোড়াসাঁকো থেকে আসবার পথে রবিবাবু বীণাটা কেড়ে নিয়েছে।' সেটা বোধ হয় ১৯০১ সাল, যখন রবীন্দ্র-লাঞ্ছনায় বঙ্গভাষা শতমুখী। তখনকার দিনে টুলো পণ্ডিতের মুখে ওরূপ উক্তি অপ্রত্যাশিত।"†

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ১৮৯৬ সন নাগাদ হেমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী "সংস্কৃত শিক্ষা" দুই খণ্ড রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার এ বিষয় লেখেন :

---

* 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'—পৌষ ১৮২৮ শক।

† পত্রাংশ।

"কাব্য সম্পাদন ছাড়া অন্যান্য কাজের মধ্যে চোখে পড়ে ছেলেমেয়েদের জন্য গ্রন্থ সম্পাদন। পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহায়তায় 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামে দুই খণ্ড গ্রন্থ এই সময় প্রকাশিত হয় [৮ আগষ্ট ১৮৯৬]।"*

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

হেমচন্দ্র চরিত্র অংশে বিশেষ উন্নত ছিলেন। তাঁহার পুত্রপ্রতিম ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্র হইতে আমি নানা প্রসঙ্গে বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি হেমচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "তাঁহার দীর্ঘ-গৌর সুসমঞ্জস দেহ, প্রশস্ত ললাট, প্রকাণ্ড মাথা, বিশাল চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এবং অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠ···সুগঠিত দুই চরণ সব কিছুই অনন্যসাধারণ মনে হইত। চিত্তের সারল্যে, দাক্ষিণ্যে, ঔদার্য্যে ও অলোভিতায় তিনি ছিলেন আমার কাছে আদর্শ মহাপুরুষ।"

তাঁহার নির্লোভতা ও সারল্যের নিদর্শনস্বরূপ ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের পত্র হইতে নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধারযোগ্য:

> "তিনি ধনী হইবার আশায় বই ছাপান নাই। ছাপান বইগুলির অধিকাংশ দপ্তরীর কাছে যাইবার পূর্ব্বেই একে একে অদৃশ্য

---

* 'রবীন্দ্র-জীবনী'—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ১ম খণ্ড (১৩৫৩), পৃ. ৩৩৫। 'সংস্কৃত শিক্ষা' দ্বিতীয়ভাগ রবীন্দ্র রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ:

"সংস্কৃত শিক্ষা। / দ্বিতীয় ভাগ / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। / বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদক / শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত। /···1896"

হইত। শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজের জন্য একখানি কাপিও রাখিতে পারেন নাই। এজন্য কিন্তু তাঁহার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। পাঁচ টাকা মূল্যের দ্রব্যের বিনিময়ে যে পাঁচটি টাকা পাইতে হইবে, এ তত্ত্ব তিনি বুঝিতেন না। আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার,—৺দ্বারকানাথ ভঞ্জের সহিত তাঁহার যে মনোমালিন্য হইয়াছিল, তাহারও কোন লক্ষণ ভবিষ্যতে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ভঞ্জপরিবারের সহিত তাঁহার হৃদ্যতাই বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি।”

‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ও (পৌষ ১৮২৮ শক) বিদ্যারত্ন-চরিত্রের এই দিকটির সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। উপরন্তু, বিদ্যারত্নকে যে ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত যুক্ত থাকায় নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, ইহাতে তাহারও উল্লেখ আছে। পত্রিকা লেখেন :

“বিদ্যারত্নের হৃদয় সারল্যে পূর্ণ ছিল। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারাই তাঁহার বিরাট্ হৃদয়ের উদারতায় মুগ্ধ হইতেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে সময়ে সময়ে যে উপদেশ দিতেন, তাহাতে তাঁহার জ্ঞান ও হৃদয় উভয়েরই আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া যাইত। ব্রাহ্মসমাজের জন্য বিদ্যারত্নকে প্রথম বয়সে অনেক ত্যাগ ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু চরিত্র ও সাধুতাবলে তিনি শত্রুরও শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন।”

মৃত্যু

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন শেষ জীবনে কিছুকাল পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। এই সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-গোষ্ঠী তাঁহার পরিবারের জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা করেন। ব্যক্তিগতভাবে যাঁহারা তাঁহাকে শেষ সময়ে

সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং চন্দ্রনাথ বসুর নাম বিশেষ স্মরণীয়। হেমচন্দ্র ১৯০৬ সনের ১০ই ডিসেম্বর (২৪ অগ্রহায়ণ ১৩১৩) প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (পৌষ ১৮২৮ শক) এক প্রস্তাব লেখেন। ইহার অনেকাংশও আমি বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। অন্যান্য কথার মধ্যে 'পত্রিকা' লেখেন— "হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে আদি ব্রাহ্মসমাজের যে সমূহ ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।"

গ্রন্থাবলী : সংস্কৃত-বাংলা

রঘুবংশ। / সংস্কৃত মূল। / মল্লীনাথ কৃত সঞ্জীবনী টীকা / এবং / শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকৃত অনুবাদ / সহিত ৮ সংখ্যায় / শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। পৃ. ৬+২৮৪+৪। সন ১২৭৫ [ইং ১৮৬৮]।

পুস্তকখানি "বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকা" গ্রন্থমালার অন্তর্গত। সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত 'উপসংহারে' (পৃ. ৵০, ৶০) 'রঘুবংশ' অনুবাদ ও প্রকাশ সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ লিখিয়াছেন :

> "যে সকল পণ্ডিতগণের পরিশ্রমে রঘুবংশখানি অনুবাদিত হইয়া উঠিয়াছে এস্থলে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতেছি। স্বদেশানুরাগী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের পুরাণ সংগ্রহের মহাভারত অনুবাদ কার্য্যে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাদের রঘুবংশের অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হন। শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় প্রথম সর্গের কয়েকটি শ্লোক অনুবাদ

করিয়াই কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যে আবদ্ধ হন; তন্নিবন্ধন শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। প্রথম সর্গের কয়েকটি শ্লোক ব্যতীত আদ্যোপান্ত সমুদায় রঘুবংশখানি উক্ত ভট্টাচার্য্য অনুবাদ করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। আমরা ইহার রচনাশক্তির পরিচয় কি দিব; উল্লিখিত মহাভারত ও এই রঘুবংশ এবং বর্ত্তমান তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা ইহার সহৃদয়তা ও অমায়িকতা গুণে যারপর নাই আপ্যায়িত আছি। পরিশেষে বক্তব্য হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এই রঘুবংশের কয়েক সর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিয়া দিয়াছেন। ইনিও একজন ঐ মহাভারতকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।"

কিরাতার্জ্জুনীয়। ভারবি। সংস্কৃত সহ বাংলা অনুবাদ। পৃষ্ঠা-সংখ্যা যথাক্রমে ১৪৪, ১৭৬।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকায় (Vol. II, Part IV, p. 156) 'কিরাতার্জ্জুনীয়ে'র প্রকাশকাল '১৮৬৭' দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার অনুবাদ ও প্রকাশ যে 'রঘুবংশ' প্রকাশের পরে আরব্ধ হয়, 'বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকা'র সম্পাদকের নিম্ন উক্তি হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। ইহাও 'রঘুবংশ' গ্রন্থের 'উপসংহার' হইতে উপরি-উদ্ধৃত অংশের অব্যবহিত পরে আছে:

"আমরা এই সকল উদারচরিত পণ্ডিতগণের সহায়তা, বিদ্যানুরাগী, দেশহিতৈষী ধনবান্ মহাশয়দিগের বিশেষ আনুকূল্য এবং উৎসাহী পাঠক ও সহৃদয় বান্ধববর্গের সাহায্য অবলম্বনপূর্ব্বক মহাকবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ খানির অনুবাদ সমাধা করাতে

অপেক্ষাকৃত কিছু সাহস পাইয়াছি ; এক্ষণে কবিবর ভারবি বিরচিত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্য প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। উক্ত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থখানিও অনুবাদ করিতেছেন।"

রামায়ণ। রামানুজের টীকাসহ সংশোধিত সংস্কৃত ও বাংলা। সটীক সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ ৬৪ পৃষ্ঠা পরিমিত প্রতি খণ্ডে ১৮৬৯-১৮৮৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত।

বালকাণ্ড। ১৮৬৯-৭০

অযোধ্যাকাণ্ড। ১৮৭০

অরণ্যকাণ্ড। ১৮৭৪

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। ১৮৭৫

সুন্দরকাণ্ড। ১৮৭৮

লঙ্কাকাণ্ড। ১৮৭৮-৮০

উত্তরাকাণ্ড। ১৮৮৪

প্রতিটি কাণ্ডের আখ্যাপত্রে, 'দ্বারকানাথ ভঞ্জের অনুমত্যনুসারে'— এইরূপ উল্লেখ আছে। সংস্কৃতে লিখিত বালকাণ্ডের ভূমিকাটি এখানে উদ্ধৃত হইল :

বিজ্ঞাপনম্

দুর্দ্দান্তদৃপ্ত-দানব-দল-দলনোদ্দীপিত-কীর্ত্তের্বিকর্ত্তনকুলকুমারস্য রামস্য চারু-চরিত চিত্রিতং বিচিত্রমিদং রামায়ণং মহৎপ্রমোদস্থানং ভরত-বিষয়বাস্তব্যানাং বিদগ্ধ-বিদ্বজ্জন-পরিষদাম্। অপূর্ব্ববস্তু-রস-ভাব-বিশেষোদাররমণীয়েঽস্মিন্ দৃশ্যতে বিষয়ান্তরবাসিনামপ্যনল্পীয়ান্ আদরঃ। এতস্য তু কবি-কুলোপজীব্যস্য মহাকাব্যস্য বহুদিনাদারভ্য সৌলভ্য-মুপপাদয়িতুং মনসি মে মহান্ প্রবন্ধঃ সমজনি। কিন্তু বহ্বায়াসকরং

বহুব্যয়সাপেক্ষমিদমিতি নিরপেক্ষপ্রায় এবাসম্। অথ অতীতে বহুতিথে কালে ধর্ম্মকামেন শ্রীমতা দ্বারকানাথভঞ্জেনাঞ্জসা মদীয়ং ভাবমবগম্য বিভাব্য চ চরিতবৈভবং প্রতিপাদ্যনায়কস্য আদিষ্টোঽস্মি সানুবাদং সটীকঞ্চ রামায়ণং প্রচারয়িতুম্। প্রারব্ধে চ কার্য্যবিস্তরে গ্রন্থস্যাতি-দুস্তরতয়া আদ্রৃতেষস্মদ্দেশ-প্রচলিতেষু আদর্শেষু বিভিন্নপ্রায়ং পাঠ-পরিপাটীকমালোক্য সংশয়িতচিত্তবৃত্তিরভবং মতিমকরবঞ্চ দাক্ষিণাত্যানাং পাশ্চাত্যানাং চ পুস্তকানামাশ্রয়ে। তত্রত্যা হি সর্ব্বে লিপিকরাঃ সংস্কার-বিরহাৎ সন্দর্ভস্য বৈষম্যমবৈষম্যং বা কিমপ্যলভমানাঃ সুদর্শং কৃত্বৈবাদর্শং লিখন্তি। বঙ্গদেশে তু তদ্বৈপরীত্যমেব দৃশ্যতে। অত্র হি বহুষু শাস্ত্রেষু কৃতশ্রমাঃ প্রায়শঃ পণ্ডিতা এব লিপিকরাঃ। অতস্তে সংশোধনানুরোধেন স্বেচ্ছাতঃ স্বকপোলকল্পিতং পাঠমাকলয্য যোজয়ন্তি তেনৈব এতদ্দেশ প্রচলিতেষু তেষু গ্রন্থেষু পরস্পরবৈষম্যং শ্লোকাধিক্যমধ্যায়াধিক্যঞ্চ সমুপজাতম্। ন জানে কিমিদমনুষ্ঠিতং সন্দেহদোলায়িতধিয়া। অতোঽহমিদানীমভ্যর্থয়ে প্রেক্ষাবতামাভি-মুখ্যমিতি।

কলিকাতা
ব্রাহ্মসমাজস্য
সংবৎ ১৯২৫।

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যস্য

সংস্কৃত

১অণুভাষ্যম্। বাদরায়ণ-প্রণীত-বেদান্তসূত্রস্য বল্লভাচার্য্যকৃত-দ্বৈতা-দ্বৈতপরং ব্যাখ্যানম্। ১৮৮৮-১৮৯৭।

এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার অন্তর্গত। ইহার ভূমিকা ইংরেজীতে লিখিত। হেমচন্দ্র

তিনখানি পুথির পাঠ মিলাইয়া এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ভূমিকাটি এইরূপ :

"Vallabhacarya's 'Anubhasya' is an extremely rare work in this country. As the work however in which Vallabhacarya has tried to establish the Dwaitadwaitadoctrine on the authority of the same philosophical principles, supported by Vedic texts and Natural Logic, which were used in the same way by Sankaracharya, to establish and promulgate his Adwaita doctrine, it deserves to be studied by all. In editing the 'Anubhasya' I have examined the three manuscript copies of it. One of this was received from Dr. Bhandarkar, another from Pt. Ramnath Tarkaratna and the third from Damodar Das Varman. Of these the Ms. sent by Dr. Bhandarkar is the most accurate. I have carefully considered the different readings given in these three Mss. and I shall consider my labour amply rewarded if the 'Anubhasya' as edited by me, meets with the approval of the public.

Hemchandra Vidyaratna."

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ / সুগৃহীতনামধেয়স্ত / মহর্ষের্দেবেন্দ্রনাথস্তাভ্যনুজ্ঞয়া / তদীয় সভাধ্যক্ষ শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্নেন / সংস্কৃতেন সংকলিতয়া বিবৃত্যা সহিতঃ / শক ১৮১৭ (বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে প্রদত্ত প্রকাশ-কাল—১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫)।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্কৃত অনুবাদ। দেশ-বিদেশের বিদগ্ধসমাজে ইহা সবিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে।

বাংলা

হিন্দুশাস্ত্র। ষষ্ঠ ভাগ। রামায়ণ। ১৮৯৬ ইং।

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের দ্বারা বাংলা ভাষায় শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহের সংক্ষেপে অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন (১৮৯০-৯৭)।

রমেশচন্দ্র ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। 'রামায়ণে'র সূচনায় তিনি নিজ স্বাক্ষরে নিম্নের ভূমিকাটি লেখেন :

"পণ্ডিতবর শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ইতিপূর্ব্বে মূল সংস্কৃত রামায়ণ এবং তাহার একখানি বিস্তীর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশে কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের ন্যায় রামায়ণের উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ আর একখানিও নাই। তাঁহার কৃত রামায়ণের এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বঙ্গীয় পাঠক মাত্রের নিকটই আদরণীয় হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালী পাঠকদিগের জন্য একখানি অতি আবশ্যকীয় ও উপাদেয় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং আমাকে যারপরনাই অনুগৃহীত করিয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত"

রচনার নিদর্শন

"ঐ গোদাবরীর সারসশ্রেণী বিমানবিলম্বিত কাঞ্চন কিঙ্কিণীর শব্দ শ্রবণে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া যেন তোমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে। হে জানকি! বহুদিনের পর এই পঞ্চবটী দেখিয়া আমার মনে আনন্দ উপস্থিত হইতেছে। তোমার কটিদেশ অতিশয় সুকুমার হইলেও তুমি কলস দ্বারা সলিল সেচন করিয়া এই পঞ্চবটীর রসাল শিশু সকলকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলে। তুমি এই স্থানে যে সমস্ত কৃষ্ণসার মৃগকে লালন পালন করিতে, ঐ দেখ, তাহারা এক্ষণে ঊর্দ্ধমুখে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। আমি মৃগয়া হইতে এই পঞ্চবটীর

গোদাবরী সন্নিধানে প্রতিনিবৃত্ত ও উহার তরঙ্গসঙ্গশীতল সমীরণদ্বারা গতক্লম হইয়া নির্জ্জনে বেতসগৃহে তোমার উৎসঙ্গে মস্তক সন্নিবেশিত করত নিদ্রিত হইতাম, এক্ষণে তাহা বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে। যিনি ভ্রূভঙ্গী মাত্রেই রাজা নহুষকে ইন্দ্রত্ব পদ হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন এই সেই আবিল সলিলের স্বচ্ছতা সম্পাদক মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম পদ। সেই অনিন্দিত কীর্ত্তি মহর্ষির হবির গন্ধ পরিপূর্ণ গগনস্পর্শী গার্হপত্য প্রভৃতি অগ্নিত্রয়ের শিখা আঘ্রাণ করাতে আমার অন্তঃকরণ রজোগুণ বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধভাব অবলম্বন করিতেছে।

হে মানিনি! ঐ মহর্ষি শাতকর্ণির পঞ্চাপ্সর নামক ক্রীড়া সরোবর নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সরোবরের চতুর্দ্দিক কানন সমাচ্ছন্ন হওয়াতে অতিদূর প্রভাবে উহা মেঘ মধ্য হইতে ঈষৎ পরিদৃশ্যমান শশাঙ্ক বিম্বের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পূর্ব্বে ঐ মহর্ষি মৃগগণের সহিত সঞ্চরণ পূর্ব্বক কুশাঙ্কুরমাত্র আহার করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে সুররাজ ইন্দ্র সাতিশয় ভীত হইয়া পাঁচটি অপ্সরার যৌবনরূপ কপট যন্ত্রে উহাঁকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এক্ষণে সলিলান্তর্গত প্রাসাদবাসী সেই মহর্ষি শাতকর্ণির নভোমণ্ডলগত অতিবিস্তীর্ণ মৃদঙ্গধ্বনি ও সঙ্গীত শব্দের প্রতিধ্বনি দ্বারা পুষ্পকের চন্দ্রশালা সকল ক্ষণকালের নিমিত্ত মুখরিত হইতেছে।

এই সুতীক্ষ্ণনামা শান্ত চরিত্র আর এক তপস্বী ইন্ধন প্রজ্বলিত হুতাশন চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী ও সূর্য্যাভিমুখী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। ইহাঁর তপস্যা দর্শনে ইন্দ্রেরও অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়াছে। সুরাঙ্গনারা সহাস্যমুখে কটাক্ষ নিক্ষেপ ও ছলক্রমে ঈষৎ মেখলাদাম প্রদর্শন প্রভৃতি বিলাসচেষ্টা দ্বারা ইহাঁর চিত্ত বিকৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। ঐ ঊর্দ্ধবাহু সুতীক্ষ্ণ তপোধন যে হস্তে মৃগদিগের কণ্ডুতি

বিনোদন ও কুশাগ্র ছেদন করিয়া থাকেন, অক্ষমালা বলয়ধারী সেই দক্ষিণ হস্ত আমার সম্মানার্থ যথোচিত প্রসারিত করিতেছেন। উনি মৌনব্রতী বলিয়া ঈষৎ শিরঃকম্প দ্বারা আমার প্রণাম প্রতিগ্রহ করিয়া বিমান ব্যবধান মুক্ত স্বীয় দৃষ্টি পুনরায় সূর্য্যমণ্ডলে সংসক্ত করিতেছেন।" (রঘুবংশ, পৃ. ২৩৪-৩৬)

"অনন্তর শরৎকাল অতীত ও হেমন্ত সমুপস্থিত হইল। তখন রাম একদা রাত্রি প্রভাতে স্নানার্থ রমণীয় গোদাবরীতে যাইতেছেন, বিনীত লক্ষ্মণও কলশ লইয়া জানকীর সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। তিনি গমনকালে কহিলেন, প্রিয়ম্বদ! যে ঋতু আপনার প্রিয়, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়া শোভিত হইতেছে। নীহারে সর্ব্বশরীর কর্কশ হইয়াছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ, জল স্পর্শ করা দুষ্কর এবং অগ্নি সুখসেব্য হইতেছে। এই সময় সকলে নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছে। জনপদে ভোগ্যদ্রব্য সুপ্রচুর, গব্যের অভাব নাই; জয়লাভার্থী ভূপালগণও দর্শনার্থ তন্মধ্যে সতত পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং উত্তরদিক তিলকহীন স্ত্রীলোকের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। স্বভাবত হিমালয় হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সূর্য্য অতিদূরে, সুতরাং স্পষ্টতই উহার হিমালয় এই নাম সার্থক হইতেছে। দিবসের মধ্যাহ্নে রৌদ্র অত্যন্ত সুখসেব্য, গমনাগমনে কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই, কেবল জল ও ছায়া সহ্য হয় না। সূর্য্যের তেজ মৃদু হইয়াছে, হিম যথেষ্ট, অরণ্য শূন্যপ্রায়, এবং পদ্ম নীহারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে রজনী তুষারে সতত ধূসর হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না, পুষ্য

নক্ষত্র দৃষ্টে রাত্রিমান অনুমান করিতে হয়, শীত যৎপরোনাস্তি, এবং প্রহর সকল সুদীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত হইয়াছে, এবং চন্দ্রমণ্ডলও হিমাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলত এক্ষণে উহা নিঃশ্বাসবাষ্পে আবিল দর্পণতলের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না হিমজালে ম্লান হইয়াছে, সুতরাং উহা উত্তাপমলিনা সীতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বলিতে কি তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতই অনুষ্ণ, এক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে প্রাতে দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতে থাকে। অরণ্য বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সূর্য্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত হইতেছে। কনককান্তি ধান্য খর্জ্জুরপুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকে কিঞ্চিৎ সন্নত হইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে দ্বিপ্রহরেও সূর্য্য শশাঙ্কের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাতের রৌদ্র নিস্তেজ ও পাণ্ডুবর্ণ, উহা নীহারমণ্ডিত তৃণশ্যামল ভূতলে পতিত হইয়া অতি সুন্দর হয়। ঐ দেখুন, বন্য মাতঙ্গেরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সুশীতল জল স্পর্শ পূর্ব্বক শুণ্ড সংকোচ করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, সেইরূপ হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা তীরে সমুপস্থিত হইয়াও জলে অবগাহন করিতেছে না। কুসুমহীন বনশ্রেণী রাত্রিকালে হিমান্ধকারে এবং দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় লীন হইয়া আছে। নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, বালুকারাশি হিমে আর্দ্র হইয়াছে, এবং সারসগণ কলরবে অনুমিত হইতেছে। তুষারপাত, সূর্য্যের মৃদুতা ও শৈত্য এই সমস্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকিলেও সুস্বাদু বোধ হয়। হিমে নষ্ট হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহার কেশর ও কর্ণিকা শীর্ণ, এবং জরাপ্রভাবে পত্র সকল জীর্ণ হইয়া-

গিয়াছে, এক্ষণে উহার আর পূর্ব্ববৎ শোভা নাই। আর্য্য! এই সময় নন্দীগ্রামে ধর্ম্মপরায়ণ ভরত দুঃখে সমধিক কাতর হইয়া জ্যেষ্ঠভক্তি নিবন্ধন তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি রাজ্য মান ও বিবিধ ভোগে উপেক্ষা করিয়া, আহার সংযম পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করেন। বোধ হয়, এখন তিনিও স্নানার্থ প্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হইয়া সরযূতে গমন করিতেছেন। ভরত অত্যন্ত সুখী ও সুকুমার, জানি না, এই রাত্রিশেষে হিমে নিপীড়িত হইয়া কি প্রকারে সরযূতে অবগাহন করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ সত্যনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় মধুরভাষী ও সুন্দর; তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, বর্ণ শ্যামল ও উদর সূক্ষ্ম; তিনি লজ্জাক্রমে কখন নিষিদ্ধ আচরণ করেন না। সেই পদ্মপলাশলোচন ভোগসুখ তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বাংশে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি বনবাসী হইলেও তিনি তাপসের আচার অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার অনুকরণ করিতেছেন। আর্য্য! এইরূপ কার্য্যে স্বর্গ যে তাঁহার হস্তগত হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে যে, মনুষ্য মাতৃস্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে, ফলত তিনি ইহার অন্যথা করিলেন। হায়! দশরথ যাহার স্বামী, সুশীল ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী কিরূপে তাদৃশ ক্রূরদর্শিনী হইলেন।

ধর্ম্মপরায়ণ লক্ষ্মণ স্নেহভরে এইরূপ কহিতেছিলেন, এই অবসরে রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সহিতে না পারিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের ঐ কথা কও। মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা কখনই করিও না। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ় ও স্থির থাকিলেও পুনরায় ভরত-স্নেহে চঞ্চল হইতেছে। তাঁহার সেই প্রিয় মধুর হৃদয়হারী অমৃততুল্য ও আহ্লাদকর কথা সততই আমার মনে পড়িতেছে। লক্ষ্মণ! জানি না, আমি আবার কবে ভরত প্রভৃতি সকলেরই সহিত সমবেত হইব!

রাম এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক গোদাবরীতে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত স্নান করিলেন। পরে সকলে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রুদ্র যেমন নন্দী ও পার্ব্বতীর সহিত স্নানান্তে শোভা পান, ঐ সময় রামেরও সেইরূপ শোভা হইল।"—অরণ্যকাণ্ড, পৃ. ৫৪-৮।

"হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া জানকীরে দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। অশোকবন কল্পবৃক্ষে সুশোভিত, তথায় দিব্য গন্ধ ও রস সততই নির্গত হইতেছে। ঐ বন নানারূপ উপকরণে সুসজ্জিত, দেখিবামাত্র নন্দনকানন বলিয়া বোধ হয়। উহার ইতস্ততঃ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ, কোকিলেরা মধুরকণ্ঠে নিরন্তর কুহুরব করিতেছে। সরোবর স্বর্ণপদ্মে শোভমান, অশোকবৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়া সর্ব্বত্র অরুণশ্রী বিস্তার করিতেছে। ঐ স্থানে সকলরূপ ফল পুষ্পই সুলভ, নানারূপ উৎকৃষ্ট আসন ও চিত্রকম্বল ইতস্ততঃ আস্তীর্ণ রহিয়াছে। কাননভূমি সুবিস্তীর্ণ, বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকল বিহঙ্গগণের পক্ষপুটে সমাচ্ছন্ন, সহসা যেন পত্রশূন্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। পক্ষিগণ নিরন্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে, এবং অঙ্গসংলগ্ন পুষ্পে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে। অশোকের শাখা প্রশাখা সমস্তই পুষ্পিত; কর্ণিকার পুষ্পভরে ভূতল স্পর্শ করিতেছে; কিংশুক সকল পুষ্পস্তবকে শোভিত; কাননভূমি ঐ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষ সকল কুসুমিত। কাননমধ্যে বহুসংখ্য অশোক নিরীক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, এবং কোনটি নীলাঞ্জনতুল্য সুন্দর। ঐ অশোকবন দেবকানন নন্দনের ন্যায় এবং ধনাধিপতি

কুবেরের উদ্যান চিত্ররথের ন্যায় সুদৃশ্য; বলিতে কি, উহা তদপেক্ষাও অধিকতর মনোহর; উহার শোভাসমৃদ্ধি মনে ধারণা করা যায় না। উহা যেন দ্বিতীয় আকাশ, পুষ্প সকল গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। উহা যেন পঞ্চম সমুদ্র, নানারূপ পুষ্পই যেন রত্নশ্রী প্রদর্শন করিতেছে। ঐ অশোকবনে নানারূপ পবিত্র গন্ধ, উহা গন্ধপূর্ণ হিমাচল এবং গন্ধমাদনের ন্যায় বিবাজিত আছে। অদূরে অত্যুচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ, উহা গিরিবর কৈলাসের ন্যায় ধবল, উহার চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র স্তম্ভ শোভিত হইতেছে; সোপান সকল প্রবালরচিত, এবং বেদিসকল স্বর্ণময়; উহা শ্রীসৌন্দর্য্যে নিরন্তর প্রদীপ্ত 'হইতেছে, এবং লোকের দৃষ্টি যেন অপহরণ করিতেছে। উহা গগনস্পর্শী ও নির্ম্মল।

মহাবীর হনুমান ঐ অশোকবনের মধ্যে সহসা একটি কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রাক্ষসগণে পরিবৃত; উপবাসে যারপর নাই কৃশ ও দীন। ঐ রমণী পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ দুঃখনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। নানারূপ সংশয় ও অনুমানে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়। তিনি শুক্লপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ন্যায় নির্ম্মল; তাঁহার কান্তি ধূমজাল-জড়িত অগ্নি-শিখায় উজ্জ্বল; সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য ও মললিপ্ত, পরিধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিন বস্ত্র। তিনি সরোজশূন্য দেবী কমলার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার দুঃখ সন্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল বারিধারা বহিতেছে; তিনি কেতুগ্রহনিপীড়িত রোহিণীর ন্যায় একান্ত দীন; শোকভরে যেন নিরন্তর হৃদয়মধ্যে কাহাকে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহ নাই, কেবলই রাক্ষসী; তৎকালে তিনি যূথভ্রষ্ট কুক্কুর-পরিবৃত কুরঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্বিত,

তিনি বর্ষার অবসানে সুনীল বনরেখায় অঙ্কিত অবনীর ন্যায় শোভিত হইতেছেন।

হনুমান ঐ বিশাললোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কারণে সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন। ভাবিলেন, কামরূপী রাক্ষস যে অবলাকে বলপূর্ব্বক লইয়া আইসে, তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ইনি অবিকল সেইরূপই লক্ষিত হইতেছেন।

জানকীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ; স্তনযুগল বর্ত্তুল ও সুন্দর। তিনি স্বীয় প্রভাপুঞ্জে সমস্ত দিক্ তিমিরমুক্ত করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠ মরকতরাগ, ওষ্ঠ বিম্ববৎ আরক্ত, কটিদেশ ক্ষীণ এবং গঠন অতি সুদৃশ্য। তিনি স্বসৌন্দর্য্যে স্মরকামিনী রতির ন্যায় জগতের প্রীতিকর। তিনি ব্রতপরায়ণা তাপসীর ন্যায় ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, এবং এক একবার কালভুজঙ্গীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি সন্দেহাত্মক স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, স্খলিত শ্রদ্ধার ন্যায়, নিষ্কাম আশার ন্যায়, বিঘ্নবহুল সিদ্ধির ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায়, এবং অমূলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্ত্তির ন্যায়, যার পর নাই শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি রামের অদর্শনে ব্যথিত, এবং নিশাচরগণের উপদ্রবে নিপীড়িত। তিনি চপললোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন ও নেত্রজলে ধৌত, এবং পক্ষ্মরাজি কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল। তিনি নীল নীরদে আবৃত চন্দ্রপ্রভার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন।"—সুন্দরকাণ্ড, ৭১-৪।

"অনন্তর একদা আমি হল দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলাম। ঐ সময় লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিতা হয়। ঐ কন্যা ক্ষেত্র-শোধনকালে হলমুখ হইতে উত্থিতা হইল বলিয়া আমি উহার নাম

রাখিলাম সীতা। এই অযোনিসম্ভবা তনয়া আমার গৃহেই পরিবর্দ্ধিতা হয়। অনন্তর আমি এই পণ করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকার্ম্মুকে জ্যা যোজনা করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই এই কন্যা দিব। ক্রমশঃ সীতা বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্তা হইল। অনেকানেক রাজা আসিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি উহাকে কাহারই হস্তে সম্প্রদান করি নাই।

পরে নৃপতিগণ ঐ হরধনুর সার জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় মিথিলায় আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে শরাসন প্রদর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উত্তোলন করিতে পারেন নাই। তপোধন! তৎকালে মহীপালগণের এইরূপ বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াই অগত্যা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। কিন্তু পরিশেষে যেরূপ ঘটে, তাহাও শ্রবণ কর।

ভূপালগণ এইরূপ বীর্য্যশুল্কে কৃতকার্য্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে পারিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং আমিই এই কঠিন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণের মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিস্তর উপদ্রব হইতে লাগিল। আমি দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সংবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার দুর্গের সমুদায় উপকরণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম এবং তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলাম। অনন্তর তাঁহারা প্রীত হইয়া যুদ্ধার্থ আমায় চতুরঙ্গিণী সেনা প্রদান করিলেন। আমি ভূপালগণের সহিত পুনর্ব্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলাম। উভয় পক্ষে বিস্তর লোকক্ষয় হইতে লাগিল। পরে সেই

নির্বীর্য্য সন্দিগ্ধবীর্য্য দুরাচার পামরেরাও অমাত্যগণের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

তপোধন! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড হইয়াছে, সেই কোদণ্ড এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণকেও দেখাইতেছি। যদি রাম উহাতে জ্যা যোজনা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি ইহাঁকে কন্যাদান করিব। এ ধনু অষ্টচক্রের এক শকটের উপর লৌহনির্ম্মিত মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ছিল। রাজার আদেশে অতি দীর্ঘকায় পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিৎ উহা আকর্ষণপূর্ব্বক আনিতে লাগিল।

তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষণকে ধনু দেখাইবার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি কৌশিককে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এই ধনু অর্চ্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত মহাবীর্য্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষায় অসমর্থ হন, তাঁহারাও ইহার পূজা করেন। এই ধনুর কথা অধিক আর কি বলিব, মনুষ্য দূরে থাক, সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগেরাও ইহা আকর্ষণ, উত্তোলন, আস্ফালন, এবং ইহাতে জ্যা যোজনা ও শর সংযোজন করিতে পারেন না। তপোধন! আমি সেই ধনুই আনাইলাম, আপনি উহা এই কুমারদ্বয়কে প্রদর্শন করুন।

অনন্তর কৌশিক রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই হরধনু নিরীক্ষণ কর। রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জুষা উদ্ঘাটন ও ধনু নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু করতলে স্পর্শ করিতেছি। এখন কি ইহা আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারাজ জনক ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রাম অবলীলাক্রমে ঐ শরাসনের মুষ্টিগ্রহণ ও সর্ব্বসমক্ষে তাহাতে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় একটি ঘোর ও গভীর শব্দ হইল। পর্ব্বত

বিদীর্ণ হইলে ভূভাগ যেমন কম্পিত হয়, চারিদিক্ সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল।

জানকীর পরিণয়ে রাজা জনকের যে এত কাল সংশয় ছিল, তাহা অপনীত হইল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! আমি এই দাশরথি রামের বীর্য্য পরীক্ষা করিলাম। ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতি চমৎকার; আমি মনেও করি নাই যে, ইহা কখনও সম্ভব হইবে। এখন রামের সহিত সীতার বিবাহ হইয়া আমার একটি কুলকীর্ত্তি স্থাপিত হউক। বলিতে কি, এত দিনের পর আমারপ্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমার দূতগণ রথে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় গমন করুক। বিনয়বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই স্থানে আনয়ন এবং ধনুর্ভঙ্গ পণে রামের সীতালাভ হইল, এ কথা নিবেদন করুন। রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ যে নির্ব্বিঘ্নে আসিল, ইহারা গিয়া এই সংবাদ দিবে।"—হিন্দুশাস্ত্র, রামায়ণ, পৃ. ৩১-৩।

সাহিত্য-সাধক-চবিতমালা—৯৬*

উইলিয়ম ইয়েট্‌স, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত

উইলিয়ম ইয়েট্‌স, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩৷১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ —ফাল্গুন ১৩৬৩

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—১২. ৩. ৫৭

উইলিয়ম ইয়েট্স

(১৭৯২-১৮৪৫)

ভূমিকা

ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের, বিশেষতঃ গদ্য-সাহিত্যের উন্নতির মূলে খ্রীষ্টান মিশনরীদের কৃতিত্ব অসমান্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম কেরীর নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। মিশনকে কেন্দ্র করিয়া কেরীর নেতৃত্বে আরও অনেকে এই কার্য্যে ব্রতী হন। কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী এবং 'সমাচার-দর্পণ' সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সাহিত্য-সাধনার কথাও অনেকে অল্পবিস্তর অবগত আছেন। উইলিয়ম কেরীর কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী অথচ এই সাহিত্যসেবীদের সমগোত্রীয় আর একজন বিশিষ্ট পাদ্রী বা মিশনরী ছিলেন ড. উইলিয়ম ইয়েট্স। শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস তথা কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের জীবনীকার ইয়েট্স সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

> "Mr. Yates was an eminent linguist, applied with such diligence to the cultivation of Oriental literature, under the able tuition of Dr. Carey, as to become eventually second only to his master as a translator." *

অর্থাৎ, ইয়েট্স ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ, এবং প্রাচ্য ভাষাসমূহে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদির অনুবাদক হিসাবে তদীয় শিক্ষক ড. কেরীর পরেই তাঁহার স্থান।

---

* *The Life and times of Carey, Marshman and Ward.* Vol. II, p. 88.

জন্ম : শৈশব : শিক্ষা

ইংলণ্ডের লো বরা নামক স্থানে ইয়েট্‌স ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার ঝোঁক দৃষ্ট হইত। জনৈক মহিলা বলিয়াছেন, ইয়েট্‌স তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন। ইয়েট্‌স ইংরেজী ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনবরত কথা বলিতে ভালবাসিতেন। তিনি ভাষার বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ সম্পর্কে এমন ভাবে আলাপ জুড়িয়া দিতেন যে, শ্রোতাদের স্বতঃই মনে হইত, ইয়েট্‌স ধরিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা ঐ সব আলোচনায় সমান উৎসাহী।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইয়েট্‌স স্থানীয় ব্যাপটিষ্ট মিশন চার্চে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রিষ্টল ব্যাপটিষ্ট মিশনরীদের এইটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। দীক্ষা গ্রহণানন্তর ইয়েট্‌স এখানে আসিয়া খ্রীষ্টশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা ব্যাপটিষ্ট চার্চের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে রত হইতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেন, বিশেষ করিয়া তাঁহাদিগকে এখানে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। বাইশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইয়েট্‌স ব্যাপটিষ্ট চার্চের ধর্ম্মপ্রচার-ব্রত আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ১৮১৪ সনের ৩১শে আগষ্ট। ব্যাপটিষ্ট চার্চের তিন জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—ইয়েট্‌সের অধ্যাপক ড. রাইল্যাণ্ড, রবার্ট হল এবং এণ্ড্রু ফুলারের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ইহার কিছুকাল পরেই মিশন-কর্ত্তৃপক্ষ ইয়েট্‌সকে ভারতীয় শাখার সাহায্যার্থ এদেশে পাঠাইলেন। ১৮১৫ সনের এপ্রিল মাসে 'ময়রা' জাহাজে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন।

শ্রীরামপুরে অবস্থিতি

শ্রীরামপুর তখন এ অঞ্চলে ব্যাপটিষ্ট মিশনের কেন্দ্রস্থল। ইয়েট্স অবিলম্বে শ্রীরামপুরে পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া নিজেকে ঈপ্সিত কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কেরীর নেতৃত্বে শিক্ষানবিশী সুরু করিয়া দেন। বিদ্যাচর্চ্চা, বিশেষ করিয়া প্রাচ্যবিদ্যায় অনুশীলন ছিল এ সময়ে তাঁহার প্রধান কার্য্য। ১৮১৬ সনের মার্চ মাসে ইয়েট্স স্বীয় দৈনন্দিন কার্য্য সম্বন্ধে বিলাতে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লেখেন:

> "The way I spend my time is this: In a morning before breakfast I study Hebrew about an hour and a half. After worship I attend to Bengali, and all the Bengali proofs with Dr. Carey, having before compared them with the Greek. I have got through the Sanskrit roots once, have not yet got through the grammar, but am reading the Ramayan with my Pandit. My afternoons are chiefly taken up with reading or hearing Latin or Greek. I have read ten volumes of Greek since I left England. but not more than three of Latin. In the evening, after worship I generally read English or look over English proofs."*

ইয়েট্স প্রাতরাশের পূর্ব্বে দেড় ঘণ্টাকাল হিব্রু পাঠ করিতেন, উপাসনান্তে বাংলা শিক্ষায় নিবিষ্ট হইতেন। মূল গ্রীকের সঙ্গে মিলাইয়া বাংলা প্রুফ দেখায় কেরীকে তিনি সাহায্য করিতেন। এই সময়ে সংস্কৃত ধাতুগুলি একবার পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যাকরণ পাঠ তখনও শেষ হয় নাই। ইয়েট্স পণ্ডিতের সাহায্যে ব্যাকরণ পাঠেও লিপ্ত ছিলেন। তিনি অপরাহ্নে পাঠ করিতেন গ্রীক ও লাটিন পুস্তক। ইংলণ্ড পরিত্যাগের পর ঐ অল্পকালের মধ্যেই তিনি দশ খণ্ড গ্রীক

---

* *The Calcutta Christian Observer*, September 1845. p. 582.

সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, কিন্তু লাটিন সাহিত্য পড়িতে সমর্থ হন মাত্র তিন খণ্ড। সান্ধ্য প্রার্থনার পর ইয়েট্স সাধারণতঃ ইংরেজী পাঠ করিতেন এবং ইরেজী প্রুফ দেখিতেন। উক্ত পত্রে তিনি আরও লেখেন যে, প্রাত্যহিক কার্য্য ব্যতিরেকে প্রার্থনাদি ব্যাপারও তাঁহাকে পালাক্রমে পরিচালনা করিতে হয়। সপ্তাহে একবার কি দুইবার দুই মাইল দবে গঙ্গাব ওপারে ব্যাবাকপুবে তিনি উপাসনা করিতে যাইতেন। গঙ্গা দিয়া নৌকাযোগে মাসে অন্ততঃ একবাব তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হয় এই উদ্দেশ্যে।

ইয়েট্স কিন্তু বেশী দিন শ্রীরামপুরে বহিলেন না। শ্রীরামপুর মিশন এবং বিলাতস্থ ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির মধ্যে নানা কারণে মতানৈক্য উপস্থিত হয় এই মতানৈক্য ১৮১৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিচ্ছেদে পরিণত হইল। উইলিয়ম ইয়েট্স প্রমুখ নব্য মিশনরীগণ শ্রীরামপুর ত্যাগ করিয়া ঐ বৎসবে কলিকাতায় আসেন এবং বিলাতস্থ ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে এখানে একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠন করেন। ইহার পর হইতেই কলিকাতা হইল ইয়েট্সের কর্ম্মক্ষেত্র।

কলিকাতা-বাস ঃ প্রথম যুগ

উইলিয়ম ইয়েট্সের কলিকাতা-বাস আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম ভাগ—১৮১৭ হইতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই সময়কার কথা প্রথমে বলা হইবে। কলিকাতায় আগমনের পর ইয়েট্স শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হন। কেননা ব্যাপটিষ্ট সোসাইটি হইতে তিনি যে মাসহারা পাইতেন তাহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারেরও ব্যয়সঙ্কুলান কঠিন হইত। শিক্ষকতা এবং মিশনের কার্য্য, দুইটি বিষয়েই তাঁহাকে একই সময়ে

মনঃসংযোগ করিতে হইল। এ সব সত্ত্বেও তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চা কিন্তু অব্যাহত ছিল। নিয়ত অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের ফলে ইয়েট্স ক্রমে বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, হিন্দী ও উর্দ্দু—এ ক'টি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ এবং ইহার আনুকূল্যে বিভিন্ন বিষয়ে তদ্‌রচিত পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ ইত্যাদি বিষয় পরে বলিব। এখানে তাঁহার সংস্কৃত-চর্চ্চা সম্বন্ধে একটু বলিতেছি।

সংস্কৃত ভাষা ইয়েট্সের ভাষাতত্ত্ব আলোচনার রসদ যোগায় সবচেয়ে বেশী। ইয়েট্স এই ভাষা এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুশীলন করেন যে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিতে সমর্থ হইলেন। সংস্কৃতে একখানি শব্দকোষ ('vocabulary') সঙ্কলন করেন এই সময়ে। হিতোপদেশ, নলোদয় প্রভৃতির অভিনব বিশুদ্ধ সংস্করণও তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে ইয়েট্সের পাণ্ডিত্যের কথা বিদগ্ধ সমাজে শীঘ্র প্রচারিত হইল। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Asiatic Researches"-এর বিংশতিতম খণ্ড—১ম ও ২য় ভাগে ইয়েট্স দুইটি প্রবন্ধ লেখেন—একটি সংস্কৃত অলঙ্কার বিষয়ক, অপরটি কাশ্মীরের শ্রীহর্ষ-রচিত নৈষধ-চরিতের আলোচনা।* শেষোক্ত প্রবন্ধটি ১৮৩৬ সনে সোসাইটি কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

নিজ মাতৃভাষা ইংরেজীতেও ইয়েট্স পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্পর্কে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত

* প্রবন্ধ দুইটির নাম :

1. "Essay on Sanskrit Alliteration."

2. "Review of Naisadha Charita, or Adventures of Nala Rajah of Nisadha, a Sanskrit poem."

হয়। তাঁহার এবিষয়ক রচনাগুলি "Essays in Reply to Rammohan Ray" নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। "Memoirs of Chamberlain" এবং "Memoirs of Pearce" ইয়েট্‌সের আর দুইখানি ইংরেজী গ্রন্থ। এ ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম্মমূলক পুস্তক এবং অন্যান্য বিষয় প্রবন্ধও তিনি লিখিয়াছিলেন। ১৮২৫ সনে ইয়েট্‌স লোয়ার সারকুলার রোড চার্চের কর্ম্মকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত হন। অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু ইয়েট্‌সের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকল্পে তিনি আমেরিকা হইয়া বিলাত গমন করেন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে।

কলিকাতা-বাস : দ্বিতীয় যুগ

কলিকাতায় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইয়েট্‌স পুনরায় বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ সপ্তদশ বৎসর কাল তাঁহার কলিকাতা-বাসের দ্বিতীয় যুগ। তিনি লোয়ার সারকুলার রোড চার্চের পাদ্রীর পদ পুনরায় গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদে তিনি এই সময় আত্মনিয়োগ করেন। কয়েক বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে সমগ্র বাইবেল গ্রন্থখানি তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে সমর্থ হন। ইয়েট্‌স নিউ টেষ্টামেণ্ট অনুবাদ করিলেন আরও তিনটি ভাষায়—উর্দ্দু, হিন্দী এবং সংস্কৃতে। শেষোক্ত ভাষায় ওল্‌ড টেষ্টামেণ্টেরও অর্দ্ধেকটা তৎকর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বানিয়ানের "Pilgrims' Progress" (প্রথম খণ্ড) এবং আর একখানি ধর্ম্মমূলক পুস্তকও* তিনি বাংলায়

* "Baxter's call to the Unconverted."

অনুবাদ করেন। ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ কার্য্যে ইয়েট্‌সের জীবিতকালে তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন পাদ্রী জে. ওয়েঙ্গার। ওয়েঙ্গারও প্রাচ্যবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পাদ্রী ওয়েঙ্গার ইয়েট্‌সের এবম্বিধ অনুবাদ-কার্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

> "The remarks which I have to offer on the subject of Dr. Yates's character as a Translator of the Scriptures refer exclusively to his Bengali version of the Bible...
>
> "Often have I admired the beautiful simplicity, transparent clearness, or the rich brevity of his renderings...
>
> "He also aimed at a style uniformly free and dignified. He allowed of no vulgar expressions, and excluded with equal firmness of determination all high-flown Sankrit terms...
>
> "If, however, a finely balanced mind, endowed with splendid talents and enriched by solid and extensive erudition, rooted in an ardent love of truth, and chastened by humility unfeigned ; if these qualities, accompanied by untiring industry, a tender conscience, fervent prayer, constitute a biblical translator, then such a translator was William Yates."*

ইয়েট্‌স কত উঁচুদরের অনুবাদক ছিলেন, ওয়েঙ্গার স্বল্প কথায় এখানে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইয়েট্‌স বিশুদ্ধ অথচ ভাবগম্ভীর রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। সহজ সরল ভাষায় তিনি সর্ব্বদা ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, আর ইহাতে তিনি বিশেষ সাফল্যও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মূল এবং অনুবাদের ভাষা—দুইটিতেই তাঁহার প্রগাঢ় এবং ব্যাপক জ্ঞান ছিল। এই সময় খ্রীষ্টান পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকায়ও (জুন ১৮৩২, হইতে প্রকাশিত) ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন। কলিকাতা-বাসের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির

---

* *The Calcutta Christian Observer*, Sept. 1845, pp. 594, 596-7.

পক্ষে তিনি পাঠ্য পুস্তকাদি লিখিতে যে বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা একটু পরেই বলিব।

এই সময়ে পাঠ্য পুস্তক বাদে বিরাট হিন্দুস্থানী-ইংরেজী ও সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান এবং পাঠ-সংগ্রহ সমেত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে একখানি বাংলা ব্যাকরণ সঙ্কলনে সবিশেষ তৎপর হইলেন। জীবিত-কালে ইহার কোন কোনটির মুদ্রণ অনেকটা অগ্রসর হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর দুই বৎসরের মধ্যেই এ সমুদয় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে উইলিয়ম ইয়েট্‌সের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। তিনি বহু বৎসর যাবৎ এই সোসাইটির ইউরোপীয় সেক্রেটারী বা সম্পাদক হিসাবে অতীব কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছলেন। এই সোসাইটি সম্বন্ধে এখানে দু'চার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এদেশে ইংরেজদের স্বাধীন ভাবে বসবাসে যে সকল বাধানিষেধ ছিল, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দের ফলে তাহা দূরীভূত হয়। কাজেই এই সময়েব পর হইতেই বহু ইংরেজ পাদ্রীও এদেশে আসিতে থাকেন এবং নানা স্থানে স্কুল-পাঠশালা স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। এসব স্থলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এ কার্য্য সাধনের পক্ষে প্রধান অন্তরায়—উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব। এই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দেশী-বিদেশী প্রধানেরা মিলিয়া কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি স্থাপন করেন। এ সময় হইতে বহু বৎসর যাবৎ সোসাইটি ইংরেজ ও বাঙালী তথা ভারতীয় যোগ্য লেখকের দ্বারা পাঠ্য পুস্তক লিখাইয়া

লইয়া সে সমুদয় প্রকাশ ও প্রচার করিতে তৎপর হন। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, বাংলা, হিন্দী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজী নানা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচিত হইত। পাদ্রী ইয়েট্‌স বহুভাষাবিদ্ এবং এদেশীয়দের মধ্যে নব্যশিক্ষা বিস্তারে স্বতঃই আগ্রহান্বিত; এ কারণ এই সোসাইটির কার্য্যে সহযোগিতা করিতে তিনি অগ্রসর হইলেন। ১৮২৪-৫ সনে ইয়েট্‌স স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী বা সম্পাদক পদে বৃত হন।

উইলিয়ম ইয়েট্‌স এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যাবৎ একান্ত ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক রচনা, সঙ্কলন ও সম্পাদনে তিনি প্রথমাবধি তৎপর হন। সোসাইটির আনুকূল্যে তিনি এগুলি ক্রমশঃ বাহির করিতে থাকেন। মিশনরী জীবনের প্রাত্যহিক করণীয় চার্চের কার্য্য এবং সোসাইটির বিবিধ প্রয়াস—প্রতিটির নিমিত্ত তিনি এতই পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং ১৮২৬ সনে বিলাতযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সোসাইটির সপ্তম রিপোর্টে (১৮২৬-৭) ইয়েট্‌স সম্পর্কে উহার অস্থায়ী সম্পাদক এইরূপ উল্লেখ করেন:

> **"Your Committee beg to express their high sense of the varied services of their Secretary Mr. Yates, in this department; and their regret that protracted indisposition, in consequence of a sedentary life, and close attention to study, should have rendered his visiting Europe necessary to the recruiting of his constitution. They are happy, however, to report, that during his voyage to and from Europe, he will be engaged in preparing works in prosecution of the Society's plans; and that thus on his return, which they expect will be at the end of the present year, they may anticipate great advantages from his labours." (p. 12).**

ইয়েট্‌সের অনুপস্থিতি কালে সোসাইটির অস্থায়ী সম্পাদক হইলেন কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব ইউরোপীয় সম্পাদক ডবলিউ.

এইচ. পীয়ার্স। ইয়েট্‌সের কৃতির কথা রিপোর্টে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা হইয়াছে, এবং তাঁহারা ইয়েট্‌সের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার নিকট হইতে যে সব কার্য্য আশা করিয়াছিলেন তাহাও অনেকাংশে পূর্ণ হয়। ইয়েট্‌স ১৮২৮ সনের প্রথমে, মনে হয়, কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৮২৮-৯ সনের (অষ্টম) রিপোর্টে দেখা যায়, তিনি এদেশে আসিয়া পুনরায় সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা দুইখানি পুস্তক—'জ্যোতির্বিদ্যা' এবং 'সত্য ইতিহাস সার' সঙ্কলিত ও অনূদিত হইয়া মুদ্রণেরও ব্যবস্থা হইতেছিল। সেক্রেটারী রূপে তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত। একারণ ১৮৩০-১ সন হইতে সোসাইটির কার্য্য পরিচালনার জন্য একাধিক সেক্রেটারী নিযুক্ত হইতে থাকেন। এই বৎসরে ইয়েট্‌স ছিলেন "Recording Secretary" : ১৮৩২-৩ সন হইতে ১৮৪৪ সনে পদত্যাগ পর্য্যন্ত তাঁহার পদের নাম ছিল—'Editorial and Minute Secretary'। সোসাইটির দ্বাদশ রিপোর্টে (১৮৩৬-৯) উল্লিখিত হয় যে, ১৮৩৭ সনেই ইয়েট্‌স অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া উক্ত পদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু সোসাইটির কর্তৃপক্ষের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, যোগ্য লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত, তিনি এই পদে কার্য্য করিতে সম্মত হন। আরও প্রায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, অবশেষে ১৮৪৪ সন নাগাদ ইয়েট্‌স পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সোসাইটির অধ্যক্ষ সভা তাঁহার মৃত্যুতে (৩রা জুলাই ১৮৪৫) গভীর শোক প্রকাশ করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা এখানেই উল্লেখ করি :

"That the Committee having received the mournful intelligence of the death of the Rev. W. Yates, D. D., for many years Editorial Secretary to the Society, desire to express their sorrow

for the great loss, and to record their sense of his eminent talents, his solid and extensive learning, his unwaried diligence. and of the important services he has rendered both to the Society and to the cause of Education, throughout India."—*The Thirteenth Report* (1840-44), p. 28.

শিক্ষা-সমাজ : পাঠ্য পুস্তক রচনা

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ এ অভাব মিটাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু নব্যশিক্ষা এবং নূতন পরিবেশে পাঠ্য পুস্তক রচনার ধরন পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িল। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ত বাংলা পাঠশালা স্থাপন করিলেন ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার আদর্শে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী-সভার অধীন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাও এই সনের মাঝামাঝি স্থাপিত হইল। উভয় প্রতিষ্ঠানের নিমিত্ত নূতন ধরনের পাঠ্য পুস্তক রচনার আয়োজনও হইল। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ—নানা বিষয়ে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তক রচিত হইতে লাগিল।

গবর্ণমেণ্ট তথা শিক্ষা-সমাজ ("Council of Education") দেখিলেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পৃথক পৃথক পাঠ্য পুস্তক রচনায় শিক্ষার উদ্দেশ্য-সাম্য রক্ষিত হইতেছে না। বিশেষতঃ হিন্দু কলেজ বাংলা পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্ত তাঁহাদিগকেই অর্থ যোগাইতে হয়, অথচ পাঠ্য পুস্তক রচনায় তাঁহাদের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। সরকার

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসর যাবৎই বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক রচনার বিষয় ভাবিতেছিলেন। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি এত দিন এ প্রয়োজন মিটাইলেও, নূতন পরিবেশে নূতন ধরনের পাঠ্য পুস্তকের অভাব তাঁহারাও অনুভব করেন। বাংলা পাঠশালার জন্য রচিত এবং হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ-সভার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পুস্তকসমূহ সম্বন্ধে শিক্ষা-সমাজ বিশেষজ্ঞ হিসাবে উইলিয়ম ইয়েট্‌সের অভিমত চাহিয়া পাইলেন। তিনি অন্ততঃ 'শিশু সেবধি' সম্পর্কে বিরূপ মত দেন।* এই সব কারণে শিক্ষা-সমাজ "Section of the Council of Education for the preparation of Vernacular Books" নামে একটি সাব-কমিটি গঠন করিলেন। এই সাব-কমিটি বা 'সেকশ্যন'কে পরবর্ত্তী কালের সরকারী টেক্‌ষ্ট-বুক কমিটির পূর্ব্বজ বলা যাইতে পারে। কি পদ্ধতিতে পাঠ্য পুস্তক রচনা করা যাইবে, সে উদ্দেশ্যে শিক্ষা-সমাজের পক্ষে উক্ত সেকশ্যন এবারেও কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে ইয়েট্‌সের মতামত চাহিলেন। ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৪২ তারিখে ইয়েট্‌স এইরূপ মত দিলেন :

> "I would submit that it is absolutely necessary to the object in view, that the Council of Education should first fix the series of their Class Books in English. As these are prepared they might hand them over to the Section for Vernacular Class Books to be translated into such languages as might be thought desirable and with such alteration only as the idiom of the language and the usage of the people might require. In this case the object of the Section would be definite and tangible, and I doubt not they would make a steady progress towards its accomplishment, but

---

* *General Report of the late General Committee of Public Instruction*, for 1840-41 and 1841-42, App. No. VI. pp. xxxvi, xl.

without this my opinion is, that all the consultations and efforts of the Section will be desultory and unsatisfactory; and the grand desideratum of a regular set of Class Books in the Vernacular languages will never be obtained. In preparing the Series in English the Council might avail themselves of the aid of men of the first talents in England as well as in this country—and that series being prepared, will serve for all the Presidencies and with some trifling varieties for all the languages of India." *

বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক রচনা ব্যাপারে ইয়েট্স দুইটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করিলেন। প্রথমতঃ পাঠ্য পুস্তকগুলি বিলাতের এবং এখানকার সুযোগ্য গ্রন্থকারদের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে ইংরেজী ভাষায় লিখাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই ইংরেজী পুস্তকগুলিই বাংলা এবং অন্যান্য দেশভাষায়, ভাষার স্বকীয় প্রয়োগরীতি এবং স্থানীয় আচার-আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দরকার মত কিছু কিছু বাদ-সাধ দিয়া উপযুক্ত লেখকদের দ্বারা অনুবাদ করাইতে হইবে। আর এই উপায়েই শিক্ষা-সমাজ বিভিন্ন ভাষার ও বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। অন্য যে-কোন উপায়ই অবলম্বন করা যাউক না কেন, তাহা হইবে খাপছাড়া ও অসন্তোষজনক। শিক্ষা-সমাজ ইয়েট্সের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া' নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিলাম :

"Ordered. That on the arrival of the expected supply of Chambers' Educational Course, Books be selected from that course for translation and adaptation, and that the Section concurring generally in Dr. Yate's opinion will bear in mind his remarks whenever favourable opportunities occur."

ইয়েট্সের অভিমত পুরাপুরি গ্রহণ করিয়া "সেকশন" শিক্ষা-

* *Report of the General Committee of Public Instruction for 1842-43, p. 26.*

সমাজের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিলাত হইতে 'চেম্বার্স এডুকেশনাল কোর্স'-এর অন্তর্গত পুস্তকাবলী এদেশে আসিয়া পৌঁছিলে উক্তরূপ অনুবাদের ব্যবস্থা করা যাইবে। কিন্তু এই ধরনের প্রথম পুস্তকের জন্য, দেখা যাইতেছে, তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া ডাঃ গ্রাণ্টের উপর ইংরেজীতে একখানি পুস্তক রচনার ভার দিলেন। পাণ্ডুলিপি তৈরী হইলে ইহা হইতে ইয়েট্স বাংলায় অনুবাদ করিলেন; ইহার নাম দেওয়া হইল 'সারসংগ্রহ'। এখানির পরিচয় আমরা পরে পাইব। তবে সরকার-প্রবর্ত্তিত এই পাঠ্য পুস্তক রচনা-পদ্ধতি যে তেমন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির ত্রয়োদশ রিপোর্টে (১৮৪০-৪) সে বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

সাহিত্য-সাধনা

শ্রীরামপুরে অবস্থান কালে ইয়েট্সের সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছি। ১৮১৫-৪৫, মৃত্যুর পূর্ব্বে এদেশ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়ের আভাসও আমরা আগেই পাইয়াছি। ড. কেরী ও ড. মার্শম্যানকে বাদ দিলে, তিনি যে এ বিষয়ে মিশনরীদের মধ্যে অনন্যতুল্য ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাঁহার এই সাহিত্য-সাধনার ফল তিনটি দিকে প্রকটিত হয়: ১ বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা, ২ অভিধান ও ব্যাকরণ সঙ্কলন, এবং ৩ ধর্ম্মগ্রন্থাদির অনুবাদ। ইহা ছাড়া তাঁহার কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তকও আছে। তিনি ইংরেজী সাময়িকপত্রে ভাষাতত্ত্বমূলক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'এশিয়াটিক রিসার্চ্চেস্'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের

কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকায় এই দুইটি ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়: ১ "Theory of the Hindusthani Particle ne´; এবং ২ Theory of the Hebrew verb"।

সংস্কৃত সাহিত্যে ইয়েট্‌স সাতিশয় ব্যুৎপন্ন হন। তৎসঙ্কলিত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ডাঃ উইলসনের বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের উপরও বহু নূতন শব্দ যোজনা করিতে ইয়েট্‌স সক্ষম হন। অভিধানের ভূমিকায় ইয়েট্‌স এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, ডাঃ উইলসনের অভিধানখানির মূল্য পঞ্চাশ টাকা, এ কারণ ছাত্রদের পক্ষে ইহার ব্যবহার প্রায় অসম্ভব। তিনি স্বল্পমূল্যে এই অভিধান সংকলনে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৪৬ সনে ইহা প্রকাশিত হয়। অভিধানখানির নাম —"A Dictionary in Sanscrit and English, designed for the use of Private Students and of Indian Colleges and Schools"। তৎকর্ত্তৃক হিতোপদেশের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ 'নলোদয়' সম্পাদন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ সঙ্কলনের কথা আগে বলা হইয়াছে। বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের নামে তিনি ব্যাকরণখানি উৎসর্গ করেন। তাহার সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তকসমূহের এইরূপ উল্লেখ পাই: "A Grammer; A Vocabulary; A Reader; Elements of Natural Philosophy"।*

হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু, হিন্দী এবং আরবী ভাষায়ও তাঁহার বিস্তর পুস্তক

---

* *The Calcutta Christian Advocate*, 9th August 1845। ১৮৪৫, সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার'-এ উদ্ধৃত। পরবর্তী হাশিয়াও ইহা হইতে লওয়া হইয়াছে।

রহিয়াছে। সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের মত হিন্দুস্থানী-ইংরেজী অভিধানখানিও বেশ বড়। এখানি যে হিন্দুস্থানী ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের দ্যোতক সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। তদ্‌রচিত হিন্দুস্থানী অন্যান্য পুস্তকের এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়: "An Introdnction to the Hindusthani Language; Selections; Spelling Book I & II; Reader I, II and III, Pleasing Tales, Students' Assistant"। তাঁহার হিন্দী বই: 'Reeder I, II and III; Elements of History" আরবী বই মাত্র একখানি: "A Reader"। ইহা ব্যতীত ইয়েট্স হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় 'নিউ টেষ্টামেণ্ট' অনুবাদ করিয়াছিলেন।

উইলিয়ম ইয়েট্স বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা বিশেষভাবে করিয়াছিলেন। কতকগুলি বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাকে 'পাইওনিয়ার' বা অগ্রদূতের সম্মান দেওয়া যায়। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সংস্পর্শে আসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বহু পুস্তক তিনি বাংলায় অনুবাদ, সঙ্কলন ও সম্পাদন করেন। তিনি এই সকল পুস্তক রচনা, সঙ্কলন ও প্রকাশ সম্পর্কে একান্তভাবে যুক্ত থাকায়, সমসময়ে এবং পরবর্ত্তীকালে কোন কোন রচনার কৃতিত্ব তাঁহাতেই আরোপিত হইয়াছে। এ কারণে তাঁহার রচিত পুস্তকসমূহ সম্পর্কে পুরাপুরি স্থিরনিশ্চয় হওয়া সম্ভব নয়, যখন সবগুলি এখনও আমরা দেখিতে পাই নাই। তথাপি যে ক'খানি বাংলা পুস্তক দেখিয়াছি, এবং যে সকল পুস্তক সম্বন্ধে কতকটা স্থিরনিশ্চয় হওয়া গিয়াছে, এখানে কিছু কিছু মন্তব্য সমেত সেগুলির উল্লেখ করা হইল:

১। **পদার্থবিদ্যাসার।** অর্থাৎ বালকদিগের পদার্থ শিক্ষার্থে কথোপকথন। ১৮২৫।

এ বইখানির ইংরেজী নাম—"Elements of Natural Philosophy and Natural History in a series of Familiar Dialogues।" কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্টে (৭ম বর্ষ ১৮২৪-২৫, পৃ. ৮) আছে: "One thousand in Bengali and five hundred in Bengali and English have just issued from the press"। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, পুস্তকখানির দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়—একটি শুধু বাংলায় এবং দ্বিতীয়টি বাংলা ও ইংরেজীতে। পুস্তকখানির 'নর্ঘণ্ট' এই:

"১: কথোপকথন, আভাস, ২। কথোপকথন, আকাশীয় গ্রহাদি বিষয়, ৩। স্থিরবায়ু, ও সামান্য বায়ু, ও বাষ্প, বৃষ্টি প্রভৃতি বিশেষ কথন, ৪। কথোপকথন, জলময় ও ভূমিময় পৃথিবীর বিষয়, ৫। কথোপকথন, মনুষ্যের বিষয়, ৬। কথোপকথন, জন্তুর বিষয়, ৭। কথোপকথন, পক্ষির বিষয়, ৮। কথোপকথন, মৎস্য বিষয়, ৯। কথোপকথন, পতঙ্গ বিষয়, ১০। কথোপকথন, কৃমি বিষয়, ১১। কথোপকথন, বৃক্ষ ও পুষ্পাদি, ১২। কথোপকথন, তৃণশস্যাদি বিষয়, ১৩। কথোপকথন, আকরজাত বস্তু বিষয়, ১৪। কথোপকথন, নানা দেশীয় উৎপন্ন বস্তু বিষয়।

২। **জ্যোতির্বিদ্যা।** ১৮৩০।

ইহার ১৮৩৩-এর সংস্করণ দেখিয়াছি। পুস্তকখানি জেমস ফার্গুসন, এফ-আর-এস, রচিত এবং ডেভিড ব্রুষ্টার কর্তৃক সংশোধিত "An Easy Introduction to Astronomy" নামক ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির অষ্টম রিপোর্টে (একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষ, পৃ. ৬) এই মর্মে লিখিত হয় যে, ইয়েট্স পুস্তকখানির

অনুবাদকার্য্যে দুই জন পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং রাধাকান্ত দেব পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দেন। পুস্তকখানির 'ভূমিকা' এই :

"ফর্গসন সাহেবের লিখিত এই পুস্তক সম্প্রতি শ্রীযুক্ত য়াতি সাহেব কর্ত্তৃক বঙ্গভাষাতে রচিত হইল, ইহা পাঠ করিলে যুবকেরা জ্যোতির্ব্বিদ্যা জ্ঞাত হইতে পারিবে।

এই পুস্তকে ক্রোশ শব্দে ইংরেজী মাইল অর্থাৎ ৩৫২০ হাতে প্রায় শাস্ত্রীয় এক ক্রোশ হয়।

এবং ক্রম শব্দে ঐ পরিমিত ষাটি ক্রোশ বুঝায়।

এবং বিপল শব্দে ঘড়ীর নিমেষ অর্থাৎ ইংরেজী মোমেণ্ট।

এবং পল শব্দে ষাটি বিপল এবং স্থান পরিমাণ বিষয়ে এক ক্রোশ বুঝায়।

এবং ঘড়ী ও ঘণ্টা ও ঘটিকা শব্দে ষাটি পল কিম্বা আড়াই দণ্ড বুঝায়।"

ইহাতে দশটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহা এইরূপ :

"১। পৃথিবীর গতি ও আকার ও পরিমাণের বিবরণ, ২। সকল বস্তুর জন্য তোলন নিক্তি ও সূর্য্যাদি গ্রহ বিবরণ, ৩। গুরুত্ব ও দীপ্তির বিষয়, ৪। ইংরেজী ১৭৬১ সনে সূর্য্যের উপরে শুক্র গ্রহের অতিক্রম এবং ঐ অতিক্রম দ্বারা প্রথমে যে রূপে সূর্য্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব নিশ্চয় হয় তাহার বিবরণ, ৫। পৃথিবীর দীর্ঘতা ও প্রশস্ততা নির্ণয়ার্থক বিষয় কথন, ৬। দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধির কারণ ও ঋতুগণের পরিবর্ত্তন ও চন্দ্রের ষোড়শ কলার বিবরণ, ৭। পৃথিবী প্রদক্ষিণকারি চন্দ্রের গতি ও চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণের বিবরণ, ৮। সমুদ্রের জোয়ার ভাটার বিষয়, ৯। ধ্রুবতারার বিষয় ও সূর্য্য ও তারাগণের সময়বিশেষ নিরূপণ, ১০। গ্রহণাদি নিরূপণ।"

৩। **সত্য ইতিহাস সার।** ১৮৩০।

এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের নাম নাই। ইংরেজী "Celebrated Characters in Ancient History" পুস্তক হইতে অনূদিত। 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান এডভোকেট' ৯ মে ১৮৪৫ সংখ্যায় ইয়েটসের যে গ্রন্থ-তালিকা দিয়াছেন তাহাতে এই পুস্তকখানির উল্লেখ আছে। গ্রন্থের সূচীপত্র দৃষ্টে ইহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যাইবে। এ কারণ ইহা এখানে দিলাম :

"১। নিম্রোদ ও নিনঃ ও সিমিরামীর বিবরণ, ২। মিনি মিম্নোন ও সিসেস্ত্রির বিবরণ, ৩। হেলিনা ও পারি ও হোমারের বিবরণ, ৪। লুকগের বিবরণ, ৫। দিদো ও ইলিয়ার বিবরণ, ৬। গ্রীক্‌লোকদের সময় ও ক্রীড়ার বিবরণ, ৭। রোমি লোকদের প্রথম বিবরণ, ৮। সাবিন্ লোকদের বিবরণ, ৯। থিস্থর বিবরণ, ১০। হোরাতীয়দের ও কুরিয়াতীয়দের যুদ্ধ বিবরণ, ১১। দ্রাকো ও সলোন প্রভৃতির বিবরণ, ১২। কুরশ রাজার বিবরণ, ১৩। চীন.দশীয় ফোহির বিবরণ, ১৪। রোম-দেশীয় রাজগণের বিবরণ, ১৫। মিল্‌তিয়াদি সেনাপতির বিবরণ, ১৬। ক্রুত প্রভৃতির বিবরণ, ১৭। সের্ক্‌সি প্রভৃতির বিবরণ, ১৮। থিমিস্তক্লি প্রভৃতির বিবরণ, ১৯। কীমোন প্রভৃতির বিবরণ, ২০। সিন্ সিন্নাত প্রভৃতির বিবরণ, ২১। দশ জন প্রধান কর্ত্তার বিবরণ, ২২। পেরিক্লি প্রভৃতির বিবরণ, ২৩। আল্‌কিবিয়াদি ও সোক্রাতি প্রভৃতির বিবরণ, ২৪। গ্রীকসৈন্যদের মধ্যে দশ সহস্র সেনার যুদ্ধযাত্রার বিবরণ, ২৬। গলদেশীয় সসৈন্য ব্রেন্ন সেনাপতি কর্ত্তৃক রোম নগরের লুটের' বিবরণ, ২৬। পিলপিদা ও ইপামিনন্দার বিবরণ, ২৭। তিত মান্‌লিয় তর্ব্বগত নামে এক প্রধান কর্ত্তার বিবরণ, ২৮। মাকিদোনের রাজা ফিলিপ্ প্রভৃতির বিবরণ, ২৯। পলাতো, দিওনিশিও, ও তিমলিওনের

বিবরণ, ৩০। দিসিয়ের বিবরণ, ৩১। সিকন্দর নৃপতির বিবরণ, ৩২। সাম্নীয় লোককর্তৃক রোমীয়দিগের পরাজয় বিবরণ, ৩৩। সিকন্দরের পর রাজগণের বিবরণ, ৩৪। পির্হের বিবরণ, ৩৫। রেগুল সেনাপতি ও প্রথম পূনিক্ যুদ্ধের বিবরণ, ৩৬। হান্নিবাল সেনাপতি ও দ্বিতীয় পূনিক্ যুদ্ধের বিবরণ, ৩৭। আখিমীদি ও ফিলপীমন্ ও পর্স্‌র বিবরণ, ৩৮। তৃতীয় পূনিক্ যুদ্ধের বিবরণ, ৩৯। গ্রাখীয় ও জুগথা ও মারিয় ও সিল্লার বিবরণ, ৪০। সিল্লা সেনাপতির বিবরণ, ৪১। পম্পি ও ক্রাসস্ ও কৈসর ও কাটিলিনের বিবরণ, ৪২। কৈসর ও ইংরাজ লোকদের পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ, ৪৩। ফার্সালিয়া নগরে কৈসর ও পম্পি সেনাপতির যুদ্ধবিবরণ, ৪৪। ক্রুত ও কাটোর বিবরণ, ৪৫। যুলীয় কৈসরের শেষ বিবরণ, ৪৬। অক্তাবিয় ও আন্তোনি ও লেপিদ প্রভৃতির বিবরণ, ৪৭। ফিলিপী নগরের যুদ্ধ ও ক্রুতের মৃত্যুর বিবরণ, ৪৮। আন্তোনির ও ক্লিওপাত্রার বিবরণ, ৪৯। তিবিরিয় ও কালিগুলার বিবরণ, ৫০। ক্লৌদিয় নামক রোমের মহারাজা এবং কারাক্তাক নামক ইংলণ্ডীয় রাজার বিবরণ, ৫১। নিরো ও সেনিকাঃ ও বোয়াদিসীয়ার বিবরণ, ৫২। বেস্পাসিয়ান ও পিলনি প্রভৃতির বিবরণ, ৫৩। তীত ও আগ্রিকলা ও দমিতিয়ানের বিবরণ, ৫৪। নর্ব্বা ও ত্রাজান ও পলুতার্খ ও আদ্রিয়ানের বিবরণ, ৫৫। আন্তনীন প্রভৃতির বিবরণ, ৫৬। সরাসীন্ ও গোথ্ ও সেল্ট ও হুন লোকের বিবরণ, ৫৭। সেনেবিয়া রাণী ও ক্লিফাল রাজা ও ফ্রাঙ্কীয় লোকদের বিবরণ, ৫৮। দিওক্লিতিয়ান্ ও কনস্তান্তীয় প্রভৃতির বিবরণ, ৫৯। মহাকনস্তান্তীনের বিবরণ, ৬০। কনস্তান্তীয় ও যুলিয়ানের বিবরণ, ৬১। যোবিয়ান্ ও বালেন্তিনিয়ান ও থিওদোষিয়ের বিবরণ, ৬২। হনোরিয় ও আলারিক ও পুল্‌খিরিয়ার বিবরণ, ৬৩। ফর্গস ও ফারামন্দ এবং রোমীয় সৈন্য কর্তৃক ব্রিটেন দেশ

পরিত্যক্ত হওনের বিবরণ, ৬৪। আত্তিলা রাজার ও ফ্রাঙ্কীয়দের বিবরণ, ৬৫। হেঙ্গিস্ত ও হর্সা ও আর্থুরের বিবরণ, ৬৬। রোমীয় পশ্চিম রাজ্য বিনাশের বিবরণ, ৬৭। থিও ডোরিয়া ক্লোবির বিবরণ, ৬৮। যুস্তিনিয়ান ও বিলিসারিয়ের বিববণ, এবং ৬৯। শার্লমা অর্থাৎ মহাশার্লি রাজাব বিবরণ।"

৪। **প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়।** ১৮৩০।

ইংরেজী নাম "An Epitome of Ancient History, containing a Concise Account of the Egyptians, Assyrians, Persians, Grecians, and Romans"। পুস্তকখানির ইংরেজী অংশ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে উইলিয়ম ইয়েট্স সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম কুড়ি পৃষ্ঠা হিন্দু কলেজেব ছাত্রগণ কর্তৃক অনূদিত। অবশিষ্টাংশ চুঁচুড়ার মিঃ গিয়ার্সন অনুবাদ করেন, ইহাতে বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী এবং ডান পৃষ্ঠায় বাংলা দেওয়া হইয়াছে। এখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা মোট ৬২৩।

৫। **সারসংগ্রহ**ঃ, ১৮৪৪

এখানির ইংরেজী নাম—"Vernacular Class Book Reader for the Government Colleges and Schools"। ডাঃ গ্রাণ্ট কৃত ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। পুস্তকের সূচীপত্র এই :

"১। দেশ ভ্রমণের ফল, ২। বিবেচনার কথা, ৩। দেশ বিদেশীয় লোকদের কথা, ৪। সভ্য ব্যবহারের কথা, ৫। ধর্ম্মবিষয়ক কথা, ৬। সভ্যতা ও বাণিজ্যের কথা, ৭। বিদ্যা বৃদ্ধির কথা, ৮। বিবেচনা করণের কথা, ৯। পৃথিবী ও গ্রহণের কথা, ১০। বিবিধ প্রাণির কথা, ১১। ইংলণ্ড দেশের কথা, ১২। ইংলণ্ডীয় লোকদের স্বাধীনতার কথা,

১৩। সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহের কথা, ১৪। অদৃশ্য জগতের কথা, ১৫। আনন্দের কথা, ১৬। পরিণামদর্শি ও অপরিণামদর্শির কথা, ১৭। ক্ষুদ্রলোকদের মহত্তের ন্যায় আচরণের অনুপযুক্ততা, ১৮। কথোপকথনের রীতি, ১৯। নৈপুণ্যাদির কথা, ২০। আলস্যের কথা, ২১। ঈশ্বরের কর্ম্ম, ২২। ইংলণ্ডীয় রাজ্যের কথা, ২৩। দীপ্তির বিবরণ, ২৪। পরাবৃত্ত কিরণের কথা, ২৫। বক্রগামি কিরণের কথা, ২৬। বর্ণের বিবরণ, ২৭। তাপের কথা, ২৮। জলীয় বাষ্পের কথা, ২৯। আকাশবায়ুর কথা, ৩০। বায়ু-ভারমাপক যন্ত্রের কথা, ৩১। সমুদ্রের কথা, ৩২। পর্ব্বতের কথা, ৩৩। পক্ষির কথা, ৩৪। পশ্বাদির কথা, ৩৫। কিমিয়া বিদ্যার কথা, ৩৬। আল্‌কালীর কথা, ৩৭। মৃত্তিকার কথা, ৩৮। আসিদের কথা, ৩৯। মিশ্রিত বস্তুর কথা, ৪০। জাহাজীয় লোকদের কম্পাস অর্থাৎ দিগ্‌ নিরূপণ যন্ত্রের কথা, ৪১। ছাপা ফর্ম্মারম্ভের কথা, ৪২। সূক্ষ্মদর্শন যন্ত্রের কথা, ৪৩। বাতাসের কথা, ৪৪। রক্তচলনের কথা, ৪৫। গুরুতার কথা, ৪৬। গুরুত্বের মধ্যতার কথা, ৪৭। মনেব ধৈর্য্যের কথা, ৪৮। নূতন২ দর্শনেচ্ছার কথা, ৪৯। বিদ্রূপের কথা, ৫০। স্বামিত্বের কথা, ৫১। আথিনী নগরের কথা, ৫২। সের খানের কথা, ৫৩। সেরাজউদ্দৌলার কথা, ৫৪। কলিকাতার হস্তগত হওনের কথা, ৫৫। ক্লাইব মহাশয়ের কথা, ৫৬। পলাশির যুদ্ধের কথা, ৫৭। সেরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর কথা, ৫৮। কলিকাতা নগরের কথা, ৫৯। ঢাকা জালালপুরের কথা, ৬০। মুর্শিদাবাদের কথা, ৬১। বেহারের কথা, ৬২। গয়া নগরের কথা, ৬৩। বারাণসী প্রদেশের কথা, ৬৪। কাশী নগরের কথা, ৬৫। লক্ষ্নৌ নগরের কথা, ৬৬। আগরা প্রদেশের কথা, ৬৭। আগরা নগরের কথা, ৬৮। দিল্লি প্রদেশের কথা, ৬৯। দিল্লি নগরের কথা, ৭০। লাহোরের কথা, ৭১। যাবা উপদ্বীপের

কথা, ৭২। ইংরাজী যথার্থ কথা, এবং ৭৩। জ্ঞানপ্রাপ্তি ও রক্ষা করণের যে উত্তম উপায় তাহার কথা।"

৬। পরবর্ত্তী পুস্তক দুই খণ্ডে সমাপ্ত, এবং নাম পুরাপুরি ইংরেজীতে। ইহার আখ্যাপত্র এই—

> "*Introduction to the Bengali Language.* / By the Late W. Yates, D.D./ in two volumes./ Edited by J. Wenger. / Containing a Grammer, a Reader, and Explanatory Notes. / with an Index and Vocabulary, /... Calcutta / 1847. /....../ ;—Vol. II, 1847."

ব্যাকরণখানি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে রচিত, পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইয়েট্‌স ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কালে, ১৮৪৫ সনের জুন মাসে ইহা তাঁহার সহকর্ম্মী পাদ্রী জে. ওয়েঙ্গারের নিকট রাখিয়া যান। প্রথম খণ্ডের ব্যাকরণ বাদে অন্য অংশ ভারতবর্ষে ফিরিয়া ইহা সম্পূর্ণ করিবেন ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না। পাদ্রী জে. ওয়েঙ্গার এই মূল্যবান পুস্তক সম্পাদনা ও প্রকাশের ভার লইলেন। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দুইটি ভূমিকা : "Author's Preface" এবং "Editor's Preface"। দ্বিতীয় খণ্ডে একটি "Prefatory Note" সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহারও সম্পাদক জে. ওয়েঙ্গার। পুস্তকের কতটা ইয়েট্‌স রচনা ও সঙ্কলন করিয়া গিয়াছিলেন, এবং কতটাই বা ওয়েঙ্গারের কৃত, "Editor's Preface"-এর নিম্নাংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে :

> "He [the Editor] found that the Grammar, the Preface, and the table or contents to the second volume were prepared and he also discovered some materials intended for the Reader, with a few hints respecting their arrangement. It may therefore be said that the author wrote the Grammar, and furnished the plan for the whole whilst the Editor must be responsible for nearly all the rest."

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল অংশ ইয়েট্স কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এই অংশে শুধু দেশীয় লেখকদের রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশ ইয়েট্স যেরূপ ঠিক করিয়াছিলেন, সম্পাদক ওয়েঙ্গার তাহা অন্যরূপ করিয়াছেন। ইয়েট্স বাংলা প্রবাদ ও নীতিবচন সঙ্কলন করিয়া পরিশিষ্টে দিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহা সঙ্কলন করিয়া যান নাই। সম্পাদক ইহার পরিবর্ত্তে দেশীয় কবিদের কবিতা এবং সাময়িক সাহিত্যের অংশবিশেষ নমুনাস্বরূপ ইহাতে সংযোজিত করিয়াছেন।

ধর্ম্মগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ: ইয়েট্স সমগ্র বাইবেল গ্রন্থ অনুবাদে উদ্যোগী হন। তাঁহার এই অনুবাদকার্য্যে কলিকাতার অন্যান্য ব্যাপটিষ্ট মিশনরীগণ সাহায্য করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কেননা পরবর্ত্তী ১৮৫২ সনের সংস্করণে "Translated by Calcutta Baptist Missionaries" এইরূপ উল্লেখ আছে। তবে ইয়েট্স যে মূলতঃ ইহার অনুবাদক সে বিষয়েও সংশয় নাই। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউ টেষ্টামেণ্ট **ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ** এই নামে বাংলায় কিন্তু রোমান অক্ষরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন। তৎকৃত 'ওল্ড টেষ্টামেণ্টে'র অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। এক বৎসর পরে, ১৮৪৫ সনে এই দুইখানি পুস্তক বাংলা অক্ষরে বাহির হয়। ১৮৫২ সনে প্রকাশিত সংস্করণে পুস্তকের আখ্যাপত্রে নাম দেখিতেছি - **ধর্ম্মপুস্তক অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মনিয়ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ**"।

মৃত্যু

ইয়েট্‌স ত্রিশ বৎসর কাল (মধ্যে প্রায় দুই বৎসর বাদে) এদেশে কাটান। ধর্ম্মপ্রচার এবং জ্ঞান-অনুশীলন দুই-ই সমানে চলিয়াছিল। তিনি ১৮৪৫ সনের জুন মাসে স্বাস্থ্যলাভার্থ স্বদেশে রওনা হইলেন। কিন্তু জাহাজেই তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। এডেন বন্দর অতিক্রম করিয়া জাহাজ লোহিত সাগরে পরিলে ১৮৪৫, ৩রা জুলাই তারিখে ইয়েট্‌স মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতল সমুদ্রে তাঁহার শব নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপে একটি কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটিল। ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য এবং ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে উইলিয়ম ইয়েট্‌সের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

রচনার নিদর্শন

"শিষ্য। ভাল মহাশয়, মনুষ্যদের যে কর্ম্ম অসাধ্য তাহা কি মধুমক্ষিকারা করিতে পারে? তাহারা কি প্রকারে মধু উৎপন্ন করে?

গুরু। তাহারা নানাস্থানে ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া ক্ষেত্র ও বন ও উপবন হইতে শুণ্ডদ্বারা পুষ্পরস আনিয়া চক্রের মধ্যে সংগ্রহ করে।

শিষ্য। তাহারা কি আপনাদের চাক চিনিতে পারে এবং সর্ব্বদাই কি ঐ চাকের মধ্যে থাকে?

গুরু। মধুমক্ষিকা সকল শাসিত প্রজার ন্যায় জন্তু, তাহাদের

মধ্যস্থিত যে এক রাণী আছে সকলেই তাহার অধীন হইয়া থাকে। তাহাকে যেমন২ নিয়মেতে আদেশ পায় তাহা গ্রহণ ও পালন করে। এবং আত্মবর্গের হিতের নিমিত্তে যত্ন করিয়া পরস্পর উপকার চেষ্টা করে। অতএব তাহাদের দ্বারা আমরা অনেক উপদেশ পাইতে পারি। দেখ, তাহারা যদি ঝাঁক করিয়া মধুচক্রের দিগে ধাবমান হয় তবে ত্বরায় যে বৃষ্টি হইবে ইহা জানা যায়।

শিষ্য। এমন মধুমক্ষিকাদিগকে যে নষ্ট করা ইহা কি নির্দ্দয়ের কর্ম্ম নয়? এবং তাহাদের এ প্রকার সঞ্চিত ধন হরণ করা ইহাও কি অকার্য্য কর্ম্ম নয়?

গুরু। না, তাহাদের আয়াসলব্ধ মধু হরণ করিলে আমাদের পাপ নাই, কেননা সকল মধু তাহাদের প্রয়োজনার্হ নয়। এই জন্যে পরমেশ্বর আমাদের হিতের নিমিত্তে যে মধুমক্ষিকা দ্বারা মধুর সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা আমাদের নিশ্চয় আছে। আর তাহাদিগকেই বা বধ করিব না কেন। আমরা কি মৎস্যদিগকে বধ করি না? তবে এক কালে যে সমূহ মক্ষিকা নষ্ট হয় এ খেদের বিষয় বটে, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে যত ছাগল ও মেষ প্রভৃতি নষ্ট হইতেছে তাহা যদি এককালে আমাদের সাক্ষাতে নষ্ট হইত তবে তাহাতেও আমরা খেদান্বিত হইয়া এ বড় নির্দ্দয়ের কর্ম্ম এমন কথা বলিতাম; কিন্তু ক্রমে২ বিনষ্ট হওয়াতে আমাদের তাদৃক্ খেদ হয় না। সে যাহা হউক, যাহাতে মধুমক্ষিকাগণকে নষ্ট না করিয়া মধু লইতে পারে এমন উপায় দ্বারা যদি মধু গ্রহণ করে তাহা উত্তম কর্ত্তব্য বটে।

শিষ্য। মধু অপহৃত হইলে তাহারা শীতকালে কি রূপে প্রাণধারণ করিতে পারে?

গুরু। তাহাদের নিমিত্তে কিঞ্চিত অবশিষ্ট মধু রাখা উচিত। তাহা না হইলে বরং তাহাদের প্রয়োজনানুসারে ক্রমে২ কিছু দেওয়া উচিত। এইরূপে যদি মধু গ্রহণ হয় তবে যাহাতে তাহাদের প্রয়োজন নাই এমন অবশিষ্ট মধুই গ্রহণ হয় তবে তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না।"—পদার্থবিদ্যাসার, পৃ. ৫৯-৬০।

"প্রথম কথোপকথন।

পৃথিবীর গতি ও আকার ও পরিমাণের বিবরণ।

গুরু। আমি শুনিয়াছি যে তুমি গতবর্ষে গঙ্গাসাগরে গিয়াছিলা, তাহাতে তুমি কি জাহাজে যাও নাই।

শিষ্য। হাঁ আমি জাহাজে গিয়াছিলাম, এবং যিনি জাহাজের অধ্যক্ষ তনি জাহাজের ভিতরে যাহা আছে তাহা সকলি আমাকে দেখাইলেন; তাহাতে জাহাজের হালি যে রূপে জাহাজ চালায় ও আর২ কৌশল দেখিয়া আমার পরম সন্তোষ ও আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। তখন এই মনে করিলাম যে কি রূপে বুদ্ধি বিদ্যাদ্বারা মনুষ্য এমন বৃহৎ আশ্চর্য্য জাহাজ নির্মাণ করিল, এবং কি প্রকারে পথ রহিত সমূদ্রেতে অনায়াসে ইহাকে চালায়।

গুরু। এ আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু জগৎস্রষ্টার শক্তি ও কৌশল ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য। তিনি এমন আশ্চর্য্য গ্রহগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ইহাদের মধ্যে এক গ্রহ পৃথিবী হইতে সহস্রগুণ বড়। তিনিও পথরহিত আকাশেতে গ্রহগণকে এইরূপে চালান, যে তুমি তাহাদের শীঘ্রগতির কথা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইবা। এমত শীঘ্রগতিত্ব ও তাহারা যে স্থান হইতে গমনারম্ভ করে শূন্যেতে ভ্রমণ

করিয়া পুনঃ সেই স্থানেতে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার ভ্রমণ করে। এবং জাহাজ নির্ম্মাণের যে কৌশল তাহা মনুষ্য শরীরের ও ক্ষুদ্র জন্তুর শরীরের সৃষ্টি কৌশলের সহিত তুলনার যোগ্য হইতে পারে না। তুমি যে দিবসে জাহাজে গিয়াছিলা সে কি নির্ব্বাত ছিল।

শিষ্য। সে দিবস বায়ুর সঞ্চার ছিল না, সূর্য্য প্রদীপ্ত হইলে সর্ব্বদিকে জল অতি সুন্দর রূপ দেখা গেল, এবং আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বে অন্য২ জাহাজ থাকাতে অতি শোভাকর দৃষ্ট হইল।

গুরু। আমি অনুমান করি, তুমি যখন সমুদ্রে গিয়াছিলা তখন জাহাজের গবাক্ষ দ্বারা বাহিরে দৃষ্টি করিয়াছিলা, তাহাতে একই বস্তু সর্ব্বদা দেখিয়াছিলা কি না?

শিষ্য। আমি অনেক বার বাহিরে দৃষ্টি করিয়া ছিলাম, প্রথমে এক অট্টালিকা দেখিলাম, তাহাতে আমার বোধ হইল কেন সে অট্টালিকা দক্ষিণ ভাগে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, এবং অল্পক্ষণেই সে অদৃশ্য হইলে অপর বস্তু দেখিলাম, তাহাও ক্রমে২ অদৃশ্য হইল, ইহার কারণ কেবল জাহাজের মান্দ্য ও বিপরীত গতি।

গুরু। সে সত্য, কিন্তু জাহাজের গতি তোমার বোধ হইয়াছিল কিনা?

শিষ্য। কিছুমাত্র না; জাহাজের সকল লোক কহিল, যে যদি আমরা বাহিরে দৃষ্টি না করিতাম, তবে তখন জাহাজের কিছু গতি আমাদের অনুমান হইত না।

গুরু। তবে এই এক প্রমাণেতে তুমি কি বুঝিতে পার না, যে পৃথিবী আমাদিগকে লইয়া ভ্রমণ করিতে পারে ও আমরা তাহার

ভ্রমণের বোধ করিতে পারি না। বিশেষতঃ জাহাজের গতি হইতে কিম্বা মনুষ্যের শিল্প নির্ম্মিত অন্য কোন যন্ত্রের গতি হইতে পৃথিবীর গমন একরূপ ও সমান।

শিষ্য। ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু পৃথিবী যদি ভ্রমণ করে তবে কিরূপে সম্ভবে যে, যে স্থান হইতে পাষাণ উৎক্ষিপ্ত হয় পুনর্ব্বার সেই স্থানেই পড়ে। যে হেতুক পৃথিবী অতি বহতী প্রযুক্ত যদি প্রতি চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকাতে একবার ভ্রমণ করে তবে অবশ্য অতি শীঘ্র চলে। এবং পৃথিবী যদি ভ্রমণ করে তাহার গমন পূর্ব্বাভিমুখ অবশ্য হয়, যে হেতু আমরা দেখিতেছি যে সূর্য্য ও চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম-দিকে গমন করে, এইক্ষণে আমি অনুমান করি, যে পাষাণ কোন স্থান হইতে উৎক্ষিপ্ত হইলে পৃথিবী পূর্ব্বদিকে যতদূর গমন করে সেই স্থান হইতে তাহা ততদূরে পশ্চিমে পড়ে।

গুরু। তোমার এ কথা জ্ঞানির ন্যায় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিতে হয়, যে কোন বস্তু চালিত হইলে যাবৎ বাধা না পায় তাবৎ সে সেইরূপ চলে। পাষাণ উৎক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর গমনানুসারে চলে, ও যে লোক সেই পাষাণ উত্তোলন করে সেও সেই রূপ চলে, অর্থাৎ পাষাণ ও পাষাণগ্রাহী উভয়ই পৃথিবীর সহিত চলে। অতএব পৃথিবী পূর্ব্বদিকে যত শীঘ্র গমন করে তত শীঘ্র পাষাণও শূন্যে চলে; এই কারণে যে স্থান হইতে উৎক্ষিপ্ত হয় সেই স্থানেই পুনর্ব্বার পড়ে। যদ্যপি দর্শকদিগের বোধ হয় যে পাষাণ উৎক্ষিপ্ত হইলে সমসূত্রপাতরূপে উঠে এবং পড়ে তথাপি তাহার যথার্থ গমন বক্র এবং আকাশে—যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি যায় না সেখান হইতে দৃষ্টি করিলে উৎক্ষিপ্ত পাষাণের বক্র গমন দৃষ্টিকর্ত্তার প্রত্যক্ষ হইত। যদি এক বৃহন্নৌকা তীরের নিকট দিয়া চলে ও নৌকাস্থ দুই লোক ক্রীড়ার

নিমিত্তে পরস্পরাভিমুখে ঐ নৌকার উপরিভাগ দিয়া ভাঁটা নিক্ষেপ করে, তবে তাহারা বুঝিবে যে ঐ ভাঁটা সমসূত্রপাত রূপে চলিতেছে ; কিন্তু সে বাস্তব নয়, যে হেতুক যতদূরে নৌকা যাইতেছে ততদূরে ভাঁটাও চলিতেছে ; যদি এমত না হইত তবে অন্যদিকস্থ লোক সেই ভাঁটা ধরিতে পারিত না। যদ্যপি নৌকাস্থ লোকেরা বোধ করে, যে ভাঁটা সমসূত্রপাতরূপে এক দিক হইতে অন্যদিকে যাইতেছে, তথাপি তীরস্থ দর্শকেরা যাহাদিগের নৌকার গতি আক্রমণ করে না তাহারা দেখিতে পায় যে সেই ভাঁটা বক্রভাবে চলিতেছে ও সমসূত্রপাতরূপে এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকটে কদাচ যায় না।" —জ্যোতির্ব্বিদ্যা, পৃ. ৪-৭।

"দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির কারণ ও ঋতুগণের পরিবর্ত্ত ও চন্দ্রের ষোড়শ কলার বিবরণ

শিষ্য। বৎসরের মধ্যে কোন্২ সময়ে দিবারাত্রিব হ্রাস ও বৃদ্ধি হয় ইহার কারণ কি? তাহা যদি মহাশয় জ্ঞাত করান তবে বড় আহ্লাদিত হই। কেন না সূর্য্য নিশ্চল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এমত হইলেও যেমন দিবারাত্রির পরিবর্ত্ত হয় এবং পৃথিবী আপন আলে চব্বিশ ঘণ্টাতে ভ্রমণ করিলেও তদ্রূপ পরিবর্ত্ত হয়। ইহা আমি জানি তথাপি দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি কি প্রকারে হয় তাহা বুঝিতে পারি না। এখন বাস্তবিক সূর্য্য নিশ্চল এমত আমাকে যদি পূর্ব্বে না জানাইতেন তবে তাহারই উত্তর দক্ষিণায়নদ্বারা দিবারাত্রিব হ্রাসবৃদ্ধি হয় ইহা আমি জানিতে পারিতাম।

গুরু। বাস্তবিক সূর্য্য ভ্রমণ করে না বটে, কিন্তু কি হেতুক দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ও ঋতুগণের পরিবর্ত্ত হয় তাহা সূর্য্যের দক্ষিণায়ন

ও উত্তরায়ণের অপেক্ষা না করিয়াও আজি এখনি তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইতেছি। সম্প্রতি একটা বাতি জ্বালাইয়া সূর্য্যস্বরূপ এই মেজের উপরে রাখ, কিন্তু এই বাতির দীপ্তি ব্যতিরেকে অন্য আলো না আইসনের কারণ আমি গৃহের দ্বার সকল রুদ্ধ করি।

শিষ্য। এই মহাশয় বাতি জ্বালিতেছে।

গুরু। ভাল, এখন আমি এই ক্ষুদ্র ভূগোলের মধ্যে উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রের কিঞ্চিৎ বাহির পর্য্যন্ত নির্গত করিয়া একটা তার প্রবেশ করাইয়া দীপের সমানভাগে দীপ্তির দিগে এই ভূগোলকে লম্বিত করণপূর্ব্বক দীপের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করাই, ইহাতে এই দেখ, দীপের শিখা বিষুবরেখার সমান প্রদেশে থাকিল, এবং দীপের দীপ্তি এক কেন্দ্র অবধি অপর কেন্দ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্তা হইল।

শিষ্য। হাঁ, মহাশয় দেখিলাম এ যথার্থ বটে।

গুরু। এখন এই যেমন ভূগোলের অর্দ্ধভাগ দীপের দীপ্তিতে প্রকাশিত হইল ও অপরার্দ্ধ ভাগ অন্ধকারাবৃত হইল তদ্রূপ পৃথিবীরও এক পার্শ্বে দিবা ও অন্য পার্শ্বে রাত্রি হয় জানিবা।

শিষ্য। হাঁ, এ কথা বড় সুস্পষ্ট হইল।

গুরু। আমি দীপের চতুষ্পার্শে ভূগোলকে প্রদক্ষিণ করাইয়া ক্রমে২ আপন আলে ফিরাইতেছি, তাহা তুমি সাক্ষাৎ দেখিতেছ। এখন এইরূপে ভূগোল যদি স্বীয় আলে প্রত্যেক চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকাতে ফিরান হয় তবে এক কেন্দ্র অবধি অন্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত উপরিভাগ ১২ ঘড়ী দীপ্তিময় ও ১২ ঘড়ী অন্ধকারাবৃত হয় জানিবা।

শিষ্য। হাঁ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গুরু। ভাল, এখন আমি এই ভূগোলকে আপন আলে ভ্রমণ করাইয়া দীপের উত্তর কেন্দ্রকে কিছু নমন করি। তাহাতে এই দেখ,

যত নমন করিতেছি তত উত্তর, কেন্দ্রের ও পার্শ্বে দূরে দীপ্তি ব্যাপ্তা হইতেছে। এবং ভূগোলের উত্তরার্দ্ধ ভাগের যত স্থান ভ্রমণ দ্বারা অন্ধকার দিয়া যায় সে সমস্ত স্থান দীপ্তি অপেক্ষা অন্ধকারে অল্পক্ষণ ভ্রমণ করে। ইহাতে সুতরাং সেই স্থানের রাত্রিমান অপেক্ষা দিনমান বড় হয়। আরও দেখ, দীপ বিষুবরেখার উত্তর দিগে থাকিলে উত্তর কেন্দ্রের ওপার্শ্বে যতদূর দীপ্তি করে, দক্ষিণ কেন্দ্রের নিকটে ততদূর দীপ্তি করে না। এই জন্যে ভূগোলের দক্ষিণার্দ্ধভাগে যত স্থান দীপ্তি দিয়া যায় সে সমস্ত অন্ধকারাপেক্ষা দীপ্তিতে অল্পক্ষণ ভ্রমণ করে। ইহাতে সুতরাং তৎকালে সে সমস্ত স্থানে রাত্রিমান অপেক্ষা দিনমান ছোট হয়। আব যদি উত্তর কেন্দ্র হইতে দীপকে কিঞ্চিত নীচ করিয়া ভূগোলকে নিজ আলে ভ্রমণ করাই, তবে ঐ দীপ উত্তরকেন্দ্র ভাগকে প্রকাশিত না করিয়া দক্ষিণ কেন্দ্রভাগে দীপ্তি প্রকাশ করে। ভূগোলের উত্তর ভাগের যত স্থান দীপ্তির মধ্য দিয়া যায় সে সকল অন্ধকারাপেক্ষা অল্প দীপ্তিতে ভ্রমণ করে। অতএব বিষুবরেখার উত্তর দিগে রাত্রিমান অপেক্ষা দিনমান ছোট হয় এবং দক্ষিণদিগে দিনমান অপেক্ষা রাত্রিমান ছোট হয় জানিবা। আর আমরা যদি পৃথিবীর কেন্দ্র সূর্য্যের প্রতি নম্র করিয়া ধরি কিম্বা সূর্য্য হইতে ফিরাই তবে সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিগে গমন করাতে যে জল হয় এই উপায় হইতেও সেই ফল নিষ্পন্ন হয় ইহা দেখিতেছ।" —ঐ, পৃ. ৮৩-৬।

"পিলপিদা ও ইপামিনন্দার বিবরণ

যে সময়ে রোম নগরের লুট হইয়াছিল, সেই সময়ে গ্রীস দেশেও অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। স্পার্ত্তায় রাজা আজোসিলো এক যুদ্ধেতে

আথীনী লোককে জয় করিলেন ; পরে আথীনী লোক ফার্শীদের হইতে উপকার প্রাপ্ত হইয়া অপর যুদ্ধে স্পার্ত্তা সৈন্যকে জয় করিল। ঐ সময়ে গ্রীস দেশস্থ নানা প্রদেশের লোকেরা পরস্পব যুদ্ধ করিয়া আপনাদের বল ক্ষয় করিত। ফার্শীরা তাহা দেখিয়া গ্রীকদের সহিত এক নিয়ম নিরূপণ করিল ; তাহাতে গ্রীকদের নিন্দা ও ক্ষতি হইল।

স্পার্ত্তা-লোক প্রায় সকলেই যোদ্ধা ছিল। ফার্শীদের সহিত সন্ধি স্থির হইলে পর তাহারা আপনাদের প্রতিবাসিদের সহিত পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে থীবীয় লোকদের মধ্যে এক বিবাদ উপস্থিত হইলে স্পার্ত্তারা তদ্বিবাদের ভঞ্জন ছলেতে থীবীয় সৈন্যকে তাহাদের দুর্গ হইতে দূর করিয়া আপনাদের সৈন্যগণকে তাহাতে রাখিল। এইরূপে চারি বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দুর্গ তাহাদের অধীন ছিল ; কিন্তু শেষে থীবীয় লোক মহা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যুপকার করিতে স্থির করিল। তাহাতে এক পর্ব্ব সময়ে তাহাদের কতকগুলি পুরুষ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া স্পার্ত্তাগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে সংহার করিল।

আর্থিয়া নামে তাহাদের রাজা সেই দিবসে আথীনী নগর হইতে প্রেরিত এক পত্র পাইয়াছিলেন, যাহাতে উপরের লিখিত এই বৃত্তান্ত ছিল ; কিন্তু রাজা ঐ সমাচার সম্বলিত পত্র পাইয়া তদ্দিবসে পাঠ না করিয়া সঙ্গোপনে রাখিয়া কহিলেন, অদ্য আমাদিগের পর্ব্ব দিবস, কল্য রাজকর্ম্ম করিব। তাহাতে তিনি অগ্রেতেই শত্রুহস্তে হত হইলেন। দেখ, আলস্যেতে তিনি প্রাণ হারাইলেন। অতএব যদি আমরা সুখ সম্ভোগার্থে উচিত কর্ম্মে আলস্য করি, তবে অবশ্যই আমাদিগের ক্ষতি হইবে। যদ্যপি প্রথমে না হয়, তথাপি শেষেতে নিতান্তই হয়।

এই সময়ে পিলপিদা নামে থীবীয় এক বিখ্যাত ব্যক্তি থীবী নগরের এক পরমোপকার করিলেন; কেননা তিনি আথীনী লোক হইতে সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া স্পার্ত্তা সৈন্যকে দুর্গ হইতে দূর করিয়া নগরের পরিত্রাণ করিলেন। ইপামিনন্দা নামে এক বিশিষ্ট ও পরাক্রমশালি জন পিলপিদার মিত্র ছিলেন, তিনি ঐ সময়েতে থীবীয় সৈন্যের প্রধান সেনাপতি নিরূপিত হইলেন। পরন্তু তিনি জ্ঞানেতে, সৎক্রিয়াতে মহা বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার এক প্রধান গুণ এই যে, তিনি কখন মিথ্যা বাক্য কহিতেন না, সর্ব্বদা সত্য বাক্যই কহিতেন। তাঁহার যদি অন্যগুণ না থাকিত, তথাপি সত্য বাক্যের প্রভাবে তিনি মহা-প্রশংসার যোগ্য হইতেন। কিন্তু যেখানে সত্যগুণ আছে, সেখানে তাবৎ প্রশংসনীয় গুণ স্থিতি করে।

ইপামিনন্দা যে এক কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা ধনিগণের অতি বিবেচনার যোগ্য। তিনি এক দরিদ্র ব্যক্তিকে একজন ধনীর নিকটে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, যে এই ব্যক্তিকে আপনি সহস্র মুদ্রা দিউন। ধনবান্ তাহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে ইপামিনন্দাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি সেই ব্যক্তিকে আমার নিকট কেন প্রেরণ করিলেন? ইপামিনন্দা হাস্য করিয়া কহিলেন, কারণ এই যে তুমি ধনবান্, তিনি দরিদ্র।

ইপামিনন্দা সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। লুক্ত্রা নামে এক নগরেতে তিনি সসৈন্য হইয়া ক্লিয়ম্ব্রত নামে স্পার্ত্তার সেনাপতিকে জয় করিলেন। স্পার্ত্তা সৈন্য অপেক্ষা থীবীয় সৈন্য অল্প ছিল, কিন্তু তাহাদের সেনাপতির নৈপুণ্য ও সৈন্যের সাহস প্রযুক্ত তাহারা জয়ী হইল। তাহাদের তদ্রূপ সাহসের এক কারণ ছিল, কেননা তাহারা আপনাদের স্বাধীনতার নিমিত্তে যুদ্ধ করিল; স্পার্ত্তাসৈন্য কেবল জয়ের নিমিত্তে

যুদ্ধ করিল; এই কারণ তাহাদের জয়ী হওনে কিছু আশ্চর্য্য নয়। বীরেরা স্বাধীনতার নিমিত্তে কোন্ দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়? ইহাতে বোধ হয়, যে ইংরাজীয় সৈন্যেরা আপন দেশের স্বাধীনতার নিমিত্তে যুদ্ধ করিলে সর্ব্বত্র জয়ী হইতে পারে।

ঐ যুদ্ধ সময়ে কতকগুলি মূর্খ লোক ইপামিনন্দাকে কহিল, যে আমরা অমঙ্গলের লক্ষণ দেখিতেছি। তাহাতে তিনি কহিলেন, আপন দেশের হিতার্থে যুদ্ধ করাই সুমঙ্গলের লক্ষণ। দেখ, ইতর লোকদের মধ্যে অনেক মঙ্গলামঙ্গলের লক্ষণ স্বীকৃত আছে; কিন্তু বিজ্ঞানের মধ্যে তাহা মান্য নয়।

ইপামিনন্দা আর্কাদিয়া নামে আর এক দেশের পরিত্রাণ করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে এত সুক্রিয়া করিলেন, যে স্পার্ত্তার রাজা তাঁহাকে আশ্চর্য্য কর্ম্মকারী এই উপনাম দিলেন। ইপামিনন্দা ও পিলপিদা সংগ্রামে জয়ী হইয়া স্বদেশে গমন করিলেন; কিন্তু তথা উপস্থিত হইলে পরে তাঁহারা আপন আপন সুক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত না হইয়া আপন আপন পদের নিয়মিত কালের অতিক্রম করণ প্রযুক্ত বিচার স্থানে আনীত হইলেন। তাহাতে পিলপিদা স্বভাবতঃ ক্রোধী প্রযুক্ত উত্তমরূপে আত্মনিবেদন করিলেন না; কিন্তু ইপামিনন্দা ধীরে ধীরে উত্তমরূপে আত্মনিবেদন করিলেন; তাহাতে তাঁহারা উভয়ে নির্দ্দোষ হইলেন। বিচার কর্ত্তাদের যে কয়েকজন তাঁহাদের বিপক্ষ ছিল, তাহারা ইপামিনন্দাকে অপমান ও ক্লেশ দিবার নিমিত্তে রাজপথ পরিষ্কার কারণ পদ তাহাকে দিল। তিনি তাহা সমাদর পূর্ব্বক স্বীকার করিয়া কহিলেন, এই পদ যদ্যপি আমাকে গৌরবান্বিত না করে, তথাপি আমি তাহাই গৌরবান্বিত করিব। দেখ, ইহাতে তাঁহার

কেমন মহত্ত্ব গুণ হইল! ভদ্রলোক তাবৎ প্রকার পদেতে শোভান্বিত থাকে।

পিলপিদা ফিরীদিগের হিতার্থে যুদ্ধ করিয়া নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ফিরী লোকদের প্রতি সিকন্দর নামে এক ব্যক্তি উপদ্রব করিতেছিল। সে ব্যাক্ত মহা দুষ্ট ও নানা দুষ্কর্ম্মশীল এবং সকলের অবজ্ঞেয় ছিল; এই কারণ সর্ব্বদা ভীত থাকিত, এবং শঙ্কাপ্রযুক্ত উচ্চস্থ এক চোরকুঠরীতে শয়ন করিত। উপরে যাইবার সিঁড়ির নিকটে এক ভয়ানক কুকুর বসিয়া থাকিত। অবশেষে তাহার স্ত্রী ঐ কুকুরকে দূর করিয়া সোপানের ধাপে ধাপে তুলা রাখিল, তাহাতে তাহার পত্নীর ভ্রাতারা নিঃশব্দেতে সোপান দ্বারা উপরে উঠিয়া তাহাকে বধ করিল। এই প্রকারে তিনি নিজ কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিলেন।

ইপামিনন্দা যুদ্ধভূমিতে জয়প্রাপ্তির সময়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। যখন থীবীয় লোক মান্তিনীয় নগরের নিকটে স্পার্ত্তা সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিল, তখন ইপামিনন্দা সংগ্রামের বড়শার দ্বারা বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার দেহ লইবার নিমিত্তে উভয় সৈন্যেতে যুদ্ধ হইল। পরে থীবীয় সেনাকর্ত্তৃক তাহা প্রাপ্ত হইল। ইপামিনন্দা ঐ ক্ষতদ্বারা মহা যন্ত্রণা পাইলেন। তৎকালেও তিনি আপনার সৈন্যের হিত চিন্তা করিলেন। যখন তিনি সংবাদ পাইলেন, যে থীবীয় সৈন্য জয়ী হইল, তখন কহিলেন, যে সকল মঙ্গল হইল। যে চিকিৎসকেরা তাঁহার সেবা করিতেছিল, তাহারা কহিল, যে বড়শার ফলা বাহির করিলে ইনি নিতান্তই মরিবেন। এই হেতু তাহা বাহির করিতে কাহারো সাহস হইল না। অতএব আপনি তাহা টানিয়া বাহির করিলেন; ও কিঞ্চিৎ বিলম্বে বন্ধুগণের সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন।

থীবীয়দের যে সম্ভ্রম তাঁহাদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মরণেতে নষ্ট হইল।

সুরাকুসের রাজা জ্যেষ্ঠ দিওন্নুশীয় ইপামিনন্দার মরণের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মরিলেন; পূর্ব্বলিখিত সিকন্দরের ন্যায় তিনি অতি নিষ্ঠুর ও উপদ্রবী ছিলেন। তিনি আপন গাত্রে লৌহবর্ম্ম ধারণ করিয়া তাহার উপরে বস্ত্র পরিধান করিতেন। অন্যের প্রতি তিনি যেরূপ ক্রুর কর্ম্ম করিতেন, তৎপ্রযুক্ত তাহার ভয় ছিল যে, পাছে আমার প্রতি ঐ প্রকার কুকর্ম্ম কেহ করে। ঐ মানুষের তদ্রূপ ত্রাসেতে এই প্রমাণ প্রাপ্ত হয়, যে যদি কেহ পরহিংসা ও পরদ্রোহ করে, তবে সে জন আপনার পক্ষে ততোধিক হিংসা ও দ্রোহ করে। উপদ্রবকারিদিগের বিবরণে ইহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে।"—সত্য ইতিহাস সার, পৃ. ৮৫।

"দেশভ্রমণের ফল

এই কলিকাতা নগরে অনেক২ ভাগ্যবান ও ধনবান লোক আছেন কিন্তু তাঁহারা স্বদেশ পর্য্যটন করিয়া তদুৎপন্ন বিবিধ বস্তু ও নানা লোকের নানা অবস্থা দর্শনজন্য যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করেন না, ইহা আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ এইক্ষণে বাষ্পের নৌকা প্রভৃতি দেশভ্রমণের বহুবিধ উপায় থাকিলেও তাঁহারা যে ভ্রমণ করেন না ইহা আরো আশ্চর্য্য। উৎসবাদি অবকাশের সময়ে যদি যুব লোকেরা স্বদেশে কিছুদূর ভ্রমণ করেন, তবে তদ্দ্বারা তাহাদের মন প্রফুল্ল ও উত্তম হইতে পারে, এবং অনেক২ বিবেচনার কথাও উপস্থিত হয়, ও চেষ্টিত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়াতে অতি সুখোদয় হয়, এবং সর্ব্বদা বায়ুসেবা ও বিবিধ বস্তুর দর্শনেতে শরীরেরও বল হয়, এবং উদ্যোগ ও সাহসের বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা ফল জন্মে।"—সারসংগ্রহ, পৃ. ১।

"আসিদের কথা

যে দ্রব্য অম্লরস যুক্ত হইলে লিৎমস্ কাগজকে রক্তবর্ণ করে ও আল্কালীর গুণ বিনাশ করে সে আসিদ নামে বিখ্যাত হয়। কিন্তু কোন২ আসিদ অদ্রবণীয়, এবং অদ্রবণীয়তা-প্রযুক্ত অম্ল হয় না ও কাগজকে রক্তবর্ণ করে না, এই কারণ যে বস্তু আল্কালীর সহিত মিশ্রিত হইলে লবণ জন্মায় ও দ্রবীভূত হইয়া অম্ল হয়, এবং কাগজকে রক্তবর্ণ করে, তাহাকেই আসিদ বলিতে হয়। আসিদের এই সাধারণ গুণ। আসিদ জলেতে মিশ্রিত হইতে পারে ও মিশ্রিত হইয়া তাহার বৃদ্ধি ও তাপ জন্মাইতে পারে, এবং অল্প তাপেতে দ্রবীভূত ও বাষ্পীভুত হইতে পারে, এবং শাকের নীল ও হবিত ও কৃষ্ণ লোহিত বর্ণকে লোহিত বর্ণ করিতে পারে। অকৃসিজেনের সহিত নৈত্রজিন ও অঙ্গার ও গন্ধক মিশ্রিত করিলে যে আসিদ উৎপন্ন হয় সেই আসিদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।

নৈত্রিক আসিদ, যাহাকে পূর্ব্বকালে আক্বাফর্ত্তিস্ অর্থাৎ তীব্রজল কহিত, এবং এই দেশে যাহাকে দ্রাবক কহে তাহা নৈত্রজিন ও অকৃসিজেন হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা শুদ্ধ হইলে জল অপেক্ষা অর্দ্ধাংশ ঘন হয়, এবং বর্ণ রহিত ও বিষবৎ ও অতিজারক হয়। এবং শিল্প কর্ম্মেতে কর্ম্মণ্য হয়, এবং তাম্রেতে অক্ষর কাটনে ও রঙ্গাওনে এবং ধাতুবিদ্যাতে ও ধাতু পরীক্ষাতে ও নানা ঔষধিতে কর্ম্মণ্য হয়। এবং কিমিয়া বিদ্যাতে প্রয়োজনীয় হয়, কেন না তদ্দ্বারা ধাতু সহজে দ্রবীভূত হয়; সে প্রথমে আপনা হইতে ধাতুদিগকে অকৃসিজেন দেয় পরে আসিদের গুণ বিনষ্ট করে।

কার্ব্বনিক অর্থাৎ অঙ্গারীয় আসিদ অতি সূক্ষ্ম বাষ্প হয়, তথাপি

জলেতে লীন হইয়া এক দুর্ব্বল আসিদ জন্মায়। এই আসিদ চূর্ণ প্রস্তর ও খড়ি প্রস্তর ও শ্বেত প্রস্তরাদি অনেক দ্রব্য হইতে লভ্য হয়, ও তাহাদের শতাংশের মধ্যে চল্লিশ অংশ লভ্য হয়। এবং পশুদের প্রশ্বাসের মধ্যে এই আসিদ আছে; তদ্ভিন্ন মৃত শরীর ও ম্লান পত্রাদি হইতেও জন্মে, এবং আকাশ বায়ুতে সর্ব্বদা থাকে, ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি এক অনাচ্ছাদিত পাত্রস্থ চূর্ণজল গৃহের বাহিরে স্থাপিত হয় তবে তাহার উপরে সরের ন্যায় যে বস্তু উৎপন্ন হয় সে চূর্ণের অঙ্গারীয় নাম বিখ্যাত হয়; এই আসিদ দীপশিখা নির্ব্বাণ ও প্রাণ বিনষ্ট করিতে শক্তিমান হয়। তাহা আকাশবায়ু হইতে ঘন হইয়া নিম্ন স্থানে থাকে, এবং সঙ্কীর্ণস্থান ও পুরাতন কূপ ও আকর এই সকল স্থানে থাকে, এবং যে স্থানে থাকে সেই স্থানের বায়ুর প্রশ্বাস রোধকরণ শক্তি হয়, এই নিমিত্তে যে কেহ সেই স্থানে প্রবেশ করে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। যে জল কিম্বা কোন দ্রব বস্তু ভার দ্বারা তাহাতে মিশ্রিত হয় তাহার সেই ভার দূরীকৃত হইলে সে পুনর্ব্বার তাহা হইতে মুক্ত হয়। সোদাজল ও জিঞ্জির-বীর ও সৈদর ও শাম্পেন মদিরা, ইহাদের শিশি খুলিলে যে ফেনোদ্গম হয় সে কেবল এই আসিদের তেজের দ্বারা হয়। এবং বীর ও পোর্ত্তর্ ও এল এই সমস্ত পেয় দ্রব্যের যে তেজ তাহাও এই আসিদ হইতে জন্মে, এই নিমিত্তে এই সমস্ত পেয় দ্রব্য যদি পাত্রে অনাচ্ছাদিত থাকে তবে এই আসিদের নির্গমণদ্বারা বিকৃত হয়।

যে গন্ধকীয় আসিদ পূর্ব্বে তুতিয়ার তৈল নামে বিখ্যাত ছিল তাহা স্বাভাবিক নির্ম্মল নহে, কিন্তু যে সমস্ত অগ্নি পর্ব্বতের নিকটে থাকে সে সমস্ত কখন২ নির্ম্মল হয়। এই আসিদ চূর্ণমধ্যে মিশ্রিত অনেক প্রাপ্ত হয়। কিমিয়া বিদ্যানুসারে ইহা অন্য আসিদ হইতে শক্তিমান হয়। এবং অমিশ্রিত হইতে প্রবল দাহকতা শক্তিবিশিষ্ট হয়, ও

তাহাতে মিশ্রিত হইলে মাংস ও শাক বিকৃত হয় ও অঙ্গার চূর্ণের ন্যায় ভস্ম হয় ও জল নির্ম্মিত হয়। তাহা অতি সহজে জলেতে মিশ্রিত হয়, ও মিশ্রিত হওন সময়ে অত্যন্ত তাপ উৎপন্ন করে। এবং জলাকর্ষণ শক্তিদ্বারা বরফকে অতি শীঘ্র দ্রবীভূত করে ও সমান বরফের সহিত মিশ্রিত হইলে অত্যন্ত তাপ জন্মায়। এবং আকাশবায়ু হইতে জলীয় বাষ্প সকল আপনার নিকটে শীঘ্র আকর্ষণ করিয়া গ্রাস করে, অতএব কেহ যদি জলের বাষ্পকরণ দ্বারা হিমানী করিতে চাহে তবে এই আসিদ দ্বারা তাহা করা যায়। এই আসিদ জলাকর্ষণ শক্তি দ্বারা অতি কর্ম্মণ্য হয়। এবং চর্ম্মকে দগ্ধ করে ও বাষ্প উৎপন্ন করে ও তাবৎ মাংসকে বিকৃত করে।”—ঐ, পৃ. ৯৪-৬।

জন ম্যাক

(১৭৯৭-১৮৪৫)

উইলিয়ম ইয়েটসের মত জন ম্যাকও শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের কর্ম্মীরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ম্যাক কখনও এই মিশন হইতে আলাদা হইয়া যান নাই, আমৃত্যু শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া নানা ভাবে মানব-সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বাঙালী যুবকদের বিজ্ঞান-শিক্ষাদানে এবং বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞান-পুস্তক রচনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা কখন ভুলিবার নয়।

জন ম্যাক ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন সেখানকার একজন সলিসিটর। ম্যাক শৈশবেই প্রতিভার পরিচয় দেন। স্কুল ও কলেজে বিদ্যাবত্তায় সতীর্থদের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। প্রথমে হাই স্কুলে এবং পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তৎকালীন উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। প্রতিটি স্থলেই তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপকদের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লাভে সমর্থ হইলেন। গ্রীক, লাটিন ক্লাসিক সাহিত্যে তিনি ব্যুৎপন্ন হন। আবার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে, যেমন—অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্রে, তাঁহার বিশেষ দখল জন্মিল। রসায়নশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার ছিল সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ। এই বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র ভাবে বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতাদি শুনিতেন। শল্যবিদ্যা (Surgery) বিষয়েও তিনি কতকগুলি বক্তৃতা

শুনিয়াছিলেন। ম্যাকের কৌতূহল এবং জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া শল্যবিদ্যার অধ্যাপক অত্যন্ত বিস্মিত হন।

জন ম্যাক পাদ্রীরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিতে মনস্থ করিলেন। স্থির হয় যে, তিনি চার্চ্চ অব স্কটলণ্ডের পাদ্রী হইবেন। কিন্তু এই চার্চ্চের কতকগুলি বিধিব্যবস্থা তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির দিকে যৌবনেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তিনি মিশনের মূল কেন্দ্র ব্রিষ্টলে গমন করিলেন—ব্যাপটিষ্ট মিশন-প্রদত্ত বিশিষ্ট শিক্ষালাভ ও ধর্ম্মচর্য্যার নিমিত্ত। ম্যাক ইতিপূর্ব্বেই বিভিন্ন বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, এখানে আসিয়া খ্রীষ্টশাস্ত্র অনুশীলনান্তর তাহাতেও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিলেন। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম ওয়ার্ড বিলাতে গিয়া ম্যাকের বিষয় অবগত হন। শ্রীরামপুর কলেজের জন্য একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপকের প্রয়োজন ছিল। তিনি জন ম্যাককে এই পদ গ্রহণে সম্মত করাইলেন। শ্রীরামপুর কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক-নিয়োগের কথা জানিয়া স্কটলণ্ডনিবাসী জেমস ডগলাস কলেজের বিজ্ঞান গবেষণাগার বা লেবরেটরী গঠনের জন্য পাঁচ শত পাউণ্ড দান করিলেন। ইহা দ্বারা বৈজ্ঞানিক, বিশেষতঃ রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সুবিধা হইল।

ওয়ার্ড ম্যাককে লইয়া ১৮২১ সনের মে মাসে ভারতবর্ষে রওনা হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিস কুকও আসিলেন, ইনি বিবাহের পরে মিসেস উইলসন নামে অধিকতর পরিচিত হন। এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার কৃতিত্ব অপরিসীম। এই বৎসর নবেম্বর মাসে ওয়ার্ড ও ম্যাক শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। শ্রীরামপুর কলেজ পরিচালনায় ড. জস্থুয়া মার্শম্যান বিশেষ ব্যাপৃত ছিলেন। জন ম্যাক আসিয়া

তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। ওয়ার্ড ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনার ভার লন। ম্যাক বাংলা ভাষা শিক্ষায়ও অবহিত হইলেন। বিভিন্ন বিষয় অধ্যাপনাকালে মানচিত্রের অভাব বড়ই অনুভূত হইত। ম্যাকের নেতৃত্বে মিশনরীগণ একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র বাংলায় সংকলনে মন দেন। প্রায় এক হাজার শহর ও নদনদীর ইংরেজী ও বাংলা নামসম্বলিত ভারতবর্ষের মানচিত্রের একটি খসড়া তৈরী করিবার পর লণ্ডনে শিল্পী ওয়াকারের নিকট তাহা প্রেরিত হয়। খসড়ার ভিত্তিতে মানচিত্রটি অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইল। এখানি বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের নামে উৎসর্গ করা হয়। ভারতীয় ভাষায় মানচিত্র রচনা এইভাবেই সুরু হয়।

শ্রীরামপুর কলেজে লেবরেটরী বা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইল। ম্যাক এখানে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। রসায়নবিদ্‌রূপে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। কলিকাতায় তখন যে স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁহারাও ম্যাককে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির শেষ সভায় তাঁহারই প্রস্তাবে সোসাইটি-ভবনে ম্যাকের দ্বারা রসায়নশাস্ত্রের উপরে বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ম্যাক সোসাইটির হল-ঘরে রসায়ন সম্বন্ধে এক প্রস্থ বক্তৃতা দিলেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান বলেন, বক্তৃতার দিনগুলিতে আশী হইতে একশত জন পর্য্যন্ত সমঝদার শ্রোতা হাজির থাকিতেন। নিয়মিত উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে জনদশেক ছিলেন ভারতীয়। বক্তৃতার দক্ষিণা স্বরূপ ম্যাক সর্ব্বসাকুল্যে একশত পাঁচ পাউণ্ড প্রাপ্ত হন। তিনি সবটাই মিশন-ভাণ্ডারে দান করেন।*

* *The Life and Time of Carey, Marshman and Ward.* Vol. II. Pp. 260-1.

ম্যাক শ্রীরামপুর মিশনে যোগদানের অল্পকাল পরে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ড মারা গেলেন। মিশনের অন্য প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়—উইলিয়ম কেরী ও জস্থয়া মার্শম্যানের সঙ্গে ম্যাক সর্ব্ববিষয়ে একমত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। মিশনের যাবতীয় বিপদে-আপদে, সুখে-সম্পদে তিনি তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। ম্যাক তাঁহাদের উভয়েরই বয়ঃকনিষ্ঠ ; এ কারণেও তিনি তাঁহাদের স্নেহপ্রীতি প্রাপ্ত হন। উপরন্তু ম্যাকের বিদ্যাবত্তা এবং কর্ম্মতৎপরতা তাঁহাদিগকে কম মুগ্ধ করে নাই। কেরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি প্রথম হইতেই বাংলা ভাষার চর্চ্চা সুরু করিয়া দেন। কলেজে তিনি ক্রমে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায়ই ছাত্রদের রসায়নবিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন। ড. জস্থয়া মার্শম্যানের পুত্র 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সঙ্গে একযোগে একটি বাংলা গ্রন্থমালা প্রকাশে তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন। মার্শম্যান লইয়াছিলেন ইতিহাসমূলক পুস্তকাদি রচনার ভার, ম্যাক বিজ্ঞানের পুস্তক লিখিতে অগ্রসর হন। কলেজ এবং মিশনের কার্য্যে ক্রমে অধিকতব লিপ্ত হইয়া পড়ায় ম্যাক একখানির বেশী বই লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু এই একখানি বই লিখিয়াই ম্যাক 'পাইওনিয়াব' বা অগ্রদূতের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির নাম—"কিমিয়া বিদ্যার সার, অর্থাৎ রসায়নবিদ্যার মূল কথা।" ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক এবং পত্রিকাদি কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, তবে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকসমূহেব মধ্যে ইহাই প্রথম পুস্তক। এই পুস্তক সম্বন্ধে পরে বলিব।

ম্যাক আর একটি বিষয়েও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের বিশেষ সহায়ক হন।

ম্যাকের জীবনকথা সংকলনে এই পুস্তকখানি এবং ১৮৪৫ সনের 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' ও 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

মার্শম্যান লিখিয়াছেন, তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' প্রথম বাহির করেন, সেই সময় এবং তাহার পরেও ম্যাক সম্পাদকীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া বহু রচনা দ্বারা উক্ত পত্রিকা-খানির গুরুত্ব ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। ম্যাকের রচনা ছিল একদিকে যেমন সহজ, স্বচ্ছ, অনাড়ম্বর, অন্যদিকে তেমনি নির্দোষ, তেজঃপূর্ণ ও ঝাঁঝালো; সংবাদপত্রের লেখা যেমন হওয়া উচিত ইহা ছিল ঠিক তেমনই। তাঁহার সংবাদপত্রের রচনাদি সম্বন্ধে সম্পাদক মার্শম্যান লিখিয়াছেন:

> "As a public writer, he had few equals among us. His compositions bore the exact impress of his mind, and were remarkable for their purity, clearness and vigour, He cultivated his style with no little assiduity, and was remarkably happy in clothing his thoughts in the strongest and most appropriate expressions. In all he wrote, however, his great object was to discover and exhibit the truth without any undue partiality, either for his own preconceived notions or for the authority of others. He wrote with much deliberation and seldom modified the structure of a sentence, or even change a word. Some of his ablest papers were sent to press without the alteration of more than a phrase or two. That correctness and elegance of diction which some men attain only by the most painful and elaborate emmendations, was exhibited in the first draft of his compositions."

শ্রীরামপুর ছিল ম্যাকের কর্ম্মস্থল। কেরীর মৃত্যু (১৮৩৪) এবং জসুয়া মার্শম্যানের ভগ্ন স্বাস্থ্য হেতু ম্যাককে প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে হইত যথেষ্ট। ইহার উপর তিনি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার পূর্ব্বাঞ্চল—খাসিয়া পাহাড়, আসাম প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণে বাহির হন। তাহার এই ভ্রমণের কথা শুনিয়া সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ঐসব অঞ্চলের যথাযথ অবস্থা সম্বন্ধে বিবৃতিদানের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ জানান। কারণ,

ঐ সময়ের মাত্র দশ বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চল ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ম্যাক-প্রদত্ত বিবরণ সরকারের দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ হইয়াছিল। আসাম পর্য্যটনকালে ম্যাক কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হন। শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ব্যাধিমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যলাভার্থ তিনি অবিলম্বে বিলাতযাত্রা করিলেন। স্বদেশে অবস্থানকালে তিনি স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান। এবারে তাঁহার দায়িত্ব অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। জশুয়া মার্শম্যানের অসুস্থতা, এবং অল্পকালের মধ্যে মৃত্যু নিবন্ধন তাঁহাকে বিলাতের ব্যাপটিষ্ট মিশনের সঙ্গে এক নূতন বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইল। ম্যাক শ্রীরামপুর ব্যতীত, অন্যান্য অঞ্চলের মিশন-পরিচালিত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উহার হস্তে ছাড়িয়া দিলেন।

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া জন ম্যাক ১৮৩৯ সনের প্রারম্ভে এদেশে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীরামপুর কলেজ, মিশনচার্চ এবং মিশনের অন্যান্য কার্য্যের পরিচালনাভার তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে শ্রীরামপুর কলেজ একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায়তনে পরিণত হইল। উৎকর্ষের দিক হইতে বেসরকারী কলেজসমূহের মধ্যে ইহা ছিল অদ্বিতীয়। চার্চে প্রদত্ত তাঁহার বাংলা প্রার্থনা ও উপদেশা-বলী শ্রোতাদের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইত। ম্যাক তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি কর্ম্মশক্তি সকলই মিশনের উন্নতিকল্পে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত নিঃসন্দেহ, কিন্তু তিনি কখনও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে এইরূপ কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটে। তিনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৪৫, ৩০শে এপ্রিল শেষ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পাদ্রী ও খ্রীষ্টান-সাধারণ তো বটেই, এমনকি এদেশীয়েরাও

বিশেষ দুঃখিত হন। 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' (মে ১৮৪৫)-এর শোক-সূচক উক্তির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করি:

> "We have only time in our present issue to announce the death of one of our oldest and most valued missionary friends and fellow-labourers, the Revd. J. Mack, of Serampore. He was removed by the fatal scourge the Cholera, on Wednesday evening, the 30th April....
>
> "Mr. Mack had been a resident in India upwards of twenty three years. His age was 48. He was a man of great natural and acquired habits. He was an original and deep thinker, a devoted labourer in the cause of truth, and one whose place will not be readily supplied. As a man of talent, a Minister, a leader of youth, and adviser and friend, few equalled our good, honest, cheerful and devoted friend, John Mack of Serampore. He rests from his labours. The Lord enable us to meet him in the skies...
>
> "He possessed extensive natural abilities. He was consipiquous as a student and shone in the Midst of such men as Carey Marshman, Ward, Yates and Pearce which is not small praise. To have laboured with such men was an honour. To be in point of talent ranked with such men was to earn a worthy fame, as to be with them now is the most complete felicity."

এখন, জন ম্যাকের "কিমিয়া বিত্থার সার" সম্বন্ধে কিছু বলিব। গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই: PRINCIPLES OF CHEMISTRY / By John Mack, of Sermpore College / Vol I / কিমিয়া বিত্থার সার। / শ্রীযুত জন ম্যাক সাহেব কর্ত্তৃক / রচিত হইয়া / গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল। / প্রথম খণ্ড / From the Sermpore Press / 1834.

পুস্তকখানির ইংরেজী ভূমিকায় ড. কেরীর সহায়তার কথা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। রসায়নের পরিভাষা সম্বন্ধে এই

ভূমিকায় তিনি অতি সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা তথা দেশভাষার মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার আয়োজন আজ হউক কাল হউক হইবেই। কাজেই এ সম্পর্কে জন ম্যাকের সুচিন্তিত অভিমত সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। উচ্চতর বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকাদি রচনায় এই অভিমত আমাদের কাজে লাগিবে নিশ্চয়। ভূমিকাটি অতি প্রয়োজনীয়। একারণ অন্যত্র সবটাই উদ্ধৃত হইল।

গ্রন্থখানি ৩৩৭ পৃষ্ঠা পরিমিত। ইহাতে ইংরেজী-বাংলা দুইটি পাঠই দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পাতার বাম দিকে ইংরেজী এবং দক্ষিণ দিকে বাংলা। পুস্তকের বিষয়ব্যঞ্জক অংশটি—যাহাকে আমরা সচরাচর 'প্রস্তাবনা' বা 'ভূমিকা' বলি—ম্যাক "পরিভাষা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পরিভাষাটি এখানে উদ্ধৃত হইল:

"॥১॥ কিমিয়া বিদ্যাদ্বারা এই২ শিক্ষা হয় বিশেষতঃ নানাবিধ বস্তুজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্তু যে২ ব্যবস্থানুসারে পরস্পর সংযুক্ত ও লীন হইলে ঐ বস্তু হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা।

॥২॥ অদ্য পর্য্যন্ত যত বস্তুব তত্ত্ব জানা গিয়াছে সে অল্প অর্থাৎ ৫১ একপঞ্চাশতেব অধিক নহে। সে সকলের নাম মূলবস্তু যেহেতুক বোধ হয় যে ঐ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কেবল এক পদার্থ আছে।

॥৩॥ অন্যান্য বস্তুর নাম সঙ্কর বস্তু যেহেতুক সে সকলের মধ্যে দুই কিংবা অধিক পদার্থ আছে। তাহার সংখ্যার প্রায় সীমা নাই।

॥৪॥ যখন মূলবস্তুর পরস্পর লয়েতে সঙ্কর বস্তু উৎপন্ন হয় এবং সেই সঙ্কর বস্তুদ্বয়াদির পরস্পর লয়েতে অধিক সঙ্কর বস্তু উৎপন্ন হয় তখন সে কার্য্য নিশ্চিত ব্যবস্থানুসারেই হয়।

॥৫॥ ইহাতে বোধ হয় যে এ বিদ্যা দুই প্রকার অর্থাৎ বস্তু ও তাহার স্বাভাবিক গুণবিষয়ক এবং সেই২ বস্তুর পরস্পর লয়বিষয়ক।

॥৬॥ কিন্তু এই বিদ্যাজ্ঞানার্থে দ্বিতীয় প্রকরণ প্রথম শিক্ষা করিতে হইবেক যেহেতুক বস্তুসকল যে২ ব্যবস্থানুসারে ও যে২ মতানুসারে সংলীন হয় তাহা না জানিলে মূলবস্তু কিম্বা সঙ্কর বস্তুর গুণ জানা অসাধ্য অতএব সেই ব্যবস্থা প্রথম কথয়িতব্য। কএক নিশ্চিত প্রভাবদ্বারা বস্তুসকল লীন হয় সে প্রভাব নানা প্রকার এতএব এই পুস্তকের দুই ভাগ হইবে। প্রথমতঃ কিমিয়া প্রভাব দ্বিতীয়তঃ বস্তুবিষয়ক।"

পুস্তকখানির ভাষার প্রাঞ্জলতা এই উদ্ধৃতি হইতে লক্ষ্য করা যায়। এই পুস্তকের ইংরেজী ভূমিকা এই :

> Mr. Marshman having proposed, some years ago, to publish an original series of elementary works on History and Science, for the use of Youth in India, I counted it a privilege to be associated with him in the undertaking, and cheerfully promised to furnish such parts of the series as were more intimately connected with my own studies. Other engagements have retarded the execution of our project, much against our will. He has therefore been able to do no more than bring out the first part of his Brief Survey of History ; and now, at length, I am permitted to add to it, this first volume of the Principles of Chemistry.
>
> The science of Chemistry deserves an early place in such a course as we have proposed, both because of the extremely interesting and profitable insight which it affords into the chief phenomena of terrestrial nature, and because of the readiness with which it may be studied and comprehended, without a previous familiarity with mathematics. It is open to all who can read, and who comprehend the rules of arithmetic.
>
> But perhaps it was more accident than design, that determined my choice of Chemistry as the subject of my first contribution ; for I happened to have materials in greater readiness for a treatise on it, than for one on any other branch of science. Indeed the following work is composed merely of the notes of that

course of Chemical Lectures, which I have repeatedly delivered both in English and Bengalee in Serampore College, and twice in English in Calcutta. They were first composed many years ago, and have since been continually under revision.

The arrangement adopted in these Principles is generally that pointed out by Davy, Brande, and Ure. It does not therefore require any defence from me; but I may observe, that to it I was myself indebted for the first distinct conceptions I ever received of Chemical theory, although I had attended a long course of lectures and read considerably on the science, before I happened to meet with it. It was not in vogue with Dr. Hope and Dr. Murray, my first guides in Chemical study.

It may be thought that Chemistry "in sport" would have been more suitable than Chemistry in stiff methodical dress, for the youth of India; and I am not much inclined to dispute the point. But it must be remembered that hitherto there has been no Chemistry in Bengalee at all; and it appeared to me necessary that its materials and doctrines should be brought into being in a regular manner, before they could be well played with as toys. For, be it understood, the native youth of India are those for whom we chiefly labour; and their own tongue is the great instrument by which we hope to enlighten them. Moreover, I have no faith in the sportive powers of my own pen. When I have gone through the serious drudgery of preparing the way, others may come after me tripping as merrily and fantastically as they choose, and I shall be happy to witness their gambols.

It has not been thought worthwhile, to quote authorities for statements made in this work, because few assertions will be found in it capable of dispute, and therefore standing in need of support. It is entirely an original compilation; but yet its contents are all derived from well known authors, and are so well established that no string of names could add to their credibility. The systematic authors whom I have most consulted are Murray, Henry, Brande, Ure and Turner; and to the last I am peculiarly

indebted for the numerical expressions of Chemical equivalents, specific gravities, and such like. I have also made very free use of his valuable exposition of the laws of chemical affinity.

In composing this volume, my primary object has been to introduce Chemistry into the range of Bengalee literature, and domesticate its terms and ideas in this language. The attempt will be generally acknowledged to have been attended with no small difficulty. I found it difficult even to choose a scheme of translation. The processes of the science, indeed could be expressed only by the popular terms which most nearly described them ; but in many cases, the chemical application of these terms, as was the case originally in European languages, is perfectly new ; and future conventional use can alone make them synonymous with the corresponding English terms. The names of chemical substances are in the great majority of instances, perfectly new to the Bengalee language ; as they were but a few years ago to all languages. In giving these new substances Bengalee names, the chief difficulty was to determine, whether the European nomenclature should be merely put into Bengalee letters, or the European terms be entirely translated by Sungskrit, as bearing much the same relation to Bengalee as the Greek and Latin, (from which the European terms are derived,) do to the English. The latter mode was urged upon me by several friends whose opinion I highly respect ; but I could not persuade myself to adopt it, for these two reasons :—

First, that our European terms have been taken from our ancient languages for the very purpose of preventing the confusion which must arise from as many different names being applied to the same thing as there are languages, in which it is spoken of ; and secondly, that it is a mistake to suppose, that any good will be done by accurate translations of scientific names, since so many of them, as far as their derivative import is concerned, are totally misapplied, and the translation of them therefore would only be giving currency to error. Thus the word oxygen might have been very neatly rendered অম্লজান (umlujan, the producer

of acidity) ; but the result would have been that the exploded idea of oxygen being necessary to the production of acidity would have been embodied in the new word,

I have preferred therefore expressing the European terms in Bengalee characters and merely changing the prefixes and terminology so as decently to incorporate the new words into the language.

I regret that of the terminology I have not in every case been sufficiently careful ; but perhaps a future opportunity of correction may be afforded me. The Sangskrit prefixes are happily so like the Greek that are naturally substituted for them, and cause no obscurity.

My second object has been, to condense the greatest possible quantity of information into the fewest possible words. In fact, the work is better calculated for a companion to the lecture-room, than an independent treatise. Its style may be censured, therefore, as much to bald and concise. It may be so, but utility, and not taste, has been my aim.

It will be seen that my task is but half finished. The Metals, and Organic Chemistry, are reserved for a second volume, which will go to press immediately.

When Chemistry has been completed, I hope to follow it with Astronomy, and that with Mechanics ; which, if life and opportunity are granted me, will be succeeded by other branches of Physics.

In issuing this little work there are two persons whom I cannot refrain from associating with its production. The first is my venerable friend Dr. Carey, from whom I derived the greatest assistance and encouragement in my earlier attempts at chemical translation, and whose ardent sympathy I have always enjoyed in every liberal and useful pursuit. The second is James Douglas Esq. of Cacers in Scotland, to whose enlightened generosity Serampore College is indebted for its well furnished laboratory of chemical apparatus. He devoted 500—to this purpose, just at the time when I was selected, as its first European Teacher ; and

his liberal gift had no small share in determining so much of my preparatory studies to the subject of the present volume, I trust it will be gratifying to him to see this small proof, that we have not altogether neglected the fulfilment of his wishes in the instruction of Indian Youth; and I would beg to offer it to him, as a mark of my gratitude for the means with which his kindness furnished me both of cultivating and diffusing useful knowledge.

রচনার নিদর্শন

"॥১৯৯॥ সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত অক্সিজান এই২ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ লৌহা কিম্বা মৃত্তিকার রিটোর্টের মধ্যে মাঙ্গানেসের কালা অক্সিদ অগ্নিময় করণেতে কিম্বা কাঁচের রিটোর্টের মধ্যে সেই অক্সিদের অর্দ্ধ পরিমিত শক্ত গান্ধকিকাম্ল তাহাতে দিয়া বাটীর উপর তাহা উত্তপ্ত করণেতে কিম্বা লোহা বা মৃত্তিকার রিটোর্টের মধ্যে সোরা লবণ অগ্নিময় করণেতে। কিন্তু অতি নির্ভাজ অক্সিজান যদি চাহা যায় তবে কাঁচের রিটোর্টের মধ্যে পতাষের খ্লোরায়িত উত্তপ্ত করণেতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং সেই কার্য্যেতে পতাষ এবং খ্লোরিক অম্লের মধ্যে যত অক্সিজান লীন হইয়া থাকে তাহা সকল পৃথক হইয়া রিটোর্টের মধ্যে কেবল পতাষিয়মের খ্লোরিদ অবশিষ্ট থাকে।

॥২০০॥ অক্সিজান অত্যল্পরূপে জলে নিবিষ্ট হইতে পারে। একশত ঘন ক্রল পরিমিত জল স্ফোটনেতে আকাশহীন হইলে তাহাতে যদি অক্সিজান কএক ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখা যায় তবে সামান্য আকাশের ভার চাপায়নের দ্বারা ৩.৫৫ ক্রল নিবিষ্ট হয়। অপর অত্যন্ত চাপায়নের দ্বারা জলের অর্দ্ধপরিমিত অক্সিজান জল নিবিষ্ট হইতে পারে।

॥২০১॥ অক্সিজান সামান্য আকাশ হইতে ভারি আছে। তের্মোমেতর ৬০ আর বারোমেতর ৩০ অংশে থাকিলে ১০০ ঘন ক্রুল পরিমিত অক্সিজানের পরিমান ৩৩.৮৮৮ যব ভার হইবেক। সামান্য আকাশের গুরুত্ব যদি এক কহা যায় তবে অক্সিজানের স্বাভাবিক গুরুত্ব ১.১১১১ হইবেক।

॥২০২॥ অক্সিজান আকাশ দহন পোষক হয় এবং বাতী কয়লা গন্ধক ফোস্ফোরস এবং লোহার গুণ এবং অন্যান্য দহনীয় বস্তু সকল অক্সিজানের মধ্যে অধিক তেজ্বালরূপে দগ্ধ হয়।

॥২০৩॥ অক্সিজান আকাশের মধ্যে প্রায় কোন বস্তু দগ্ধ হইলে সেই আকাশ দগ্ধ বস্তুতে লীন হওয়াতে তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় কিন্তু ঐ রীতির বৈপরীত্য কয়লা অক্সিজান আকাশের মধ্যে দগ্ধ হইলেও আকাশের কিছু হ্রাস হয় না।

॥২০৪॥ অনেক২ বস্তু অক্সিজান আকাশে দগ্ধ হইলে আরো অধিক ভারি হয় এবং ঐ ভারির বৃদ্ধি হ্রসিত অক্সিজানের ভারের সমান হইবে।

॥২০৫॥ কতক২ বস্তু অক্সিজান আকাশের মধ্যে দগ্ধ হইলে সেই বস্তুর ভারের হ্রাস হয় এবং অক্সিজান ষোল আনা লুপ্ত হইলে নূতন এক বস্তু উৎপন্ন হয়। অঙ্গার কিম্বা গন্ধক কিম্বা ফোস্ফোরস অক্সিজান আকাশের মধ্যে দগ্ধ হইলে এইরূপ কার্য্য হয়।

॥২০৬॥ কোন দহনীয় বস্তু আর অক্সিজানের পরস্পর লয়েতে যে প্রত্যেক নূতন বস্তু উৎপন্ন হয় তাহা অম্ল কিম্বা অক্সিদ। অম্ল এই প্রকার বস্তু বিশেষতঃ তাহার স্বাদু টক এবং তাহাতে ঘাসের রসেতে নীলবর্ণ বস্তু লালবর্ণ হয় ও তাহা ক্ষার বস্তুতে লীন হইয়া তাহার ক্ষারত্ব নষ্ট করে। অম্ল যে মূল বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় অক্সিদ সেই মূল হইতেও উৎপন্ন কিন্তু অক্সিদ অম্লাপেক্ষা অল্প অক্সিজান প্রাপ্ত হওয়াতে অম্লতা প্রাপ্ত হয়

না। অক্সিদ আর অম্ল পরস্পর লীন হইলে লবণীয় নামক অশেষ প্রকার বস্তু উৎপন্ন হয়।

॥২০৭॥ কোন২ বস্তু অক্সিজানের দুই নিশ্চিত ভাগে লীন হইয়া যদি সেইরূপে দুই নিশ্চিত অম্ল জন্মায় তবে যে অম্লেতে অধিক অক্সিজান হয় সেই ইক্‌প্রত্যয়ান্ত হইবেক এবং যে অম্লেতে অল্প অক্সিজান হয় তাহার প্রত্যয়ান্ত হইবেক। অক্সিজানের সাহিত কোন এক বস্তু লীন হওয়াতে দুই অম্ল হইতে অধিক অম্ল যদি জন্মিয়া থাকে তবে সেই সকল অম্ল নামের অগ্রে উপসর্গ যুক্ত হওয়াতে শ্রেণী পূর্ব্বক তাহা নিশ্চয় করা যায়। যথা গন্ধক ও অক্সিজান পরস্পর লীন হওয়াতে তিন প্রকার অম্ল উৎপন্ন হইতে পারে বিশেষতঃ গান্ধবিকাম্ল এবং গান্ধকাম্ল ও উপগান্ধকাম্ল (৫৬ ধারা দেখ)।

॥২০৮॥ কোন ক্ষারেতে এই প্রকার বিশেষ অম্ল লীন হওয়াতে যে সকল লবণীয় বস্তু জন্মে সেই সকল লবণীয় বস্তুনামের শেষ বর্ণরূপ ধারাতে নিশ্চিত আছে। যথা ইক্‌ প্রত্যয়ান্ত অম্লেতে যে লবণীয় বস্তু উৎপন্ন হয় তাহা য়িত প্রত্যয়ান্ত হয় এবং য় প্রত্যয়ান্ত অম্লেতে যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহা ইত প্রত্যয়ান্ত হয়। যথা পতাষ ক্ষারেতে উপরি লিখিত তিন প্রকার অম্ল লীন হইলে তিন বিশেষ লবণ উৎপন্ন হয় সে সকল পতাষের গন্ধকায়িত ও পতাষের গন্ধকিত এবং পতাষের উপগন্ধকিত নামে বিশেষরূপে বিখ্যাত আছে।

॥২০৯॥ সেইরূপেও অক্সিজান কোন বস্তুর নানা ভাগেতে লীন হইলে সেই বস্তুর নানা প্রকার নিশ্চিত অক্সিদ উৎপন্ন হইতে পারে। অপর যে অক্সিদের মধ্যে অত্যল্প অক্সিজান থাকে তাহার সংজ্ঞা প্রথমাক্সিদ ও যাহাতে তাহা হইতে অধিক অক্সিজান হয় তাহার সংজ্ঞা দ্বিতীয়াক্সিদ ও তাহা হইতে অধিক অক্সিজান হইলে তৃতীয়াক্সিদ হয়

ইত্যাদি এবং যে অক্সিদের মধ্যে অধিক অক্সিজান থাকে তাহার নাম পরমাক্সিদ যেহেতুক ইহা হইতে সেই বস্তুর আর অধিক অক্সিদ জন্মে না।

॥২১০॥ অক্সিজান আকাশ-প্রাণি-সকলের জীবন পোষক। সামান্য আকাশের মধ্যেস্থিত অক্সিজানের নিশ্বাস আকর্ষণেতে তাবৎ জীব-জন্তু বাঁচিয়া থাকে এবং কোন প্রাণী সামান্য আকাশের নিশ্চিত পরিমাণে বদ্ধ হইলে নিশ্চিত কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে কিন্তু অক্সিজানের এমত পরিমাণে অধিক কাল বাঁচিবে।"—কিমিয়া বিদ্যার সার, পৃ. ১৩৭-৯

মধুসূদন গুপ্ত

(?—১৮৫৬)

উনবিংশ শতাব্দী ভারতবর্ষের, শুধু ভারতবর্ষের কেন সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে একটি গৌরবময় যুগ। তবে ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা বলা যায় বিশেষ করিয়া। কেননা পরাধীন অবস্থায়ও আমরা নূতনকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইতে পরাঙ্মুখ হই নাই। শল্যবিদ্যা ভারতের এক প্রাচীন বিদ্যা। মৃত নরদেহে অস্ত্রোপচার করিয়া সূক্ষ্ম অংশ পরীক্ষা না করিলে শল্যবিদ্যা নিরর্থক। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যার মত শল্যবিদ্যাও আমরা চর্চ্চার অভাবে ভুলিতে বসি। শুধু ভুলিয়া গেলে ক্ষতি ছিল না, যত ক্ষতি মৃত নরদেহে অস্ত্রোপচারে 'পাপবোধ' জন্মানোয়।

এই পাপবোধের মূলে কুঠারাঘাত, সে কি সামান্য কথা? আজ হয়ত একথা শুনিয়া আমরা হাসিব; কিন্তু সোয়া শ' বৎসর পূর্ব্বে এমনটি ছিল না। তখন শবব্যবচ্ছেদের, অর্থাৎ মৃত মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার বা কাটাকুটি এক ভীষণ পাপের ব্যাপার ছিল! ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত। তিনি অগ্রণী হইয়া মেডিক্যাল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ করেন। তখন আমাদের একটি বহুকালপোষিত কুসংস্কারে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল, আর ইহার ফলে আমাদের সম্মুখে এক নূতন জগৎ খুলিয়া যাইবারও পথ পাইল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপযোগিতা এবং উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া দেশবাসী এক অভিনব পথে প্রবেশ

করিলেন। মধুসূদনের এই যুগান্তকারী কৃতিকে সরকারী ভাবে স্বীকৃতি দান করা হয় ১৮৪৯ সনে, প্রথম শবব্যবচ্ছেদ-কার্য্যের ঠিক তের বৎসর পরে। শিক্ষা-সমাজের ("Council of Education") সভাপতি, বড়লাটের আইন-সচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে মধুসূদন গুপ্তের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার সময়ে আবেগপূর্ণ সুললিত ভাষায় এই কৃতির বিষয় নিম্নরূপ উল্লেখ করিয়াছেন:

> "I have had the scene described to me. It had needed some time, some exercise of the persuasive art, before Modusuden could bend up his mind to the attempt; but having once taken the resolution, he never flinched or swerved from it. At the appointed hour, scalpel in hand, he followed Dr. Goodeve into the godown where the body lay ready. The other students, deeply interested in what was going forward but strangely agitated with mingled feelings of curiosity and alarm, crowded after them, but durst not enter the building where this fearful deed was to be perpetrated; they clustered round the door; they peeped through the jilmils, resolved at least to have ocular proof of its accomplishment. And when Modusuden's knife, held with a strong and steady hand, made a long and deep incision in the breast, the lookers-on drew a long gasping breath, like men relieved from the weight of some intolerable suspense."*

এই উদ্ধৃতিতে মধুসূদন গুপ্ত কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম শবদেহে অস্ত্রোপচারের কথা বেথুন বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তখন ছাত্রদের মধ্যেও চারি জন শবব্যবচ্ছেদে অগ্রসর হন। একথা একটু পরে আমরা জানিতে পারিব।

এই শবব্যবচ্ছেদ ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছিল

---

* *Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, from* 1835 *to 1851*. By J. Kerr, Part II, 1853. Pp, 210, *foot note*.

যে, তখন এ উপলক্ষ্যে কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়মে তোপ পড়িয়াছিল। ইহার উল্লেখ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাদিতে পাই নাই বটে, কিন্তু ইহা এতই প্রচলিত হইয়াছিল যে, এখনও লোকে অত্যন্ত গর্ব্বভরে একথা বলিয়া থাকে।

২

গত শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এদেশে উচ্চতন চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। কলিকাতায় 'স্কুল ফর নেটিব ডক্টরস' নামে একটি স্কুল ছিল। সেখানে হিন্দুস্থানী ভাষায় পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেসব ইংরেজ ডাক্তার ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া এই স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রেরা চিকিৎসাকার্য্যে সহায়তা করিত। অবশ্য তাহারা সকলেই সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইত। পরে, কলিকাতা মাদ্রাসায় মেডিক্যাল ক্লাস এবং সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণী খোলা হয় (ডিসেম্বর, ১৮২৬)। এখানে ইংরেজীতে লিখিত চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তক যথাক্রমে আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হইত এবং ছাত্রেরা এই সকল অনুবাদ-গ্রন্থের মাধ্যমে চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হইত। সংস্কৃত কলেজসন্নিহিত এক বাটীতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক শিক্ষাদানার্থ একটি হাসপাতাল খোলা হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে। সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন প্রথমাবধি পণ্ডিত খুদিরাম বিশারদ। এখানকার মেডিক্যাল লেকচারার ছিলেন ডাঃ জন গ্রান্ট। উক্ত হাসপাতালে গিয়া ছাত্রেরা গ্রান্টের বক্তৃতা শুনিতেন।

মধুসূদন গুপ্ত সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর একজন প্রখ্যাত ছাত্র। তিনি বৈদ্যক বা চিকিৎসাশাস্ত্রে অনন্যতুল্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অধ্যাপক খুদিরাম বিশারদ ১৮২৯ সনের প্রায় মাঝামাঝি হইতে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ছাত্রদের পড়ায় ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে। ইতিপূর্ব্বেই বৈদ্যক শ্রেণীর প্রধান ছাত্র মধুসূদন গুপ্তের পাঠোৎকর্ষ কর্তৃপক্ষেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহারা মধুসূদনকে ১৮৩০, মে মাস হইতে মাসিক ষাট টাকা বেতনে বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক পদে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার এই পদে নিয়োগ হেতু ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সংবাদপত্রের স্তম্ভেও এই বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে।* কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, মধুসূদন স্বীয় পদে বহাল রহিলেন। তাঁহার নিয়োগে যে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ ভুল করেন নাই, মধুসূদনের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল।

মধুসূদন ১৮৩৫ সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এই পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানদ্বয়—কলিকাতা মাদ্রাসা ও গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যথাক্রমে আরবী ও সংস্কৃতের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন ছিল ইংরেজী গ্রন্থাদি হইতে এই দুই ভাষায় অনুবাদের রেওয়াজ। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই এই অনূদিত গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া পাঠ করিত। প্রায় সব বই-ই গুদামজাত হইয়া অকেজো অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। ১৮৩৪ সনে চার্লস সি. ট্রেভেলিয়ান হিসাব করিয়া দেখান যে, সরকারের শিক্ষা-খাতের কয়েক লক্ষ টাকা এইরূপে আটক পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ অন্য কাহিনী। বৈদ্যক শ্রেণীতে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন-

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩য় সং, পৃ ৬, ৭।

সৌকর্য্যার্থে মধুসূদনকেও ইংরেজী বৈদ্যক-গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিতে হয়। তিনি হুপারের "An tomist Vademecum" সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। এই পুস্তকখানি ১৮৩৫ সনের জানুয়ারী নাগাদ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল। মধুসূদন এই পুস্তক লিখিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সহস্র টাকা পুরস্কার পান।*

৩

স্কুল ফর নেটিব ডক্টর্‌স, কলিকাতা মাদ্রাসার মেডিক্যাল ক্লাস কিংবা সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণী—কোন স্থলেই উন্নততর চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষাদানের সুযোগ ছিল না, অথচ তখন এদেশীয়দের পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইবার আবশ্যকতা সরকার নিজ প্রয়োজনেই বিশেষ ভাবে অনুভব কবিতেছিলেন। বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ জন গ্রাণ্ট, জে. সি. সি. সাদার্লণ্ড, সি. সি. ট্রেভেলিয়ন, ডাঃ মণ্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি এবং দেওয়ান রামকমল সেন—এই পাঁচ জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন, উদ্দেশ্য—তাৎকালিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুসন্ধান এবং উন্নততর শিক্ষা প্রবর্তনের উপায়-নির্ণয়। কমিটি কিছুকাল অনুসন্ধানান্তর এই মর্ম্মে রিপোর্ট দিলেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষাদানের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া একটি কলেজ স্থাপনের দিকে যেন সরকার অবিলম্বে মনোযোগী হন। বড়লাট বেণ্টিঙ্ক এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ১৮৩৫, ২৮শে জানুয়ারী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত

* কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ. ৩৬। ১৩৫৫ সাল।

ঘোষণা করিলেন। পরবর্ত্তী ১লা মার্চ্চ হইতে অধ্যাপক নিয়োগ, ছাত্র-সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য সুরু হইল। ডাঃ ব্রামলি অধ্যক্ষ, ডাঃ হেন্‌রি হারি গুডিব শারীরবিদ্যা (Anatomy) ও শল্যবিদ্যার (Surgery) অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। মধুসূদন গুপ্ত ১৭ই মার্চ্চ ১৮৩৫ হইতে এক শত টাকা মাসিক বেতনে উক্ত বিষয়দ্বয়ের 'ডিমনস্ট্রেটব'-এর পদ লাভ করিলেন।

১৮৩৫, ১লা জুন ডাঃ ব্রামলি একটি প্রারম্ভিক বক্তৃতার দ্বারা কলেজেব পাঠনা আরম্ভ করেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর পুনরায় কলেজের অধ্যাপনা সুরু হয় পরবর্ত্তী ২৮শে অক্টোবর। বিভিন্ন বিভাগেই পঠন-পাঠন চলিতে লাগিল। শবব্যবচ্ছেদ সুরু হইতে আরও এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। পূর্ব্বে মৃত পশু-দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া ছেলেদের শারীরবিদ্যা বা এনাটোমী শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ইহাতে নরদেহের সমস্ত তথ্য জানা সম্ভবপর নয়। শবব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে এদেশীয়দের মনে তখন ঘোরতর কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। কিরূপে এই কুসংস্কার বিদূরণে শারীরবিদ্যার সহ-অধ্যাপক অগ্রণী হইয়াছিলেন, বেথুন তাহাব চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন; এবং ইতিপূর্ব্বেই তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মেডিক্যাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রামলিও ২৮শে অক্টোবর ১৮৩৬ তারিখের এই প্রথম শবব্যবচ্ছেদের একটি সুন্দর তথ্যপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মধুসূদন গুপ্তের নামোল্লেখ করেন নাই বটে, তবে তাহাতে তাঁহার প্রথম শবব্যবচ্ছেদের গৌরবের এতটুকুও অপহ্নব হয় না। ডাঃ ব্রামলি-প্রদত্ত বিবরণের কিয়দংশ এখানে দিলাম :

"On that day [28th October, 1836], which may be regarded as an eventful era in the annals of the Medical College, four of the most intelligent and respectable pupils, at their own solicitation,

undertook the dissection of the human subject, and in the presence of all the professors of the College and of fourteen of their brother-pupils, demonstrated with accuracy and nicety, several of the most interesting parts of the body, and thus was accomplished, through the admirable example of these four native youths, the greatest step in the progress towards true civilization which education has as yet effected. At the first attempt, all their companions present assisted, and it was delightful to witness the emulation amongst them, in displaying their willingness to recognise the importance of, and adopt a mode of study hitherto contemplated with such honour by their own countrymen . . ."*

ডাঃ ব্রামলির এই উক্তির সঙ্গে বেথুনের কথাগুলি এখানে কতকটা যাচাই করিয়া লওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেথুন মধুসূদন গুপ্তকে প্রথম শবব্যবচ্ছেদের সম্মান দিয়াছেন। ডাঃ ব্রামলি উপরের উদ্ধৃতিতে মধুসূদনের নাম উল্লেখ করেন নাই সম্ভবতঃ এই কারণে যে, তিনি শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন, এবং মধুসূদনের পক্ষে শবব্যবচ্ছেদ অত্যন্ত স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু বেথুনের এবং ব্রামলির বিবরণ দুইটির মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। বেথুন বলেন, ডাঃ গুডিব-সমভিব্যাহারে মধুসূদন গুদামে গিয়া শবব্যবচ্ছেদ করেন, ছাত্রগণ অবাক্ বিস্ময়ে দরজা-জানালার ফাঁক দিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু ডাঃ ব্রামলি পরিষ্কার বলিতেছেন যে, কলেজের চারি জন উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান ছাত্র অন্য ছাত্রদের সহযোগিতায় অধ্যাপকগণের সম্মুখে সর্ব্বপ্রথম অতি নিপুণতার সহিত শবব্যবচ্ছেদ করে। এই কার্য্য সম্পাদিত হয় ১৮৩৬ সনের ২৮শে অক্টোবর।

---

* *Report of the General Committee of Public Instruction of the Presidency of Fort William in Bengal for the year. 1836.* Pp. 54-5.

ইহার অল্পকাল পরে শিক্ষাবিষয়ক জেনারাল কমিটিকে কলেজ-সংক্রান্ত কার্য্যাবলীর বিবরণ দান প্রসঙ্গে ডাঃ ব্রামলি উক্ত চারি জন ছাত্রের কৃত কর্ম্মের কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। মধুসূদন বাদে বেথুনের অপেক্ষা ব্রামলির অন্য সব কথাই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া মনে করি।

একটি কথা উঠিতে পারে, দুই তারিখে দুইটি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কিনা। কিন্তু এরূপ ধারণা করিবার কারণ দেখি না। দুই দিনে দুইটি কার্য্য সম্পাদিত হইলে—এবং ইহা যুগান্তকারী বলিয়া ব্রামলি ও বেথুন দুই জনেই উল্লেখ করিয়াছেন—ব্রামলি প্রদত্ত বিবরণে নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ থাকিত। অধিকন্তু হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ জে. কার তাঁহার ইংরেজী পুস্তকের* 'মেডিক্যাল কলেজ' অধ্যায়ে উক্ত এক তারিখের কথাই বলিয়াছেন। তবে ইহা অসম্ভব নয় যে, একই দিনে পর পর এই দুইটি কার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, মধুসূদনের কৃতি সম্পর্কে ডাঃ ব্রামলি উল্লেখ না করিলেও আমরা এখানে বেথুনের কথাকেই মান্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কার-ও নিজ গ্রন্থে ডাঃ ব্রামলির উক্তিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বেথুনের কথাও পাদটীকায় দিয়াছেন; তিনি এ বিষয়ে কোন আলোচনা বা মন্তব্য করেন নাই। ডাঃ ব্রামলির বিবরণে উক্ত চারি জন ছাত্র যথাক্রমে—উমাচরণ শেঠ, রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং নবীনচন্দ্র মিত্র।†

---

* *Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, from* 1835 *to 1851*. P. 210.

† "Early Years of the Calcutta Medical College"—*The Modern Review* for September and October, 1947, দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধে বর্ত্তমান লেখক কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম দিক্‌কার ইতিহাস সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র দৃষ্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৪

মধুসূদন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। মধুসূদনের উৎসাহ ও ধৈর্য্য ছিল অপরিসীম। কলেজে শিক্ষকতা কালে তিনি অন্য ছাত্রদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় রীতিমত অধ্যয়ন করেন। ১৮৪০ সনের নবেম্বর কলেজের উচ্চতম শ্রেণীর যে শেষ পরীক্ষা হয় তাহাতে মধুসূদন উপস্থিত হইয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। জেনারাল কমিটির রিপোর্ট হইতে মধুসূদনের বিষয় এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

Anatomy and Physiology

* * *

Modhusudun Goopto (Teacher) Qualified.

Theory and Practice of Surgery

Modhusudun Goopto (Having commenced English late in life had some difficulty in expressing himself, but his answers were correct. Qualified).

Theory and Practice of Physic

Modhusudun Goopto Qualified.

Medical Chemistry, Botany, Materia Medica and Pharmacy

Modhusudun Goopto Qualified

Practical and Surgical Anatomy.

Demonstration with Dead Bodies

Modhusudun Goopto Qualified.*

১৮৪০-৪১ সন নাগাদ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে কি কি বিষয় অধীত হইত, এই ফিরিস্তি হইতে তাহা জানা যাইতেছে। মধুসূদন গুপ্ত সকল বিষয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরীক্ষকগণের উপরের মন্তব্য হইতে জানা যায়, তিনি অধিক বয়সে ইংরেজী শিখিতে

---

* *Report of the General Committee of Public Instruction, etc.,* for 1840-1. P. 79.

আরম্ভ করেন বলিয়া এ ভাষায় তেমন ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন নাই, তথাপি উত্তরপত্র যথাযথ হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া ধরিয়া লন।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় (১৮৪০) উত্তী হইয়া অন্যান্য ছাত্রদের মত মধুসূদনও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। সার্টিফিকেটখানি ইংরেজী, আরবী এবং বাংলা এই তিনটি ভাষায় পাশাপাশি লেখা। এসেসর, পরীক্ষক এবং কলেজের অধ্যাপক মোট সাতাশ জনের স্বাক্ষর রহিয়াছে এই সার্টিফিকেটখানিতে। বাংলা অংশ এখানে দিলাম :

"আমরা মনোযোগপূর্ব্বক সম্যক্ প্রকারে ইং ১৮৪০ নবেম্বর মাসের ২৬ দিনে বৈদ্যবাটী নিবাসী মধুসূদন গুপ্তের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে প্রশংসাপত্র দিতেছি। ইনি শারীরবিদ্যা, দ্রব্যতত্ত্বজ্ঞান, দ্রব্যগুণ ও কিমিয়া বিদ্যা এই সকল বিষয়েতে বিশেষ নিপুণ এবং ঔষধ প্রস্তুত করণে ও তদ্ব্যবহারে আর অস্ত্রবিদ্যা ও তচ্চিকিৎসাকর্ম্মে প্রকৃত উপযুক্ত হইয়াছেন ইহাতে ইনি রাজকীয় চিকিৎসক সাধারণের পদপ্রাপ্ত হইতে পারেন এবং সহকার ব্যতিরেকে স্বয়ং তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

উক্ত ব্যক্তির বাঙ্গলাদেশীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অধ্যায়নারম্ভাবধি একাল পর্য্যন্ত সুশীলতায় ও পরিশ্রমেতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

সে যুগের বিখ্যাত চিকিৎসকগণকে লইয়া কলেজের পরীক্ষক বোর্ড গঠিত হইত। পরীক্ষান্তে ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফলের কথা জানাইয়া বোর্ড জেনারাল কমিটিকে একটি বিবরণ পাঠাইতেন। কমিটি ইহার উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রদের ডিপ্লোমা দিতেন, সরকারকেও অনুরোধ জানাইতেন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের যথাযথ পুরস্কৃত করিতে। এবারের রিপোর্টে (১৮৪০-৪১, পৃ. ৮২) জেনারাল কমিটি লিখিলেন :

"The Generel Committee of Public Instruction confirmed the Report of the Examiners and Assessors of the Medical College and College Diplomas were given to the seven students named in the margin. Modhusudun Goopto and Nava Krishna Goopto and the five other youngmen retained their situations in the Medical College, were reported to the Medical Board, and to the Government, as being available for the public service as sub-assistant surgeons."

জেনারাল কমিটি রিপোর্টে বলেন যে, উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে মধুসূদন গুপ্ত প্রমুখ সাত জন তখনও মেডিক্যাল কলেজের কর্ম্মে লিপ্ত। তাঁহারা মেডিক্যাল বোর্ড এবং গবর্ণমেণ্টকে জানান যে, তাঁহারা সাব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রূপে সব সময়েই এই কর্ম্মীদের পাইতে পারেন। মধুসূদন এই পদে উন্নীত হইলেও কখনও কর্ম্মব্যপদেশে অন্যত্র যান নাই; আমৃত্যু মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম শিক্ষক-কর্ম্মীই তিনি রহিয়া গেলেন।

৫

ইংরেজ অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন বিটিশ সৈন্য-ঘাটির সংখ্যা বাড়াইতে হইল, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ প্রজার চিকিৎসাদিরও ব্যবস্থা করার প্রয়োজন অনুভূত হইল। এই দুই কারণেই মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে ১৮৩৯ সনে একটি হিন্দুস্থানী ক্লাস বা শ্রেণী খোলা হইল; এখানে চিকিৎসাবিদ্যার বিষয়সমূহ মাতৃভাষা হিন্দুস্থানীর মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ছাত্রদের মোটামুটি শিখাইয়া দেওয়া হইত। এই হিন্দুস্থানী ক্লাস 'মিলিটারি ক্লাস' এবং 'সেকেণ্ডারি ক্লাস' নামেও আখ্যাত হইতে থাকে। কর্তৃপক্ষ এই শ্রেণীর কার্য্যের উৎকর্ষ বিধানে মনোযোগী হইয়া ১৮৪৩-৪ সনে ইহা পুনর্গঠিত করেন, এবং মধুসূদন গুপ্তের উপর ইহার তত্ত্বাবধানের ভার দেন।

মধুসূদন মেডিক্যাল কলেজের 'ডিমনষ্ট্রেটর অফ এনাটমি এণ্ড সার্জ্জারি' পদে পূর্ব্ববৎ বহাল রহিলেন। ইহার সঙ্গে তিনি এই বিভাগ পরিচালনায় গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার এই নূতন পদের নাম হইল 'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ দি সেকেণ্ডারী ক্লাস।' মধুসূদনের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে অস্ত্রোপচার তথ্য শবব্যবচ্ছেদাদিও এই শ্রেণীর ছাত্রগণ এই সময় হইতে প্রথম আরম্ভ করিল। মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র অধ্যাপক এলান ওয়েব এই শ্রেণীর 'ভিজিটর' বা পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন।*

বাংলা, উর্দ্দু প্রভৃতি দেশভাষায় চিকিৎসা-বিষয়ক পুস্তক অনুবাদ ও সংকলনে সরকারীভাবে উৎসাহ দেওয়ার কথা হয় ১৮৪৪ সন নাগাদ। বাংলা ভাষায় পুস্তক সংকলনের ভার লন মধুসূদন গুপ্ত। তিনি 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়া ছিলেন। ১৮৪৪-৫ সনের শিক্ষা-সমাজের (জেনারাল কমিটি ইত্যাদির পরিবর্ত্তে ১৮৪২ সন হইতে ইহা 'Council of Education' নামেই পরিচিত হয়) বার্ষিক রিপোর্টে এবিষয়টির এইরূপ উল্লেখ পাই :

> "There are at present in the press . . . as well as Bengalee translation of the London Pharmacopœa prepared by Pundit Modhusudun Goopto . . ."†

এই গ্রন্থখানি ১৮৪৯ সনে প্রকাশিত হয়।

মধুসূদনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও অধ্যাপনায় এবং 'পরিদর্শক' ওয়েবের চেষ্টা-যত্নে হিন্দুস্থানী শ্রেণীর ছাত্রগণ অধীতব্য বিষয়ে দ্রুত উন্নতি করিতে লাগিল। দুই বৎসরের মধ্যে ইহার বিশেষ পরিচয়ও

---

* *Report of the General Committee of Public Instruction*, etc., for 1843-44. P. 67.

† ঐ পৃ. ২৩

পাওয়া গেল। শিক্ষা-সমাজ ১৮৪৫-৪৬ সনে এই শ্রেণীর পরিচালনা ব্যাপারে অধ্যাপক ওয়েব এবং পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তের কৃতির কথা এইরূপ উল্লেখ করেন :

"The conduct, character, attendance, and attainments of the military class have been most satisfactory and much credit is due to Professor Webb and Pundit Modhusudun Goopto for the proficiency of the pupils in the important branch of study taught by them." *

এই শ্রেণীর 'ভিজিটর' অধ্যাপক এলান ওয়েব ১৯শে জানুয়ারী ১৮৪৬ তারিখে ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণানন্তর উচ্চতন কর্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে তিনি মধুসূদনের কৃতিত্বের কথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেন। এখানে ওয়েবের মন্তব্য হুবহু উদ্ধৃত হইল :

"They [the students] answered very satisfactorily upon the whole, and in a manner which reflects the highest credit upon their excellent teacher of Anatomy and Physiology, Baboo Modhusudun Gooptu; indeed it gave me sincere pleasure to observe in my daily visit at these dissections, that the zeal and exertions of the Baboo are quite at successful here in this first attempt to carry out regular dissections by the military class, (chiefly Mahommedans) as amongst the Hindoo students of the English class."†

এই হিন্দুস্থানী ছাত্রেরা ছিল অধিকাংশই মুসলমান। তাহাদের মধ্যেও শবব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার বলবৎ ছিল। অধ্যাপক ওয়েব শুধু মধুসূদনের অধ্যাপনা-নৈপুণ্যেরই প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, হিন্দু ছাত্রদের মত মুসলমান ছাত্রদেরও যে মধুসূদন শবব্যবচ্ছেদে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এ কারণেও তিনি তাঁহাকে বিশেষ সুখ্যাতি করিলেন। শিক্ষা-সমাজ পরবর্তী বার্ষিক

* ঐ, ১৮৪৫-৬, পৃ. ১১৮

† ঐ

রিপোর্টগুলিতে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হিন্দুস্থানী শ্রেণীর ছাত্রদের কৃতিত্বের কথা বলিতে গিয়া প্রতিবারই পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তের অধ্যাপনা, শবব্যবচ্ছেদ-পারিপাট্য এবং সুষ্ঠু পরিচালনার প্রশস্তি করিয়াছেন। ১৮৪৬-৪৭ সনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ছাত্রই মধুসূদন গুপ্ত-প্রদত্ত উর্দ্দু নোটগুলির উপর নির্ভর করিয়া ব্যবচ্ছেদ-কার্য্য করিয়া যাইত।* মধুসূদনের অধ্যাপনা-গুণে তাহারা শারীরবিদ্যা বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

৬

মধুসূদনের গুণপনায় কর্তৃপক্ষ যে মুগ্ধ ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা তাঁহাকে ১৮৪৮ সন নাগাদ প্রথম শ্রেণীর সাব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পদে উন্নীত করিলেন।† ইহার পর বৎসর, ১৮৪৯ সনে মধুসূদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ গোড়াতেই করিয়াছি। ঐ সময়ের বিখ্যাত শিল্পী মিসেস বেলনস মধুসূদনের একখানি তৈলচিত্র আঁকিয়া দেন। বেথুন সাহেব মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে ঐ বৎসরে এই তৈলচিত্রখানি উন্মোচন করেন। এই সময়ে তিনি মধুসূদনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করিয়াছিলেন। এ সব কথা আমরা আগেই পাইয়াছি।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্ভুক্ত হিন্দুস্থানী ক্লাস বা শ্রেণীর মত একটি বাংলা শ্রেণী বা বিভাগ খোলার আবশ্যকতাও ক্রমে কর্তৃপক্ষ অনুভব করিলেন। এ বিষয়ে ১৮৪৩ সনেই দেওয়ান

* ঐ, ১৮৪৬-৭, পৃ. ৯২

† ঐ, ১৮৪৮-৯, পৃ. ১১৯

রামকমল সেনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারী এবং মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ডাঃ এফ. জে. মৌএট একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসর পরে ১৮৫২ সনের প্রথমে কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন। তখন বাংলা দেশের বিভিন্ন সরকারী কেন্দ্রে, জেলা-শহরে, এমনকি অভ্যন্তর ভাগে গ্রামাঞ্চলেও চিকিৎসকদের প্রয়োজন নিতান্তই অনুভূত হইতেছিল। ১৮৫২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি বাংলা শ্রেণী বা বিভাগ খোলা হইল। হিন্দুস্থানী বিভাগের ন্যায় বাংলা বিভাগেরও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন মধুসূদন গুপ্ত। মেটিরিয়া মেডিকা বা ভৈষজ্য-সংহিতার অধ্যাপক হইলেন শিবচন্দ্র কর্ম্মকার; মেডিসিন বা ভেষজতত্ত্ব অধ্যাপনার ভার পড়িল প্রসন্নকুমার মিত্রের উপর। মধুসূদন স্বয়ং শারীরবিদ্যা বা এনাটমি এবং শল্যবিদ্যা শিক্ষার ভার লইলেন। ১৮৫২ সনে মধুসূদনের 'এনাটোমী বা শারীরবিদ্যা' শীর্ষক বাংলা পুস্তক বাহির হয়।

হিন্দুস্থানী বিভাগের মত বাংলা বিভাগেরও উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, ভেষজবিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা অনুবাদ ও সংকলনগ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইল। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ যেমন ঐ যুগে বিজ্ঞান-চর্চ্চার এক উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হইয়া উঠে, সেইরূপ কলেজের বাংলা বিভাগও বঙ্গভাষায় লিখিত সাধারণ বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক রচনায় নানাভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়। বাংলা বিভাগ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রেরা মফস্বল অঞ্চলে চিকিৎসক হইয়া যাইতেন; স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট তাঁহারা 'নেটিব ডাক্তার' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাংলা বিভাগ পরিচালনায় মধুসূদনের কৃতিত্বও বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

৭

মধুসূদনের কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান ঘটে ১৫ই নবেম্বর ১৮৫৬ দিবসে। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' (২০শে নবেম্বর, ১৮৫৬) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্য সংবাদ প্রদানকালে মধুসূদনের উদ্দেশ্যে একটি পংক্তিমাত্র লেখেন: "উক্ত কলেজের বাংলা ক্লাসের ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার বক্তৃতাকারক বাবু মধুসূদন গুপ্ত পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।" পরবর্ত্তী ২২শে নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' মধুসূদন গুপ্ত সম্পর্কে সবিস্তারে নিম্নরূপ লিখিয়াছেন:

"উক্ত গুপ্ত বাবুর মৃত্যু হইয়াছে ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, মধুসূদনবাবু এতদ্দেশীয় ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ব্যবসায়িগণের আদি-পুরুষ ছিলেন, এতদ্দেশীয়েরা বিশেষত হিন্দু জাতিরা মৃতদেহ স্পর্শ করিবেন দূরে থাকুক পিতামাতাদি আত্মীয় লোকের মৃত্যু হইলে যে স্থানে শব রাখে গোময় জলে সেস্থান পর্য্যন্ত ধৌত করেন, শব লইয়া গেলে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গোময় জলের ছিটা দেন, মৃত দেহের বিষয়ে অদ্যাপিও যে জাতির ঘৃণা ও পাপবোধ রহিয়াছে মধুসূদনবাবু সেই জাতির মধ্যে এক উত্তম কুলে জন্মিয়াছিলেন তথাচ মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দু জাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হন, তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যান্য হিন্দুরা মৃতদেহ কাটাকুটি কার্য্যে সুপটু হইয়াছেন। ঐ বাবুই তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন, মধুসূদন গুপ্ত স্বজাতীয় বৈদ্যক বিদ্যায় এবং ইংরেজী চিকিৎসা বিদ্যায় সুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যু সমাচারে ইংরেজ বাঙ্গালী সাধারণ বহু লোক আক্ষেপ করিবেন।"

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে মধুসূদনের সংস্রব ইহার

প্রতিষ্ঠা হইতে। দীর্ঘ বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত সাতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ জ্ঞানবুদ্ধি মত তিনি ছাত্রদের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ডাঃ টি. ডব্লিউ. উইলসন কলেজের ১৮৫৬-৫৭ সনের বার্ষিক বিবরণ দান প্রসঙ্গে মধুসূদনের মৃত্যু-সম্পর্কেও তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্ত্তাকে (Director of Public Instruction) লিখিলেন:

> "Baboo Mudoosoodun Gooptu, Lecturer on Anatomy to the Bengali and Hindustani Students, after twenty-two years' service in the college died on the 15th November, 1856. To him a debt of gratitude is due by his countrymen. He was pioneer who cleared a space in the jungle of prejudice, into which others have successfully pressed, and it is hoped that his countrymen appreciating his example will erect some monument to perpetuate the memory of the victory gained by Mudoosoodun Gooptu over public prejudice, and from which so many of his countrymen now reap the advantage."*

গ্রন্থাবলী

চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক মধুসূদনের পূর্ব্বেও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সময় হইতে সরকারী আনুকূল্যে উক্ত বিষয়ের গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতে থাকে; আর মধুসূদনই এ ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহার দুইখানি পুস্তক পাইয়াছি।

লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া / অর্থাৎ / ইংলণ্ডীয় ঔষধ কল্পাবলী / শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে কলিকাতার / রাজকীয় চিকিৎসা

---

* *Report of the Director of Public Instruction* for the year 1856-57, p. 200.

বিদ্যালয়ের / শ্রীমধুসূদন গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিতা / বিসাপ্স কালেজের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিতা / কলিকাতা / ইং সন ১৮৪৯।

পুস্তকখানির ইংরাজী আখ্যাপত্রখানি এখানে দিলাম :

THE / LONDON PHARMACOPOEIA / EDITION 1836 / TRANSLATED INTO BENGALEE / BY / MADUSOODEN GUPTA, / Superintendent and Lecturer of the Military class of / the Medical College, and late the Professor of medicine / of the Government Sanscrit College, / etc. etc. / PRINTED BY ORDER OF GOVERNMENT. / CALCUTTA, / W. H. HAYCOCK, BISHOP'S COLLEGE PRESS. / 1849.

পুস্তকের ভূমিকা :

"শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে লাণ্ডন ফার্মাকোপিয়া অর্থাৎ ইংরাজী ঔষধ কল্পাবলীর সাধু বঙ্গভাষাতে অনুবাদিতা ও মুদ্রিতা হইল। যে রূপ ঐ গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদিত হইয়াছে সেইরূপ বঙ্গভাষাতে হইবেক এই আজ্ঞাহেতুক আমি সেই রীতিক্রমে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছি অর্থাৎ প্রত্যেক ঔষধের ইংরাজী ও লাটিন নাম অগ্রে লিখিয়াছি পশ্চাৎ ঐ সকলের নাম বঙ্গভাষাতেও লিখিয়াছি যে সকল ঔষধাদির নাম ব ঙ্গভাষাতে নাই তাহা কল্পিত করিয়া অনায়াসে বোধগম্য যাহাতে হয় তাহা করিয়াছি কিন্তু অনেক ইংরাজী দ্রব্যের নাম বঙ্গভাষায় প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহাদিগের কেবল ইংরাজী নাম লিখিত হইয়াছে যেমন ইপিকাকুয়ানা ইত্যাদি।—

চিকিৎসা গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ সকল চলিত বঙ্গভাষায় প্রায় না থাকায় এই গ্রন্থে অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করা গিয়াছে কিন্তু বঙ্গভাষাতে যাহা চলিত আছে তাহা সাধ্যমতে পরিত্যাগ করা জায় নাই।—

শ্রীমধুসূদন গুপ্ত।"

রচনার নিদর্শন :

"। পরিমাণের পরিভাষা।

ইংলণ্ডদেশে দুই প্রকার তুলামান চলিত আছে এক সুবর্ণ রৌপ্যাদির পরিমাণার্থক দ্বিতীয় অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ নিমিত্তক পরন্তু যে তুলামান সুবর্ণাদি বিষয়ে ব্যবহৃত হয় তদ্দ্বারা চিকিৎসকেরা ঔষধাদি তোলন করেন এবং ইংরাজী ভাষাতে তাহাকে **ট্রয়ওয়েট্** কহে ইহার সংজ্ঞা বিশেষ ও প্রত্যেকের সঙ্কেত চিহ্ন এই।

*১ গ্রেন্	...	Gn i
২০ "	...	১ স্ক্রুপল 3i
৩ স্ক্রুপল	...	১ ড্রাম 3i
৮ ড্রাম	...	১ ঔন্স 3̄i
১২ ঔন্স	...	১ পৌণ্ড lbi

ইংলণ্ডদেশে তৈলমদ্যাদি দ্রব দ্রব্যের পরিমাণার্থ যে ভাণ্ডমান ব্যবহৃত হয় তাহাকে ইংরাজী ভাষাতে **ইম্পিরিয়েল মেজর** কহে অর্থাৎ রাজকীয় পরিমাণ যেহেতুক ইহা তদ্দেশীয় রাজানুমত ঐ ভাণ্ডমানের নাম ও চিহ্ন এই। যথা।

১ গ্যালন C	...	৮ পৈণ্ট
১ পৈণ্ট O	...	২০ ঔন্স
১ ঔন্স f 3̄i	...	৮ ড্রাম
১ ড্রাম f 3i	...	৬০ বিন্দু
১ ড্রাপ m	...	১ বিন্দু"

* কোম্পানীর নুতন এক শিকীতে ৪৫ গ্রেন হয় যদ্যপি ঐ শিকীর পরিমিত এক পিত্তলতারকে সমান তিন ভাগ করিয়া কাটা যায় তবে এক এক ভাগ ১৫ গ্রেন হয় পুনর্ব্বার ঐ ১৫ গ্রেন পরিমিত তারকে সমান তিন ভাগ করা যায় তবে পঞ্চ গ্রেন হয় এবং ঐ পঞ্চ গ্রেন তারকে পঞ্চ ভাগ সমান করিয়া কাটিলে এক এক গ্রেন হইবেক।

"। ঔষধ রাখিবার পাত্রাদির নিয়ম।

যে সকল পাত্রাদিতে ঔষধ প্রস্তুত করিবেক কিম্বা রাখিবেক তাহা এমত ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত হইবেক যাহার সংযোগে ঐ ঔষধ বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়।

কাচের পাত্র ও প্রস্তরময় খল্ল এবং মৃণ্ময় পাত্র এবং লৌহের হামামদিস্তা প্রভৃতি ব্যবহার্য্য এবং তাম্রময় ও সীসকময় পাত্রাদি অব্যবহার্য্য।

যে সমস্ত অম্ল ও ক্ষার এবং ধাতুঘটিত ঔষধ আর সকল প্রকার লবণ এই সকল দ্রব্য কেবল কাচের সিসীতে কিম্বা বোতলে রাখিবেক ও তাহারদিগের মুখ কাচের ছিপি দ্বাবা সুন্দররূপে রুদ্ধ করিয়া রাখিবেক।" পৃ. ১

* "। থর্ম্মামেটর অর্থাৎ উষ্ণপরিমাপক যন্ত্রের বিবরণ।

বায়ু ও জল ইত্যাদি বস্তুর উষ্ণতার তারতম্য অবগত হইবার কারণ এক যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার নাম ফার্ণহৈট্‌সথর্ম্মামেটর কারণ ঐ যন্ত্র ফার্ণহৈট নামক সাহেব দ্বারা প্রথমতঃ সৃষ্ট হইয়াছিল।

ঔষধ প্রস্তুত করণ সময়ে যত উত্তাপ আবশ্যক হইবেক তাহার সীমা ঐ যন্ত্র দ্বারা অবগত হইবেক। যখন পকজলের অর্থাৎ অত্যুষ্ণ

---

* থর্ম্মামেটর যন্ত্রের স্থূল বিবরণ এই এক সূক্ষ্ম কাচনল উহার নীচের মুখ রুদ্ধ ও কিঞ্চিদ্বিস্তৃত এবং উর্দ্ধমুখ দ্বারা যথা প্রমাণ পারা প্রবেশ করাইয়া ঐ মুখ রুদ্ধ করে এবং ঐ নল যে পিত্তলের দীর্ঘ পাত্রেতে সংযুক্ত থাকে তাহাতে ১ একাদি ২১২ অঙ্কদ্বারা সমান বিভক্ত এই রেখা সমূহের নাম ইংরাজীতে ডিগ্রি কহে এবং সংস্কৃততে কলা কহা যাইতে পারে ঐ যন্ত্রস্থ পারা উষ্ণপ্রাপ্ত হইলে উপরি উঠে এবং শীতস্পর্শে নীচে পতিত হয়।

জলের উত্তাপ প্রয়োজন হইবেক তাহার অত্যুষ্ণতা ২১২ ডিগ্রি অর্থাৎ কলা পর্য্যন্ত গ্রাহ্য এবং যে স্থলে মৃদুসন্তাপ নির্দ্দেশ করা যাইবেক তথা ৯০ ডিগ্রি হইতে ১০০ একশত ডিগ্রি পর্য্যন্ত জানিতে হইবেক।

। লাটিন। । ইংরাজী।

। হৈড্রার্জিরৈ বৈক্লোরিডম্। । বৈক্লোরৈড্ আব্ মর্কুর্য্যরী।
(কোরোসিব্ সব্লীমেট্)

। সংস্কৃত। । বাঙ্গালা।

। রসকর্পূর। । রসকাপর।

পারদ তুলাগৃহীত ২ পৌণ্ড

সল্‌ফ্যুরিক্ এসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক তুলাগৃহীত ৩ পৌণ্ড

শুষ্ক লবণ ১॥ পৌণ্ড

এক উপযুক্ত চীনার পাত্রে কিম্বা কাচের পাত্রে পারা ও সল্‌ফ্যুরিক্ এসিড্ একত্র পাক করিবেক পাকের শেষে উহা শুভ্র বর্ণ হইয়া শুষ্ক হইলে নামাইবেক ঐ শুভ্র বস্তু ইংরাজীতে বৈপর সল্‌ফেট্ আব মর্কুর্য্যরী কহে ইহা শীতল হইলে পর উক্ত লবণের সহিত মৃত্তিকার খলে সুন্দররূপ মর্দ্দন করিবেক মর্দ্দনানন্তর উর্দ্ধপাতন যন্ত্র দ্বারা উর্দ্ধপাতিত করিবেক উর্দ্ধপাতন কালীন জাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবেক, যাহা উপরিস্থ পাত্রে উঠিয়া লগ্ন হইবেক তাহাই রসকাপর।

। লাটিন। ।ইংরাজী।

। লৈকার্ হৈড্রার্জিরৈবৈক্লোরিডৈ। । সোল্যুশন্ আব্ বৈক্লোরৈড্ আব মর্কুর্য্যরী।

। বাঙ্গালা।

। রসকর্পূরের দ্রব্য।

বৈক্লোরৈড্ মর্কুর্য্যরী অর্থাৎ রসকর্পূর ... ১০ গ্রেন

হৈড্রোক্লোরেট্ অব এম্মোনিয়া অর্থাৎ নিশাদল		১০ গ্রেন
পরিশ্রুত জল	... ...	১ পৈণ্ট

এই দুই বস্তু জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক।

। লাটিন। । ইংরাজী।

। হৈড্রার্জিরৈ বৈক্লোরিডম্। । ক্লোরৈড্ আব মর্কুর্য্যরী। কেলোমেল।

। বাঙ্গালা।

। রসভস্ম।

পারদ	...	তুলাগৃহীত ...	৪ পৌণ্ড
সল্ফ্যুরিক্ এসিড্ অর্থাৎ গন্ধদ্রাবক তুলাগৃহীত		...	৩ "
লবণ	...	...	১৷৹ "

পরিশ্রুত জল যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক।

এক উপযুক্ত পাত্রে দুই পৌণ্ড পারা গন্ধক দ্রাবকের সহিত তাবৎ পাক করিবেক যাবৎ পর্য্যন্ত বৈপর সল্ফেট্ আব্ মর্কুর্য্যরী প্রস্তুত হইয়া শুষ্ক না হয় অর্থাৎ পারা শুষ্ক হইয়া শুভ্রবর্ণ হইলে নামাইবেক এবং উহা শীতল হইলে অবশিষ্ট দুই পৌণ্ড পারার সহিত মিলিত করিয়া মৃত্তিকার খলে রাখিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবেক ভাল মিশ্রিত হইলে ইহাতে লবণ দিয়া পুনর্ব্বার ঐ সমস্ত দ্রব্য তাবৎ খলে মর্দ্দন করিকে যাবৎ পারদ নিশ্চন্দ্র হইয়া না জায় পারা নিশ্চন্দ্র হইলে ঐ চূর্ণ উর্দ্ধপাতন করিয়া যাহা উর্দ্ধপাতিত হইবেক তাহা সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া পরিশ্রুত জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবেক। পৃ. ১৪০-২

। লাটিন্। । ইংরাজী।

। টিঙ্কট্যুরী। । টিঙ্কট্যুর্স।

। সংস্কৃত।

। অরিষ্ট।

স্থরাতে কোন দ্রব্য বাসিত করিয়া অর্থাৎ ভিজাইয়া রাখিলে উহার নাম ইংরাজিতে টিঙ্কট্যুর কহে এবং বাঙ্গালাতে স্থরাবাসিত কহে। পৃ. ২১২

মধুস্থদনের দ্বিতীয় পুস্তকখানি—**এনাটোমী**। অর্থাৎ শারীরবিছা। ইহারও দুইটি আখ্যাপত্র—ইংরেজী ও বাংলায়। বাংলা ও ইংরেজী আখ্যাপত্র যথাক্রমে এই :

"এনাটোমী। /অর্থাৎ/ শারীরবিছা। /তৎ প্রথম ভাগ মেডিকেল কালেজের হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালি ছাত্রদিগের/ শারীরবিছার উপদেশক/ শ্রীমধুস্থদন গুপ্ত প্রণীত। / কলিকাতা / ১২৫৯ শাল ইং মার্চ্চ ১৮৫৩।"

> A / Manual / of / Anatomy and Physiology / Part I. / Osteology / By / Pundit Madusooden Gupta / Supt. and lecturer of Anatomy and Physiology to the Hundustani / and Bengalee Classes of the Calcutta Medical College / and formerly Professor of Medicine / in the Govt. Sanscrit / College. / Calcutta : / 1853.

পুস্তকের বিষয়বস্তু নির্দ্দেশক পূর্ব্বাভাষ অংশটি এখানে দেওয়া হইল। জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় বাংলা ভাষায় প্রকাশ তখনই কতটা সম্ভব হইয়াছিল; এই অংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

"এনাটোমীর প্রকৃত অর্থ ছেদবিছা বস্তুতঃ চিকিৎসার্থক শারীরবিছা। শারীরজ্ঞেরা মানব শারীরবিছাকে শাখাদ্বয়ে বিভক্ত করিয়াছেন প্রথম জেনরেল এনাটোমী অর্থাৎ সামান্য শারীরবিছা এবং দ্বিতীয় ডিস্ক্রিপটিব এনাটোমী অর্থাৎ নির্দ্দেশক শারীরবিছা।

শরীরের নির্ম্মাপক সমবায়ি দ্রব্য সকলের স্বভাব ও সামান্য গুণ সমূহের বিবরণের নাম সামান্য শারীরবিছা।

দেহের নানা ইন্দ্রিয় ও প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং প্রদেশ সকল এবং পৃথক পৃথক অংশের বাহ্য আকৃতি ও আভ্যন্তর নির্ম্মিত এবং

তাহাদিগের যথারূপ পরস্পর অবস্থিতি এবং যোগ ঐ সমস্ত অংশের উৎপত্তির পর যে রূপ উত্তরোত্তরাবস্থা ইত্যাদির বিবরণের নাম নির্দ্দেশক শারীরবিদ্যা।

এই গ্রন্থে কেবল নির্দ্দেশক শারীরবিদ্যার বিষয় লিখিত হইবেক যাহা সাধারণ চিকিৎসকগণের পাঠ্য।

শারীববিদ্যার অঙ্গ যাহাকে ফিজিয়লজী অর্থাৎ প্রকৃতিবিদ্যা কহে তাহার দ্বারা সুস্থ শরীরের যে যে অবস্থা ও কর্ম্মসকল এবং জীবনের ক্রিয়াবিধি সমুদয়ের জ্ঞান হয়।

শরীর ঘন এবং দ্রববস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। শরীরজ্ঞেরা কেবল ঘন অংশ সকলকেই শরীরের সমবায়ি করিয়া গণ্য করিয়াছেন। রক্ত রস এবং লসীকা এই তিন দ্রবেতে কার্প্‌সল বা ঘনকণা সকল মিলিত থাকাতে উক্ত তিন দ্রব ধাতুকেও ঘন বস্তুর সহিত নিরূপণ করিয়াছেন। শরীরের ঘন বস্তু লিখিত সকলের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাইল্। বা	...	রস।
ব্লড্। বা	...	রক্ত।
লিম্ফ। বা	...	লসীকা।
ইপিডার্মিক্ টিস্থ। বা	...	অন্তস্ত্বক্ উপত্বক্ নখ ও কেশ।
পীগ্‌মেণ্ট। বা	...	বর্ণদ্রব্য।
এডিপোস্ টিস্থ। বা	...	বসাঝিল্লী।
সেল্যুলর টিস্থ। বা	...	কৌষিকঝিল্লী।
ফৈব্রস্ টিস্থ। বা	...	সৌত্রিক ঝিল্লী।
ইলাষ্টিক্ টিস্থ বা	...	স্থিতিস্থাপক ঝিল্লী।
কাটিলেজ্। বা	...	উপাস্থি এবং তাহার বিভেদ।
বোন্স বা।	...	অস্থিগণ।

মসল্‌স। বা	...	পেশীগণ।
নর্বস্‌টিস্থ। বা	...	স্নায়ুগণ।
ব্লডবেসল্‌স। বা	...	রক্তবহা নাড়ীগণ।
এবসর্বেণ্ট বেসল্‌স। বা	...	আচূষক নাড়ীগণ।
গ্লেণ্ডস্। বা	...	গ্রন্থিগণ।
সিরস্‌মিম্ব্রেন্স। বা	...	মাস্তকঝিল্লীগণ।
সৈনোবিয়েলমিম্ব্রেন্স। বা	...	স্নৈহিকঝিল্লীগণ।
মিরুকল্ মিম্ব্রেন্স। বা	...	শ্লৈষ্মিকঝিল্লীগণ।
স্কীন্। বা	...	ত্বক্।
সিক্রিটিং গ্লেণ্ডস্। বা	...	স্রাবণগ্রন্থিগণ। ইতি।

অস্থি সকল শরীরের প্রধান আধারস্থান এই হেতুক অস্থির বিবরণ প্রথমতঃ কর্ত্তব্য।"*

রচনার নিদর্শন :

"পার্থিব বস্তুর দ্বারা অস্থি সকলের দৃঢ়তা ও স্থূলতা জন্মে এবং দৈহিক বস্তুর দ্বারা তাহাদিগের বৃদ্ধি ও পোষণ হয়।

শরীরের মধ্যে অস্থি সকল স্ব স্ব স্থানে স্বীয় স্বীয় লিগেমেণ্ট বা বন্ধনী দ্বারা গ্রথিত থাকায় তাহাকে স্বাভাবিক কঙ্কাল কহি।

ঐ প্রত্যেক অস্থি স্ব স্ব স্থানে অন্য কোন দ্রব্য কিম্বা তারের দ্বারা সংযুক্ত হইলে তাহাকে কৃত্রিম কঙ্কাল কহি।

ঐ অস্থি সমস্ত চতুর্ব্বিধ প্রকার, দীর্ঘ, কপাল, ক্ষুদ্র, এবং বিষম।

---

* মধুসূদন গুপ্ত বিষয়ক তথ্যাদি এবং 'এনাটোমী' পুস্তকখানি মধুসূদনের বংশধর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ গুপ্তের সৌজন্যে পাইয়াছি। লেখক।

দীর্ঘাস্থি সকল হস্ত পাদ শাখাতে স্থিত, ইহার দ্বারা গমনাগমনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। বিবরণ করণের সুগমার্থে ইহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় অর্থাৎ দুই অন্ত এবং গাত্র, ইহাদিগের উর্দ্ধান্ত ও অধোঽস্ত স্থূল এবং তাহাতে সন্ধিস্থান থাকে; দুই অন্তের মধ্যে স্থিতি দীর্ঘভাগের নাম গাত্র। দীর্ঘাস্থি দিগের গাত্রের ভিতর দীর্ঘ নালী আছে এবং ঐ নালীর ভিতর মজ্জা থাকে।

কপলাস্থি সকল বিস্তৃত এবং চেপ্টা। শরীরের যে যে স্থলে অস্থিময় গহ্বর আছে সেই২ স্থান কপালাস্থিদিগের দ্বারা নিৰ্ম্মিত, যেমন করোটির অস্থিসকল এবং বস্তিদেশের অস্থি সকল। কপালাস্থিরা দুই প্লেট বা পত্র দ্বারা নিৰ্ম্মিত এবং দুই পত্রের মধ্যে যে কোষময় ভাগ তাহার নাম ডিপ্লোই বা দ্বিভেদক।

ক্ষুদ্রাস্থিসকল শরীরের সেই সেই ভাগে স্থিত যে যে স্থলে অধিক দৃঢ়তার সহিত নানাবিধ ক্রিয়া একত্র আবশ্যক করে যেমন মণিবন্ধ গুল্ফ সন্ধিতে ক্ষুদ্রাস্থিসকল একত্র সংযুক্ত হওয়াতে নানাবিধ ক্রিয়া অনায়াসে নির্ব্বাহ হয় এবং অস্থিরও কোন আঘাত জন্মে না।

ঐ সকল অস্থিকে বিষমাস্থি কহা যায় যাহাদিগের কোন কোন অংশ দীর্ঘ এবং কোন কোন অংশ পাতলা অর্থাৎ সর্ব্বত্র অসমান যেমন শঙ্খাস্থি, মাঢ্যাস্থি, কীলকাস্থি, হন্বস্থি এবং কশেরুকা সমস্ত ইত্যাদি।

অস্থিসকলের বহিঃপ্রদেশে যে সকল উচ্চতা আছে তাহাদিগের বিবরণ।

অস্থি সকলের উপর যে যে উচ্চ স্থান আছে ইংরাজীতে তাহাকে প্রোশেষ অর্থাৎ প্রবর্দ্ধন কহে; প্রবর্দ্ধন সকলের নাম তাহাদিগের আকৃত্যনুসারে ও স্থিত্যনুসারে এবং কার্য্যানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা কণ্টকপ্রবর্দ্ধন। কাকচঞ্চু প্রবর্দ্ধন, পর্ব্বকৃতি প্রবর্দ্ধন, আলি প্রবর্দ্ধন, শলাকা প্রবর্দ্ধন, ধাবন প্রবর্দ্ধন, অনুপ্রস্থ প্রবর্দ্ধন ইত্যাদি।

অস্থিতে যে সকল খাত বা নিম্নতা ও ছিদ্র দৃষ্ট হয় তাহাদের নাম উক্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন বঙ্ক্ষনাস্থিতে যে বড় খাত আছে তাহার আকৃতি পানপত্রের ন্যায় প্রযুক্ত চষবখাত কহা যায়। যে খাত সকল গম্ভীর নহে তাহাদিগকে উত্তান খাত কহে, যথা বা অণ্ডাকৃতি ছিদ্র গোল ছিদ্র বিদীর্ণ ছিদ্র সুষুপ্তীয় ছিদ্র মজ্জীয় ছিদ্র ইত্যাদি।

প্রকৃতিস্থাবস্থাতে সমস্ত অস্থি একপ্রকার সূত্রময় দৃঢ় ঝিল্লী দ্বারা সর্ব্বত্রে আবৃত থাকে কেবল তাহাদিগের সন্ধিপ্রদেশ সকল আবৃত হয় না। ঐ ঝিল্লীর নাম পেরিয়াষ্টিয়ম্ বা অস্থিবেষ্ট। অস্থিদিগের সন্ধিস্থান সকল অতি পাতলা উপাস্থি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। যে ঝিল্লী করোট্যস্থিদিগের উপরি ভাগে বিস্তৃত থাকে তাহার নাম পেরিকেবি-নিয়ম্ বা করোটিবেষ্ট। উপাস্থিদিগের উপর যে ঝিল্লী থাকে তাহা উপাস্থিবেষ্ট।

দীর্ঘাস্থিদিগের অন্তর্ভাগে যে নালী আছে এবং তাহার ভিতর ক্ষুদ্রাস্থি কপলাস্থি ও বিষমাস্থিদিগের ভিতর যে সেল্‌স বা কোষাংশ সকল আছে তাহাদিগের আচ্ছাদনকারিণী যে ঝিল্লী তাহা মেডেল্যারি মিম্বেন্স বা মজ্জীয়ঝিল্লী। উক্ত সকল ঝিল্লীদিগের উপর অস্থি পোষণকারি রক্তবহ নাড়ীসকল শাখীভূত হইয়া অবস্থিতি করাতে অস্থিগত যে যে পরিবর্ত্ত আবশ্যক হয় তাহা উৎপন্ন করে; ঐ নাড়ীদিগের দ্বারা মজ্জা অস্থিদিগের ভিতর সৃষ্ট হয়। সকল অস্থির ভিতর অর্থাৎ তাহাদিগের নালীতে এবং কোষেতে হরিদ্রাবর্ণ এক প্রকার তৈলবৎ বস্তু পূর্ণ থাকে তাহাকে মজ্জা কহে ঐ মজ্জা মজ্জীয়ঝিল্লীতে বেষ্টিত থাকে। বালকের বা ভ্রূণের ষষ্ঠ সপ্তাহ বয়সে অস্থি স্থানে প্রথমতঃ উপাস্থিভাব সম্পূর্ণ হয় এবং সপ্তম সপ্তাহে আসিফিকেসন অর্থাৎ অস্থিভাব প্রথমতঃ যকৃতে উপলব্ধ হয়, উত্তরোত্তর অন্যান্য অস্থিদিগের অবয়বে ক্রমশঃ

অস্থিভাব জন্মে। যদ্যপিও পৃথক্ পৃথক্ অস্থির জননের পৃথক্ পৃথক্ মাস বৎসরাদি কাল নিয়মিতরূপে ইংরাজী শারীরবিদ্যাতে নির্দ্দিষ্ট আছে কিন্তু তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ করা এস্থলে প্রয়োজন করে না কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে যৌবনাবস্থাতে কঙ্কাল বা সমস্ত শারীরাস্থি সম্পূর্ণরূপে অস্থিত্ব প্রাপ্ত হয় এবং শারীরজ্ঞেরা কহেন যে কঙ্কাল ২৪৬ দুই শত ষট্ চত্বারিংশৎ পৃথক্ পৃথক্ অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত এবং তাঁহারা মানবের কঙ্কালকে, মস্তক ও মধ্যকায় এবং চতুঃশাখাতে বিভক্ত করিয়াছেন।"—পৃ. ৩-৬

"কার্প্স বা মণিবন্ধ অর্থাৎ কব্জা

মণিবন্ধেতে অষ্ট অস্থি আছে চার২ করিয়া উর্দ্ধস্থ ও অধঃস্থ দুই শ্রেণীতে স্থিত। প্রকোষ্ঠের বাহ্য পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিলে প্রথম শ্রেণীতে নেবিকিউলর বোন্ বা নাবস্থি, সিমিলুনর বোন্ বা অর্দ্ধচন্দ্রাস্থি, কিউনিকারম বোন্ বা কোণাস্থি, পিসীকারম্ বোন্ বা বর্ত্তুলাস্থি এই চারি অস্থি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ট্রেপিজিয়ম্ বা সমদ্বি-পার্শ্বাস্থি, ট্রেপিজিয়াইড বা সমদ্বিদ্বিপার্শ্বাস্থি, আস্ম্যাগ্নম্ বা স্থূলাস্থি এবং অন্সিফারম্ বোন্ বা বড়িশাস্থি এই চারি অস্থি দৃষ্ট হয়।

১। নাবস্থির আকৃতি ইংরাজি নৌকার ন্যায় প্রযুক্ত উহার উক্ত নাম দিয়া গিয়াছে; ইহা অপর পাঁচ অস্থির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ ইহার ন্যুব্জ প্রদেশ চক্রদণ্ডাস্থির নীচে সংযুক্ত, এবং ইহার নিম্ন প্রদেশে স্থূলাস্থি ও অর্দ্ধচন্দ্রাস্থিযুক্ত এবং ইহার অগ্র প্রদেশে সমদ্বি-পার্শ্বাস্থি ও সমদ্বিদ্বিপার্শ্বাস্থি সংযুক্ত।

২। অর্দ্ধচন্দ্রাস্থিতে এক অর্দ্ধচন্দ্রবৎ খাত থাকায় ইহার নাম অর্দ্ধচন্দ্রাস্থি, ইহার চারি সন্ধি স্থানেতে অপর চারি অস্থি সংযুক্ত অর্থাৎ

এই অস্থির স্ন্যাব্জ প্রদেশে চন্দ্রদণ্ডাস্থি সংযুক্ত এবং ইহার বাহ্য পার্শ্বেতে নাবস্থি ও আভ্যন্তর পার্শ্বে কোণাস্থি, এবং অগ্রে স্থূলাস্থি সংযুক্ত।

৩। কোণাস্থি অর্দ্ধচন্দ্রাস্থির ভিতর দিগেস্থিত, ইহার উপরিভাগে এক গোল প্রদেশ আছে তাহাতে বর্ত্তুলাস্থি সংযুক্ত থাকে, ইহাতে তিন প্রদেশ আছে এবং ইহার স্থূলাংশকে মূল কহে এবং সূক্ষ্মাংশকে ইহার অগ্র কহে। এই অস্থির স্ন্যাব্জ প্রদেশে বড়িশাস্থি সংযুক্ত এবং উপরি বর্ত্তুলাস্থি এবং মূলে অর্দ্ধচন্দ্রাস্থি সংযুক্ত।

৪। বর্ত্তুলাস্থি ক্ষুদ্র এবং গোল ও কোণাস্থির উপরি প্রদেশে সংলগ্ন।

৫। সমদ্বিপার্শ্বাস্থির আকৃতি অত্যসমান এবং বহুকোণযুক্ত। এই অস্থি চারি অস্থির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠের করভাস্থিতে, নাবস্থিতে, সমদ্বিদ্বিপার্শ্বাস্থিতে এবং দ্বিতীয় করভাস্থিতে সংযুক্ত।

৬। সমদ্বিদ্বিপার্শ্বাস্থিতে চারি সন্ধি প্রদেশ আছে। এই অস্থি, দ্বিতীয় করভাস্থিতে, স্থূলাস্থিতে, সমদ্বিপার্শ্বাস্থিতে এবং নাবস্থিতে সংযুক্ত।

৭। স্থূলাস্থি মণিবন্ধের সকল অস্থি অপেক্ষা বড় ইহার মূল গোল এবং ইহার গাত্রে চারি পার্শ্ব আছে। এই অস্থি সপ্ত অস্থির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ ইহার মূল নাবস্থির ও অর্দ্ধচন্দ্রাস্থির নিম্ন সন্ধি প্রদেশে সংযুক্ত। এই অস্থি বহির্ভাগে সমদ্বিদ্বিপার্শ্বাস্থিতে এবং অভ্যন্তর ভাগে বড়িশাস্থিতে যুক্ত এবং এই অস্থির অগ্রভাগে দ্বিতীয় ও চতুর্থ করভাস্থি সংযুক্ত।

৮। বড়িশাস্থির উপর এক বক্র উচ্চ স্থান আছে তাহা বড়িশ প্রবর্দ্ধন ইহাতে এন্যুউল্যর লিগেমেণ্ট বা বলয়বন্ধনী সংযুক্ত থাকে। এই অস্থি অপর পাঁচ অস্থির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ ইহার নীচে বা অগ্রভাগে চতুর্থ এবং পঞ্চম করভাস্থি যুক্ত ইহার এক২ পার্শ্বে স্থূলাস্থি এবং কোণাস্থি যুক্ত এবং অগ্রভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাস্থি সংযুক্ত থাকে। পৃ. ৪২

সংযোজন

মধুসূদন গুপ্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈদ্যবাটীর অধিবাসী। পিতার নাম বলরাম গুপ্ত। মধুসূদনের আর এক ভ্রাতা ছিলেন কাশীনাথ গুপ্ত। মধুসূদন ১৮০০ সনের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পাঠে মনোযোগ তাঁহার একেবারেই ছিল না। এজন্য একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভৎর্সনা করেন। তাহাতে তিনি মনের দুঃখে বাড়ী হইতে চলিয়া যান এবং কলিকাতা আসিয়া গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। বাটী হইতে চলিয়া আসিবাব সময় তিনি বলিয়াছিলেন, মানুষ না হইয়া পুনবায় বাড়ীতে ফিবিবেন না। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণী খোলা হইলে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এই বিদ্যায় তাঁহার কৃতিত্বের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মধুসূদন বর্দ্ধমান জেলায় হারোয়া গ্রাম নিবাসী জমিদার-কন্যা পদ্মাবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র— গোপালচন্দ্র গুপ্ত, জয়গোপাল গুপ্ত ও দ্বারকানাথ গুপ্ত।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৯৭

কেশবচন্দ্র সেন

১৮৩৮—১৮৮৪

কেশবচন্দ্র সেন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬৫
মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—.০।৮।৫৮

পূর্ব্বাভাষ
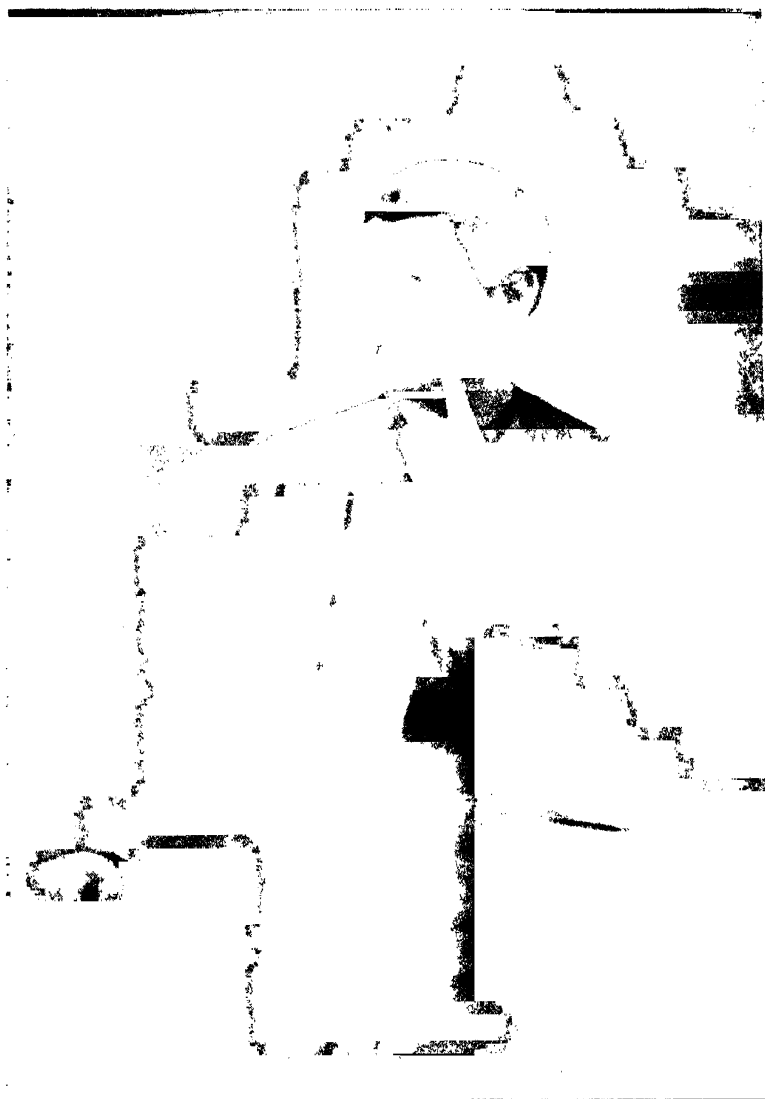
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র "মহাত্মা" কেশবচন্দ্র সেনকে "সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত" ও "সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্যপাত্র" বলিয়া 'ধর্ম্মতত্ত্বে' উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ উক্তি দ্বারা এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণের যে-সব লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই কেশবচন্দ্রে বিদ্যমান ছিল। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মনেতা, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির একান্ত সেবক। কিন্তু এ সকলের উপরে ছিলেন তিনি সত্যকার দরদী মানুষ। মানুষের তথা স্বদেশবাসীর উন্নতি ছিল তাঁহার লক্ষ্য। এই উন্নতির মূলাধার যে ধর্ম্মবোধ তাহা জানিয়া তিনি মনুষ্যসমাজকে ধর্ম্ম বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন। আর এই কারণেই তাঁহাতে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবে এত আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল।

কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজী-বাংলা একটি বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বড় ছোট কয়েকখানি জীবনী-গ্রন্থও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেশবচন্দ্র ছেচল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি ভারতীয় জীবনের নানা দিকের উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রয়াস সমাজজীবনে এমন এক আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল যাহার তুলনা আধুনিক কালেও খুব কমই মেলে। কেশব-সাহিত্যে, কেশব-জীবনী-গ্রন্থে এই সকলের ছাপ নিশ্চয়ই পড়িয়াছে। কিন্তু কেশব-জীবনের সব কথা ইহাতে ধৃত হয় নাই, হয়ত তাহা সম্ভবও ছিল না। কেশব-জীবন সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, শিক্ষা ও অন্যবিষয়ক রিপোর্ট এবং পুস্তক-পুস্তিকাদির সাহায্যও আমাদের লইতে হয়। প্রচলিত কেশব-সাহিত্য এবং এই সকল নূতন আকর হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে কেশব-জীবনী নূতন করিয়া আলোচনার সময় আসিয়াছে। কেশবচন্দ্রের বহুমুখী কর্ম্মপ্রয়াস জাতীয় জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে ইহা হইতে তাহা আমাদের নিকট সম্যক্ প্রতিভাত হইবে।

জন্ম : বংশ-পরিচয়

কলুটোলার সেন-পরিবারে কেশবচন্দ্রেব জন্ম। সেন পরিবারের কথা বলিতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয় আমাদের স্বতঃই মনে পড়ে। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামকমল সেন* নববঙ্গেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রসাধনা নানা বিষয়েই তিনি উৎসাহী কর্ম্মী ও নেতা ছিলেন। ধর্ম্ম এবং সামাজিক ব্যাপারে রামকমল ছিলেন রক্ষণশীল, তথাপি জাতির উন্নতিমূলক যতকিছু প্রচেষ্টা, সমুদয়েই তাঁহার ঐকান্তিক সংযোগ লক্ষ্য করি। রামকমল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, ধনে মানে কলিকাতা-সমাজের একজন প্রধান হইয়াও তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-যাপন-প্রণালী ছিল অতি সাদাসিধা ; তিনি 'হরি' নাম জপে আনন্দ পাইতেন, স্বপাকে রন্ধন করিয়া যৎসামান্য আহার

* 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্গত বর্ত্তমান লেখকের "রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়" পুস্তকে 'রামকমল সেন' দ্রষ্টব্য।

করিতেন। নিয়ম-সংযমে রামকমল ঐ সময়ে একজন আদর্শ হিন্দু বলিয়া গণ্য হন।

রামকমল সেনের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরিমোহন সে-যুগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহকর্ম্মীরূপে খ্রীষ্টানবিরোধী আন্দোলনে একান্ত ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ে'র তিনি ছিলেন অন্যতর সম্পাদক। অন্যান্য দেশকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান, যেমন—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও সূচনা অবধি যুক্ত ছিলেন। রামকমল সেন ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হিন্দু কলেজের সঙ্গে মিলিত হন; জীবনের শেষ বৎসর (১৮৪৪) পর্য্যন্ত তিনি ইহার একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ হিন্দু কলেজের ছাত্র। জ্যেষ্ঠ হরিমোহন (জন্ম ১৮১২) কলেজের প্রথম যুগের একজন কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেন (১৮১৪-৪৮) কেশব-চন্দ্রের পিতা। তিনিও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। জ্যেষ্ঠ হরিমোহন রামকমলের জনকল্যাণ প্রচেষ্টাসমূহের ধারক ও বাহক ছিলেন। মধ্যম পুত্র প্যারীমোহন পিতৃদেবের ভগবদ্‌ভক্তি, নিষ্ঠা ও সংযমের অধিকারী হইলেন। কলেজের পাঠ সমাপনান্তে প্যারীমোহন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি ব্যেগ সাহেবের হাউসের মুৎসুদ্দী ছিলেন। এই হাউসের পতনে তিনি ঋণগ্রস্ত হন। পিতা রামকমল সেন একই কালে দুইটি কর্ম্ম করিতেন—বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী ও টাঁকশালের দেওয়ানী। রামকমলের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ হরিমোহন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন, টাঁকশালের কাজ পাইলেন প্যারীমোহন। তিনি এই পদ লাভ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হন। তাঁহার সুদিন ফিরিয়া আসে।

সেকালের নিয়ম অনুসারে অল্প বয়সেই প্যারীমোহনের বিবাহ হয়, স্বগ্রাম গৌরীভা (ডাকনাম গরিফা)-নিবাসী গৌরহরি দাসের কন্যা সারদাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পূজার ছুটির পর প্যারীমোহন অকালে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে মারা গেলেন। প্যারীমোহন মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া যান। পুত্রদের নাম—নবীনচন্দ্র সেন, কেশবচন্দ্র সেন এবং কৃষ্ণবিহারী সেন। নবীনচন্দ্র বিশেষ সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। সমাজের কল্যাণে তাঁহাব সার্থক প্রয়াস ভারতবাসী মাত্রেই আজ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে। তিনি 'হিন্দু ফেমিলি এন্যুয়িটি ফণ্ডে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে তিনি ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগবেব সহযোগী। কনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী মধ্যমাগ্রজ কেশবচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এলবার্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ রূপে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ কবেন। পালি তথা বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সুধীমাত্রকেই বিস্মিত করিত। অগ্রজদের মত তিনিও স্বল্পায়ু ছিলেন (১৮৪৮-৯৫)।

কেশবচন্দ্র ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বব জন্মগ্রহণ করেন। এই সনে আরও দুই জন মনীষী আবির্ভূত হইয়াছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণদাস পাল। ধর্মপ্রাণ রামকমল নবজাত পৌত্রের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। মাতা সারদাসুন্দরী লিখিয়াছেন, "আমার শ্বশুর মহাশয় কথায় কথায় 'পর্য্যন্ত' বলিতেন, কেশবের জন্মের পর বলিয়াছিলেন (কেশবকে লক্ষ্য করিয়া), 'এই পর্য্যন্ত আমার মতন হইবে। ইহাকে দিয়া তোমার খুব সুখ হইবে'।* রামকমল কেশবচন্দ্রকে 'বিশু' বলিয়া ডাকিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুত্র প্যারীমোহনকে বলেন, "Peary! your son Bisu is destined

* কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পৃ. ৭

to be a great man—a religious reformer",* অর্থাৎ 'প্যারী, তোমার পুত্র বিশু একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে—একজন ধর্ম্মসংস্কারক হইবে।' রামকমলের পৌত্রপৌত্রীদের মধ্যে কেশবচন্দ্র তাঁহার বিশেষ স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রামকমল প্রতিনিয়ত 'হরি' নাম জপ করিতেন; পরিবারের পুত্র, কন্যা এবং পুত্রবধূদেরও তিনি 'হরি' নাম জপ করিতে উপদেশ দিতেন। পিতা প্যারীমোহনের মাধ্যমে কেশবচন্দ্র এই নাম পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণবোচিত ভক্তিমূলক সাধন-প্রণালী প্রবর্ত্তনে কেশবচন্দ্র যে উৎসুক হইয়াছিলেন তাহার মূল পাই তাঁহার পারিবারিক ঈশ্বর-আরাধনার মধ্যে।

ছাত্র-জীবন

প্রথম পর্ব্ব—বাল্য ও কৈশোর: কেশবচন্দ্র ধনী পরিবারের সন্তান; তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ, আলাপ-ব্যবহার যে তদুপযুক্ত হইবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংরেজী কেশব-জীবনীতে কেশবচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। প্রতাপচন্দ্র গৌরীভার অধিবাসী, সেন-পরিবারের আত্মীয়। সেন-পরিবারের লোকেরা পূজার ছুটিতে যখন স্বগ্রামে যাইতেন তখন ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁহাদের আচার-আচরণে বিস্মিত হইতেন। প্রায় সমবয়সী এবং আত্মীয় হইলেও ঐ সময় কেশবের সঙ্গে প্রতাপচন্দ্র তেমন মিশিতে পারিতেন না। কলিকাতায় আসিবার পর হইতেই তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হইবার সুযোগ পান।

* *Life of Dewan Ramcomul Sen*—Peary Chand Mitra, 1880, p. 88.

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে কেশব-সম্পর্কিত পববর্তী ঘটনাসমূহ উক্ত ইংবেজী জীবনী-গ্রন্থে প্রতাপচন্দ্র অনবদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা ইহা হইতে বহু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাইতে পারিবেন।

শৈশবে গৃহে বসিযা 'গুরু'র নিকটে কেশবচন্দ্রের পাঠাভ্যাস সুরু হয়। তিনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে ভর্তি হইলেন। জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্র তখন কলেজের ছাত্র। সে সময়ে হিন্দু কলেজে ধনী-পরিবারের ছেলেরা বেশীর ভাগ অধ্যয়ন করিতেন। সেন-পরিবারের সন্তানেরাও বংশপরম্পরায় এখানে অধ্যয়ন কবিতে লাগিলেন। কিন্তু ইঁহারা অন্যান্য ধনীর দুলালদের মত ছিলেন না। রামকমল স্বযং সাহিত্যসেবী, এশিযাটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অন্যান্য শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁহার প্রগাঢ় যোগ—এইসব কারণে তাঁহার পরিবারে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চ্চার একটি মহনীয় পরিবেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। অন্যান্য সন্তানদের মত কেশবচন্দ্রও শৈশব হইতেই পাঠে সবিশেষ মনোযোগী হন। তিনি সুদর্শন, অমিয়কান্তি, মিষ্টালাপী, আর সেই শৈশব হইতেই মানব-দরদী। কলেজের শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িতে বিলম্ব হইল না। জুনিয়র বিভাগের প্রতি শ্রেণীতেই তিনি পাঠোৎকর্ষ দেখাইয়া পুস্তকাদি পুরস্কার পান। হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের তৃতীয় শিক্ষক টি. ষ্টারজন (T. Sturgeon) তাঁহার উদ্দেশে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন, 'the little boy with a big head'। কেশবচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র দ্বাদশ বৎসর। ইংরেজী ও পাটীগণিতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। এ কথা হয়তো অনেকে জানেন না যে, এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চায়ও কেশবচন্দ্র বিশেষ অগ্রসর হন। ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দের

সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টে 'হিন্দু কলেজ' অধ্যায়ে স্কুল-বিভাগের সার্টিফিকেট এবং পুরস্কার প্রাপ্ত সিনিয়র ও জুনিয়র ছাত্রদের একটি ফিরিস্তি আছে। ইহাতে কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এই তথ্যটি আমরা পাই :

SENIOR SCHOOL DEPARTMENT
Second Class
Keshub Chunder Sen . . . Vernacular.

এই তালিকায় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্তিরও উল্লেখ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র এবং প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস) কেশবচন্দ্রের সময়েই কলেজে অধ্যয়ন করেন, এবং তাঁহার সঙ্গে কেশবের পরিচয় ও হৃদ্যতা জন্মে। তিনিও পুরস্কার ও সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন। গভীর অভিনিবেশ এবং কঠোর পরিশ্রম সহকারে কেশবচন্দ্র এই সময়েই বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নে রত হন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন :

> "Keshub prepared his lessons industriously, and added patient labour to natural genius. This habit of hard work and systematic industry equally distinguished him at all times of life."*

অর্থাৎ, কেশবচন্দ্র কঠোর পরিশ্রম সহকারে পড়া তৈরি করিতেন। শ্রমশক্তির সঙ্গে এই প্রতিভা একত্র হওয়ায় তিনি জীবনে এতখানি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কীর্ত্তন, কথকতা, যাত্রা, বিশেষতঃ রামযাত্রা শৈশবে তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। শৈশব হইতেই এই সকল শ্রবণ করিয়া কেশবচন্দ্র ভারতীয় ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞান আহরণ করিতে থাকেন। তিনি সমবয়সীদের লইয়া রামযাত্রা অভিনয় করিয়াছিলেন।

---

* *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, P. C. Mozoomdar, Second Edition, 1891, p. 55.

গিলবার্ট নামক এক সাহেব হিন্দু কলেজের ছাত্রদের একবার ম্যাজিক দেখান। কেশবচন্দ্র গৃহে গিয়া সমবয়সীদের সম্মুখে প্রায় হুবহু উহা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন এবং সকলকে আনন্দ দান করেন। তিনি কোন বিষয় দেখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, নিজে তাহা করিয়া তবে নিরস্ত হইতেন।

দ্বিতীয় পর্ব্ব—যৌবন: কেশবচন্দ্র ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ স্কুল বিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হন। কিন্তু এই বৎসরের প্রথমেই হিন্দু কলেজ লইয়া কলিকাতায় ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। কলেজ এই সময় সরকারী আওতায় আসে; কলেজের অধ্যক্ষ-সভার কর্ত্তৃত্ব তখন খুবই হ্রাস পায়। সভার প্রতিবাদ সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করিলে, হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন ১৮৫৩, ২রা মে তারিখে। কলেজের নাম হইল—হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ। এবারে এই কলেজ-প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন কলিকাতাস্থ ওয়েলিংটনের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়। কলুটোলা সেন-পরিবারের অধ্যক্ষ হরিমোহন সেন এই প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন এবং পরিবারের সন্তানদের হিন্দু কলেজ ছাড়াইয়া এই নূতন কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কেশবচন্দ্রও হিন্দু কলেজ হইতে এখানে আসিয়া অধ্যয়ন সুরু করিলেন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেন, হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকে এই নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হয় এবং ইহার ফলে তাহাদের পাঠে অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে। কেশবচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। হিন্দু কলেজে যে সব বিষয় তিন বৎসর পরে পড়িতে হইত, এই সময়েই তাঁহাকে তাহা অধ্যয়ন করিতে হয়। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি এ সকল আয়ত্ত করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু

অঙ্কশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হইল। তিনি এই অভাব আর কখনও পূরণ করিতে পারেন নাই। সেক্সপীয়র, মিলটন, বেকন প্রভৃতি ভাবগর্ভ গ্রন্থাদি পড়িয়া ইংরেজী সাহিত্যের সবিশেষ চর্চ্চা করিতেন। বিখ্যাত সেক্সপীয়রবিদ্ ডি এল. রিচার্ডসন প্রথম হইতেই হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ-পদে বৃত হইয়াছিলেন। অন্যান্য বহু বাঙালী মনীষীর মত কেশবচন্দ্রের সেক্সপীয়র-প্রীতি রিচার্ডসনের আশ্চর্য্য শিক্ষারই ফল। সেক্সপীয়র-কৃত নাটকের অভিনয়-স্পৃহা এই সময়ে তাঁহার মনে উজ্জীবিত হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক, বৎসরখানেক পরে, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, কেশবচন্দ্র হিন্দু কলেজে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতাপচন্দ্র বলেন, হিন্দু কলেজে তিনি আর পূর্ব্বের মত পাঠে উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই। কলেজে অধ্যয়ন সম্বন্ধে প্রতাপচন্দ্র লেখেন :

> "Henceforth his educational career was not at all brilliant. He toiled at it with all his might ; he was more than passable in English ; he did tolerably well in history ; he had a liking for chemistry, and spent a lot of money in buying a set of apparatus ; he did very well indeed in mental and moral philosophy, but he was at desperate odds in trigonometry and conic sections."*

ইংরেজী, ইতিহাস, পাশ্চাত্ত্য দর্শন, রসায়নশাস্ত্র, বিশেষতঃ শেষোক্ত বিষয়ে কেশবচন্দ্র বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেন ; কিন্তু ত্রিকোণমিতি এবং কনিক সেকশন, বা এককথায় অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাঁহার মন একেবারে বিরূপ হইয়া উঠিল। অঙ্কনের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল বটে, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছুতে তাঁহার মন বসিত না। একারণ জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্রের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াও, তিনি আর শোধরাইতে

* *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, p. 61.

পারিলেন না। ইতিমধ্যে ১৮৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুলে বিভক্ত হইল। কেশবচন্দ্র কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

কেশবচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিত্যাগ করেন। এখানে স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও কেশবের সমসময়ে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগে গিয়া ভর্ত্তি হন। উভয়ের মধ্যে এই সময় আলাপ পরিচয় হওয়া বিচিত্র নয়। ১৮৫৬-৫৮, এই দুই বৎসর কেশবচন্দ্র কলেজের পাঠ্যাতিরিক্ত দর্শনশাস্ত্র (Mental and Moral Philosophy) অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন—তাঁহারা প্রায়ই কেশবচন্দ্রকে কলেজ-লাইব্রেরীতে এই বিষয়ক পুস্তকাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে দেখিতেন। কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রিচার্ড জোন্‌সের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন কেশবচন্দ্র। প্রতাপচন্দ্র লিখিতেছেন :

> "He (Keshub) was exceedingly attached to Mr. Jones, the professor of philosophy, who took a great deal of interest in his progress and gave special attention to his training, for all which Keshub was looked upon by students in general as a sort of youthful philosopher."

কেশবচন্দ্র এই সময়ে অধ্যয়ন ও অনুধ্যানে কিরূপ তৎপর ছিলেন, প্রতাপচন্দ্র সে সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে কিছু কিছু লিখিয়াছেন। কেশবচন্দ্র প্রতিদিন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী—মেটকাফ হলে সকাল ১১টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শনের গ্রন্থাদি তাঁহার বিশেষ পাঠ্য বিষয়; তন্মধ্যে দর্শনের ইতিহাস পাঠে তিনি যত আনন্দ পাইতেন এমন আর কিছুতেই নয়। তিনি মিল্টন, ইয়ং-এর কবিতাও পাঠ করিতেন,

সেক্সপীয়রের তো তিনি ছিলেন একান্ত অনুরাগী। তবে তিনি উপন্যাস আদৌ পছন্দ করিতেন না। সর্ উইলিয়ম হ্যামিলটনের প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরিত না। ভিক্টর কুঁজোর গ্রন্থাবলী তিনি অহরহ পাঠ করিতেন। জে. ই. ডি মোরেল, ম্যাকোষ, থিয়োডোর পার্কার, মিস কবের রচনাবলীও তাঁহার সজাগ দৃষ্টি এড়াইত না। এমার্সনের প্রতি তাঁহার অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার মত ঐরূপ বিভিন্ন বিষয়ের নিয়মিত পাঠক তখন ক্বচিৎ দেখা যাইত।* প্রতাপচন্দ্র আরও বলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোন কিছু জানিবার পূর্ব্বেই কেশবচন্দ্র এই সকল গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্মবিষয়ক প্রাথমিক তথ্যগুলি সম্বন্ধে একটি ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন।

মেটকাফ হলে কেশব কর্ত্তৃক এইরূপ অধ্যয়ন কলেজ-ত্যাগের পরেই বেশীর ভাগ চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নের শেষ দুই বৎসরের মধ্যে কেশব-জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় ব্যাপার ঘটে। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে কেশবচন্দ্র সেই তরুণ

* "From eleven o'clock in the morning till about six o'clock in the evening, he read regularly everyday in Metcalfe Hall, which is the only large public library we have in Calcutta. He read theological and metaphysical works mostly, the history of philosophy being his delight. He read some poetry such as Milton and Young, he gloried in Shakespeare at all times, but he hated novels of all kinds. He was an intense admirer of Sir William Hamilton, and poured over the works of Victor Cousin. He read J. E. D. Morell and M'Cosh; loved the works of Theodore Parker, Miss Cobbe and praised Emerson. He was a versatile and voratious reader in those days. His mind had already formed the elementary conceptions of religion before he knew anything of the Brahmo Somaj."—*The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen.* p. 69.

বয়সেই আত্মোন্নতিমূলক ও সমাজ-কল্যাণকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। এই সময়ে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মমতের বিবর্ত্তন সুরু হয় এই সময় হইতে।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি

প্রতাপচন্দ্রের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, বিভিন্ন সদ্‌গুণবশতঃ, বিশেষতঃ নিয়ত অধ্যয়ন ও অনুধ্যান হেতু, কেশবচন্দ্র কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠেন। ডিরোজিও-যুগের 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'-এর মত এ-সময়েও কলেজের যুবছাত্রগণ সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সভার সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর এইচ. হেলিউর (১৮৫৬-৬২)।

বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্র এই সোসাইটির ছাত্র-উদ্যোগীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র বলেন, কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই সমবয়স্ক এবং বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধুদের লইয়া ছোটখাট ক্লাব, সঙ্ঘ ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেখানে সাহিত্য ও পাঠ্য বিষয়াদি সম্বন্ধে আলোচনা হইত। প্রতাপচন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্দেশ্য স্বল্প কথায় এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—"The culture of literature and science", অর্থাৎ সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলন। প্রতি মাসে সভার একটি করিয়া সাধারণ অধিবেশন হইত। এই সভায় ছাত্র, অধ্যাপক ব্যতীত ঐ সময়কার বিখ্যাত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় যোগদান করিতেন। প্রতাপচন্দ্র বলেন, ইউনিটেরিয়ান পাদ্রী সি. এইচ. এ. ড্যাল এবং চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটির পাদ্রী জেম্‌স লঙের

মধ্যে বাদবিতণ্ডা যুব-সভ্যদের নিকট বিশেষ উপভোগ্য অথচ শিক্ষাপ্রদ হইত।* মধ্যে মধ্যে বাহির হইতে শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষানুরাগী বক্তাদের দ্বারা সোসাইটির অধিবেশনে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা হইত।

সোসাইটির একটি অধিবেশনের বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে† পাইয়াছি। এই অধিবেশন হয় ১৮৫৭, ২০শে আগষ্ট দিবসে। প্রধান বক্তা ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ মিঃ কার্কপেট্রিক। সভার আরম্ভেই সভাপতি হেলিয়ুর এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, এমন একটি হিতকারী সভার প্রতি যেমন সংবাদপত্র তেমনি জনসাধারণ সমান উদাসীন। এই সভায় কুড়ি বৎসরের নিম্নবয়স্ক আশী-নব্বই জন ছাত্র, পাদ্রী ড্যাল এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কার্কপেট্রিকের বক্তব্য বিষয় ছিল—"On the Duties of Man", বা মানুষেব কর্ত্তব্য সম্পর্কে। বক্তাব পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষণের পরে সভাপতি অধ্যাপক হেলিয়ুর বসায়নশাস্ত্রেব, বিশেষতঃ কৃষি-রসায়নেব চর্চ্চার জন্য যুবকগণকে উপদেশ দেন। কেননা এই বিষয়ের চর্চ্চায় সমাজের আশু কল্যাণ সম্ভব। পাদ্রী ড্যাল আলোচনায় যোগদান কবিয়া একটি উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা কবেন। তাঁহার বক্তৃতাব কিয়দংশ সংবাদপত্রে যেরূপ বাহিব হইয়াছিল সেইরূপই এখানে উদ্ধৃত হইল:

> "He (Dall) strongly reminded his hearers that they should never forget this valuable axiom 'Truth helps Truth,' and that every new discovery should have, and did have, for its object, amelioration in the social condition of mankind. They should reflect that man was made of power, of wisdom, of justice, of love, and such being the cases it ought to be one of their main and principal endeavours in this world to render themselves

* ঐ, পৃঃ ৬৫।

† *The Englishman*, 22nd August 1857.

useful, useful to themselves, useful to their friends, useful to their neighbours, and to the rest of the world."

ড্যাল সাহেব বলেন, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত মানব-জাতির কল্যাণ। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর প্রত্যেককেই শক্তি, জ্ঞান, ধর্ম্মবুদ্ধি, প্রেম দিয়াছেন। এ কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য নিজেদের, বন্ধুদের, প্রতিবেশীদের এবং জগদ্বাসীর হিতসাধন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বৎসরখানেকের মধ্যেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিখ্যাত বেথুন সোসাইটির ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণে এই সোসাইটি সম্বন্ধে নিম্নরূপ উল্লেখ আছে :

"The (Bethune) Society has much pleasure in recording that its example has been followed by some of the distinguished students of the Presidency College. who have established an Association for the purpose of discussing literary and scientific subjects, and it is sincerely hoped it may live long and increase in usefulness."*

সোসাইটি যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বেথুন সোসাইটি উহাকে অভিনন্দিত করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি অল্পকাল পরে বহুবাজার ফেমিলি লিটারারি ক্লাব 'গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের' সঙ্গে মিলিয়া যায়।

কলুটোলা ইভিনিং স্কুল

কলুটোলা ইভিনিং স্কুল বা সান্ধ্য বিদ্যালয় আর একটি প্রতিষ্ঠান যাহার সঙ্গে কেশবচন্দ্র ছাত্রাবস্থায়ই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়িলেন।

---

* *The Bengal Hurkaru*, January 22, 1858.

কলুটোলা সেন-পরিবারের যুবকগণ কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্রের নেতৃত্বে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিনব শিক্ষায়তনটি স্থাপন করেন। এরূপ বিদ্যালয় এতদঞ্চলে ছিল না। প্রতিবেশী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছাত্রদের এবং যাহারা দিবাভাগে কর্মে লিপ্ত থাকে, তাহাদের নিমিত্ত এই সান্ধ্য বিদ্যালয়টির সূচনা। কেশবচন্দ্রের ইংরেজী জীবনী-গ্রন্থে প্রতাপচন্দ্র এ বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।* সেন-পরিবারের যুবকগণ নব্যশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ। ইংরেজী সাহিত্য, কাব্য, নাটকের আলোচনায় তাঁহারা মশগুল। সেক্সপীয়র অধ্যয়ন তখন নব্যশিক্ষিতদের একটা ফ্যাশনে দাঁড়াইযাছিল। কলুটোলার সেন-পরিবারের যুবকগণও ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা নিজেরা জ্ঞানলাভেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, অর্জিত জ্ঞান সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেও অগ্রণী হইলেন।

কলুটোলার সান্ধ্য বিদ্যালয়ে কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন নিয়মিত ভাবে পড়াইতেন। শিক্ষাদান ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনে কেশবচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। "Lex" ছদ্ম নামে এক পত্রপ্রেরক ১৮৫৭, ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলুটোলা ইভিনিং স্কুলের একটি বিবরণ দিয়া সংবাদপত্রে† একখানি পত্র লেখেন। পত্রশেষে বিদ্যালয় পরিচালনে কেশবচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :

> "In conclusion we cannot be so thankless as to refrain from acknowledging the warmth of heart, the highness of spirit, the honesty of purpose and the amiableness of disposition of Babu Keshub Chunder Sen, who has all along taken and still takes a

---

* *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, pp. 66-7.

† *Hindu Intelligencer*, March 2, 1857.

very active part in the instruction of the students and the management of the school."

কেশব-চরিত্রের সুন্দর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণে এবং ছাত্রদের শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব সম্পর্কে সুষ্ঠু উল্লেখ আমরা এখানে পাই।

বিদ্যালয়টির তখন দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছিল। মুখ্যতঃ কেশবচন্দ্রের পরিচালনায় ইহা কতটা উন্নতিলাভ করে—তাহারও বিবরণ এই পত্রে পাওয়া যাইতেছে। বিদ্যালয়ে তখন ষাট জন ছাত্র বিনাবেতনে অধ্যয়ন করিতেছিল। বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় মাত্র পঁচিশ টাকা। সেন-পরিবারের যুবক ও আত্মীয়েরা স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে ছাত্রদের পড়াইতেন। উক্ত পরিমাণ টাকা চাঁদা দ্বারা আদায় হইত। প্রথম বৎসরে সাড়ম্বরে ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষা দেশী-বিদেশী বিদগ্ধ জনের সম্মুখে গৃহীত হয়। সেযুগে স্কুল কলেজের বার্ষিক পরীক্ষাগুলি একটি উৎসবের পর্য্যায়ে গিয়া পড়িত। বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, এবং ইহাতে সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত বাগ্মী ভারতহিতৈষী জর্জ্জ টমসন। তিনি এই সময় দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বৎসরের আরম্ভেই ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া সত্তর জনে দাঁড়ায় এবং তাহাদের শিক্ষার মান বিবেচনা করিয়া সাতটি শ্রেণী খোলা হয়। প্রথম বৎসরে শিক্ষকগণ কেহই বেতন লইতেন না, দ্বিতীয় বৎসরে ছাত্র-বৃদ্ধি হেতু বেতন দিয়া কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। পল্লীর মুসলমানগণও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। তাহাদের জন্য বিদ্যালয়ে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী খোলা হইয়াছিল। Lex-এর পত্রে কলুটোলার সেন-পরিবারের যুবকদের ত্যাগপূত

সেবাব্রতের বিশেষ প্রশংসা আছে। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করা হয় তাহা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। দুই বৎসর যাবৎ বিদ্যালয়টি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালিত হইল। ১৮৫৮, ২১শে জানুয়ারী "হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সেন-পরিবারের যুবকদের, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের সেবাব্রত যে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, 'পেট্রিয়টে'র উক্তি তাহাই প্রমাণ করিতেছে। 'পেট্রিয়ট' "The Colootollah Evening School" শিরোনামায় অংশতঃ লেখেন :

> "Some well-meaning gentlemen belonging to the family of Baboo Hurrymohun Sen have founded this benevolent institution of boys of the poor and the working classes, the days, hours of whose life are occupied in anxieties and labours for the acquisition of their daily bread. It has stood the trial and vicissitudes of existence for two years, and bids fair to continue and prosper....... If there is any heterogeneous population of Calcutta whose faculties should be developed and feelings cultivated by the improving and humanising influence of education, it is the working and industrial classes of the city. Much of the intensity and violence of the struggle that is now going on between principle and prejudice will lessen, Indian Society will take a refreshing and encouraging tone, and the work of progress and reform will become comparatively easy. The blessings of consolation and happiness will be diffused among the poor, and health will mark the cheerful faces of labourers and mechanics. The evening school is a novelty in India... ...We would like to see a net-work of such useful and benevolent institutions spread over Calcutta and rear a body of industrious and intelligent men, an honour to themselves and a pride to their countrymen."

'পেট্রিয়ট' বিলাতের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের কথাও এই প্রসঙ্গে বলেন। কলুটোলার বিদ্যালয়টি যাহাতে স্থায়িত্বলাভ করে সে সম্বন্ধে

তিনি কলিকাতার দেশী-বিদেশী প্রধানগণকে সজাগ ও সচেষ্ট থাকিবার নিমিত্ত আবেদন জানান। এহেন বিদ্যালয়টিও কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হইল না। প্রতাপচন্দ্র বলেন, ইহা তিন কি চারি বৎসরকাল চলিয়াছিল। বিদ্যালয়টি পরিচালনা-কালেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র আর একটি সভা বা সম্প্রদায় গঠন করেন এবং ক্রমে তাহার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি তিনি নিয়োজিত করেন। এ বিষয় পরে বলিতেছি।

বিবাহ

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে, আঠারো বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন তাঁহাব বিবাহসম্বন্ধ স্থির করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দেব ২৭শে এপ্রিল কলিকাতা হইতে ছয় মাইল দূরে বালীগ্রাম-নিবাসী চন্দ্রনাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা জগন্মোহিনী দেবীর সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিবাহ হইল। ঐ দিন খুব ঝঞ্ঝাবাত হয় এবং এবং গঙ্গা-পারাপারে কষ্টের অবধি ছিল না। কেশবচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার জননী সারদাসুন্দরী দেবী অনেক কথা লিখিয়াছেন।* এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বিবাহের পরের কথা তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :

> "বিয়ের পর বৌ এক বৎসর বাপের বাড়ী ছিলেন, নয় বৎসর বয়সে আমি তাঁহাকে লইয়া আসি, সেই পর্য্যন্ত আমারই নিকট ছিলেন। আমার ও আমার বড় মেয়ে ফুলেশ্বরীর যত্নে বৌ ক্রমে ক্রমে সুশ্রী ও সুস্থ হইতে লাগিলেন, এবং শেষে অতি সুন্দরী

* 'কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা', পৃ, ৪১-৪।

হইলেন। ধর্ম্মভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌ-এর শ্রী ও সৌন্দর্য্য আরও বাড়িতে লাগিল।"

বিবাহের অব্যবহিত পরে কেশবচন্দ্রের মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি তখনও স্বীয় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু সংযম-নিয়মাদি অভ্যাস-দ্বারা কৃচ্ছ্র সাধনে রত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন:

> "যাহাতে কষ্ট হয়, গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হয়, কুচিন্তার দিকে মন না যায়, এমন সকল বিষয়েই নিযুক্ত হইতাম। এই সকল হইল কখন? আঠার, উনিশ, কুড়ি বৎসরে। যখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিব, সংসারের বাড়ী যেখানে করিব, দেখি, এই জায়গাই ত শ্মশান। সংসারের বিষয় বিশেষ বুঝিতাম না, কিন্তু সংসারের ভয় জানিতাম। স্ত্রী আসিতেছেন, সংসার আরম্ভ করিতে হইবে।...আমি ভাবিলাম, উচ্চ পদার্থ জীবাত্মা, একে আমি স্ত্রীর অধীন করিব? সংসারের অধীন করিব? প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ জীবনে স্ত্রৈণ হইব না; কেননা স্ত্রীর অধীন হইয়াই অনেককে মরিতে দেখিয়াছি।"* ইত্যাদি ইত্যাদি।

"গুড উইল ফ্র্যাটার্নিটি"

কেশবচন্দ্র ধনীর সন্তান, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত; কিন্তু নিয়ত অধ্যয়ন অনুশীলনের ফলে তাঁহার মনে এক ধরনের নীতিবোধ ইতিমধ্যেই জাগ্রত হইয়াছিল। তিনি আমিষ আহার পরিত্যাগ

* 'জীবনবেদ', সপ্তম সংস্করণ, পৃ. ২৮।

করিলেন, নিয়ম-সংযমে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন। নিয়ম-সংযমের মধ্যেই তাঁহার বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইল। ত্যাগপূত সেবাধর্ম্মে তাঁহার নিয়ম-সংযমের প্রথম অভিব্যক্তি; দ্বিতীয় অভিব্যক্তি এই 'গুড উইল ফ্র্যাটার্নিটি' প্রতিষ্ঠায়। কেশব-ভক্ত এবং কেশবসহযোগী প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন, এই সংস্থাটি মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ একটি ধর্ম্মীয় সংস্থা। সেন-ভবনের এক কক্ষে কেশবের নেতৃত্বে কয়েকজন বন্ধু ও সহযোগী মিলিত হইতেন এবং ব্যক্তিগত মনের ভাব ও চিন্তাগুলি সকলের সম্মুখে ব্যক্ত করিতেন। কেশবচন্দ্র বিভিন্ন উচ্চভাবপূর্ণ গ্রন্থাদি হইতে কিয়দংশ পাঠ করিতেন, এবং অন্যেরা তাহা মনোযোগের সহিত শুনিতেন। ড° চামার্স-এর "Enthusiasm" শীর্ষক রচনা এবং থিওডোর পার্কারের "Inspiration" বিষয়ক উপদেশ কেশব-কর্ত্তৃক সাগ্রহে এবং সোৎসাহে পঠিত হইত। এই সভাটি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং দুই বৎসর যাবৎ জীবিত থাকে। সভার অধিবেশনে উক্ত গ্রন্থাদি হইতে পাঠ ব্যতীত কেশবচন্দ্র প্রায়ই উপস্থিতমতে ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতাদের প্রাণে সেই সময়েই এক অভূতপূর্ব্ব আবেশ এবং অননুভূতপূর্ব্ব প্রেরণার সঞ্চার হইত। এ সম্পর্কে প্রতাপচন্দ্রের কথাগুলিই এখানে উল্লেখ করি:

> "At the Goodwill Fraternity which continued its activity for full two years, Keshub often preached extempore in English with great enthusiasm. Nay, all his intelligence, energy, and moral earnestness became ignited with an ascetic glow that burned fiercely in him. Every young man who heard him became similarly excited. He drew men chiefly by his enthusiasm. He spoke loud and long, poured forth a torrent of words and feelings, becoming often hoarse and exhausted at the end of his discourse."*

* *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, pp. 67-9.

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। এই উদ্ধৃতি হইতে জানা যাইতেছে, 'গুড উইল ফ্র্যাটার্নিটি'র অধিবেশনে বক্তৃতাদানের ফলে ক্রমশঃ কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতাশক্তিরও স্ফুরণ হইতে থাকে। সভার নেতৃবৃন্দ মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের আহ্বান করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘ দুই বৎসর পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এ সময় তিনি আহূত হইয়া সেন-ভবনের এই ফ্র্যাটার্নিটির সভায় আগমন করেন। তাঁহাকে আনয়ন ব্যাপারে কেশবচন্দ্র অগ্রণী হইয়াছিলেন। প্রতাপচন্দ্র প্রমুখ কেশবচন্দ্রের সহযোগিগণ দেবেন্দ্রনাথদর্শনে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাও তিনি (প্রতাপচন্দ্র) উক্ত কেশব-জীবনীতে বিবৃত করিয়াছেন।

ধর্ম্মমত বিবর্ত্তন

'গুড উইল ফ্র্যাটার্নিটি' স্থাপনের সময় হইতেই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মমত একটি অপূর্ব্ব রূপ পরিগ্রহ করে। কলুটোলা সেন-পরিবার বৈষ্ণব। ঈশ্বরে ভক্তি এবং জীবে প্রেম তাঁহাদের মজ্জাগত। পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে কেশবচন্দ্রের মনে এক প্রকার নীতিবোধ এবং ধর্ম্মভাব পুষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার মন পরিপূর্ণ সায় পাইল না। কলুটোলাস্থ এক বাঙ্গালী শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। ঐ সময়ে কেশবচন্দ্রের অপূর্ব্ব ধর্ম্মবোধ দেখিয়া তিনি এই সমাজের কিছু বইপত্র তাঁহাকে দিলেন। ইহার মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর বিখ্যাত বক্তৃতা "ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ"ও ছিল। কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতা পাঠে ব্রাহ্মধর্ম্মমুখী হইলেন।* তিনি প্রচলিত

* রাজনারায়ণ বসু লেখেন: "কেশবচন্দ্র আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন।"—রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ. ৭৮।

পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করণান্তর সঙ্গোপনে ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষের নিকট উহা প্রেরণ করিলেন। ইহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন প্রবাসে।

ইহার বৎসরখানেকের মধ্যে কেশবচন্দ্রের জীবনে এক গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন কুলগুরুর নিকট অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের দীক্ষার দিন ধার্য্য করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই সময় কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন-কালে কেশবচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়। তাঁহাকে ধরিয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ যাচ্ঞা করিলেন। মহর্ষি মৌখিক কোন পরামর্শ দেন নাই। কেশবচন্দ্র নিজেই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। দীক্ষাগ্রহণের দিন প্রত্যুষে তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। এই ব্যাপারে হরিমোহন খুবই অসন্তুষ্ট হন। কেশব ছাড়াই অন্যদের দীক্ষা গ্রহণকার্য্য সমাধা হইল। কেশব-জননী লিখিয়াছেন :

> "ভাশুরপো মোহিন, যোগীন, ও কেশবের দীক্ষা হইবে সব ঠিক্, গুরু আসিয়াছেন, মহা ঘটা, লোক খাবে। ওমা, সকালে উঠিয়া দেখি, কেশব নাই, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী পলাইয়া গিয়াছেন। কেশব সমস্ত দিন এলেন না। আমি মনে করিলাম বুঝি খ্রীষ্টান হইতে গিযাছেন। আমি অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। রাত্রি দুপুরের সময়ে কেশব বাড়ীতে ফিরে এলেন, আমার জামাই যাদবের নিকট আমার অবস্থার বিষয় শুনিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর আস্তে আস্তে আমার কাছে আসিয়া একখানি বই ও কাগজ আমার কোলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমি পড়িতে লাগিলাম, প্রথমেই,

তুমি কার কে তোমার
তুমি কারে বল রে আপন
মিছে মায়ার নিদ্রাবশে
দেখেছ স্বপন।

এই কবিতাটি পড়িবার পর আমার মন একেবারে জল হইয়া গেল।"*

দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের মধ্যে একজন দৃঢ়সংকল্প, শক্তিমান, ধর্ম্মপ্রাণ যুবকের সন্ধান পাইলেন। কেশবচন্দ্রও শতবিধ অসুবিধা এবং নির্য্যাতন-নিপীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একান্ত ভাবে যোগ দিলেন।

নাটক-অভিনয়

সেক্সপীয়রের প্রতি সে সময়কার শিক্ষিত জনের অনুরাগ, এবং কেশবচন্দ্রে সেক্সপীয়র-প্রীতির কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহাব এই প্রীতি সেক্সপীয়রের কোন কোন নাটকের অভিনয় দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে অনুক্রামিত করিতে তিনি যত্নপর হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হ্যামলেটের অভিনয়ের আয়োজন করেন। এই অভিনয়ে হ্যামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করেন কেশবচন্দ্র স্বয়ং। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'লিয়ারটেজ' এবং নরেন্দ্রনাথ সেন 'ওফেলিয়া'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া একটি

* কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা,' পৃ. ৬৯।

রীতিমত রঙ্গমঞ্চ তৈরী করা হয়। তাঁহাদের এই কার্য্যে সেন-পরিবারের কর্ত্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।*

সেন-পরিবারের যুবকগণ মুরলীধর সেন ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে আর একটি অভিনয়ের আয়োজন করেন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ প্রচেষ্টার অনুকূলে উমেশচন্দ্র মিত্র 'বিধবা-বিবাহ নাটক' লেখেন। সেন-পরিবারের যুবকগণ ইহার অভিনয় করিতে উদ্যোগী হন। রঙ্গমঞ্চের নাম দেওয়া হয় 'মেট্রোপলিটান থিয়েটার।' বড়বাজার সিন্দুরিয়াপটীর বিখ্যাত রাম-গোপাল মল্লিকের ভবনে—যেখানে পূর্ব্বে 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ' স্থাপিত হইয়াছিল সেখানে এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। নাট্যশালার দৃশ্যপটগুলি মিঃ হলবাইন (Holbein) আঁকিয়া দেন। এই রঙ্গমঞ্চে 'বিধবা-বিবাহ নাটক' দুই বার—২৩শে এপ্রিল ও ৭ই মে (১৮৫৯) সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অভিনয় দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। 'সংবাদ প্রভাকর' (১৪ মে ১৮৫৯) এই অভিনয়ের একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। ইহাতে পাই :

> "...সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীধর সেন স্বীয় বন্ধুবর্গ সহযোগে পূর্ব্বতন মেট্রোপলিটান কলেজ বাটীতে এক সুরম্য রঙ্গভূমি স্থাপিত করিয়া কয়েক বার যেরূপ শ্রবণ-মনোহর ও গোচর-সুখকর অভিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয়, বাঙ্গলাভাষায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আর কুত্রাপি হয় নাই। সুদক্ষ কুশীলব মহাশয়েরা অতি সুচারুরূপে অভিনয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কুশীলবের অভিনয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। আর ঘটনাস্থলের প্রতিকৃতির

* প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরেজী কেশব-জীবনীতে (পৃ. ৬৯) এ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে

অধিকাংশই এরূপ চিত্তচমৎকারিণী ও মনোহারিণী হইয়াছে যে তাহা দেখিলে স্বরূপ ঘটনাস্থলই বোধ হয়, রঙ্গস্থলের কাল্পনিক কাব্য বোধ হয় না। অধিক কি কহিব,...দর্শকমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে এই অভিনয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রশংসা করিয়াছেন... ।"

'বিধবা-বিবাহ নাটকে'র অভিনয়ে কেশবচন্দ্র রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন। অভিনয় দ্বারা সমাজ-কল্যাণ সাধন তাঁহার জীবনেব ব্রত ছিল।*

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সংস্রব

কেশবচন্দ্র ছাত্রাবস্থাতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হন। নব্য-শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন কেশবের ধর্ম্মপ্রাণতা শীঘ্রই দেবেন্দ্র-নাথকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিল। দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়-যাত্রার পূর্ব্বেই তত্ত্ববোধিনী-সভার উপর বিরক্ত হইয়া পড়েন। কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার প্রথম কার্য্য হয়—তত্ত্ববোধিনী সভা রহিতকরণ (মে, ১৮৫৯)। ইতিপূর্ব্বেই কেশবচন্দ্র আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-নবেম্বর মাসে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ও তদীয় মধ্যম পুত্র কেশব-বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথের সহিত সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে একান্ত ভাবে পরখ করিয়া দেখিবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি অতঃপর তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহায়তায় দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে সক্রিয় ও সতেজ করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইলেন।

* বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সং, পৃ. ৫১-২।

দেবেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা ও সেবাপরায়ণতার দ্বারাও তিনি সবিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন।

কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে ৮ই মে ১৮৫৯ দিবসে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রতি সপ্তাহে বাংলায় বক্তৃতা দিতেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ এবং ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন কেশবচন্দ্র। সিংহল ভ্রমণের পর কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠনে মন দেন। ১৮৫৯, ২৫শে ডিসেম্বর নূতন অধ্যক্ষ-সভার উপব সমাজ-পরিচালনার ভার অর্পিত হইল। অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি হইলেন রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ বায এবং সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ এতদিন তত্ত্ববোধিনী সভার আওতার মধ্যে ছিল। শেষোক্ত সভা রহিত করিযা দিয়া দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সভারূপে পরিচালিত হইবাব সুযোগ করিয়া দিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের কর্ম্মও করিতে লাগিলেন। এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে পিতামহের সময হইতেই তাঁহার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইযাছিল। কেশবচন্দ্র ব্যাঙ্কের কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই পর্য্যন্ত। এই তাবিখে কর্ম্মে ইস্তফা দিযা তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মসমাজেব কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি যুবক-সমাজের উদ্দেশ্যে বারটি উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

দেবেন্দ্রনাথেব নেতৃত্বাধীনে এবং কেশবচন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতায় অতঃপব ব্রাহ্মসমাজ নব নব কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়। কেশবচন্দ্র তেইশ বৎসরেব যুবক, দেবেন্দ্রনাথ প্রৌঢত্বে উপনীত। উভয়ের ধর্ম্ম-

বিষয়ক বক্তৃতায় এবং রচনায় একদল ছাত্র ও যুবক আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন—'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্তকুমার ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ বসু, উমানাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা), আনন্দমোহন বসু, গিরীশচন্দ্র সেন ইঁহাদের কিঞ্চিৎ পরে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ কর্ম্মমুখর হইয়া উঠিল। প্রধানতঃ কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় এবং উৎসাহে সঙ্গত-সভা এবং ব্রাহ্মবন্ধু-সভা স্থাপিত হইল যথাক্রমে ১৮৬১ ও ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। সঙ্গত-সভা মুখ্যতঃ ধর্ম্মবিষয়ক। ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপত্র এই সঙ্গত-সভারই আলোচনার ফল। ব্রাহ্মবন্ধু-সভায় সাধারণভাবে সমাজোন্নতিমূলক নানা বিষয়ের ও কার্য্যের আয়োজন হয়। 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' প্রচেষ্টা ব্রাহ্মবন্ধু-সভার একটি প্রধান কার্য্য। এ বিষয়ে পরে বলিব। ব্রাহ্মবন্ধু-সভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঁচিশ বৎসরের ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক বক্তৃতা এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় ধারাবাহিক ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল।

সেবাকার্য্যে তৎপরতা

ঈশ্বর-প্রীতি ও পরোপকার—এই দুইটি ছিল দেবেন্দ্রনাথ-উপদিষ্ট এবং কেশবচন্দ্র-পরিপোষিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল কথা। ঔপনিষদিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং জাতীয় সেবাকার্য্য দুই দিকেই দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র অগ্রসর হইলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ-প্রশমনে কলিকাতা

ব্রাহ্মসমাজে একটি সাহায্য-সভা অনুষ্ঠিত হয়, জাতীয় জীবনে এই সভার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ১৮৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভাগীরথীর উভয় তীরে ভীষণ ম্যালেরিয়া মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় এবং সহস্র সহস্র নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। এই সময়ে কেশবচন্দ্র সদলবলে ঐ সব অঞ্চলে গিয়া জনসাধারণকে সময়োচিত সাহায্য দিয়া এবং বিপদে ধৈর্য্যধারণের আশ্বাস দিয়া বিশেষ হিতসাধন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন, তাহা যুবচিত্তে সেবাধর্ম্মের প্রেরণা জাগায়। বিশেষভাবে, সুশিক্ষা এবং সৎশিক্ষা প্রচারও এই সমাজের কর্ম্মসূচীর এক প্রধান অঙ্গ হইল। 'ব্যবস্থা-দর্পণ'-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ শ্যামাচরণ শর্ম্মা-সরকারের সভাপতিত্বে ৩রা অক্টোবর ১৮৬১ তারিখে সমাজ-গৃহে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা করেন তাহাতে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী সম্পর্কে তাঁহার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ পায়। নীতিধর্ম্মবিহীন শিক্ষা সমাজের পক্ষে কি অনিষ্টকর এবং নীতিধর্ম্ম-ভিত্তিক শিক্ষা সমাজের কত কল্যাণসাধন করিতে পারে এই সকল বিষয় ইহাতে বর্ণনা করিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার অব্যবস্থা সম্বন্ধেও বক্তৃতায় আবেগভরে উল্লেখ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে বিলাতের মনীষীবর্গের নিকটে একখানি আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। আবেদনের ফল শুভ হইল। সেখানে অর্থ সংগৃহীত হইলে প্রধানতঃ উক্ত অর্থে কলিকাতায় একটি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় সত্বর প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার নামকরণ হয় 'কলিকাতা কলেজ'। সেযুগে 'কলেজ' কথাটি দ্বারা উচ্চ বিদ্যালয়ও বহু ক্ষেত্রে বুঝানো হইত। কলিকাতা কলেজও ছিল প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালের একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। কলেজ-পরিচালনার ভার পড়িল কেশবচন্দ্র সেনের উপর। এই কলেজ হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইযাছিলেন। তদীয় অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন এখানে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। এই সময় সংবাদপত্র পরিচালনায়ও কর্ম্মতৎপরতা দেখা দিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অধ্যক্ষ সভার নিজস্ব মাসিকপত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত ব্যারিস্টার ইংবেজীনবিস মনোমোহন ঘোষের সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামে একখানি প্রথম শ্রেণীর পাক্ষিকপত্র প্রকাশ করেন ১লা আগষ্ট ১৮৬১ হইতে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর এরূপ একখানি জোরালো পত্রিকাব অভাব অনুভূত হইতেছিল। 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র ম্যানেজিং এডিটর বা বৈষয়িক সম্পাদক পদে বৃত হন কেশবচন্দ্র। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই কাগজখানির সম্পূর্ণ স্বত্ব-স্বামিত্ব কেশবচন্দ্রের হইয়া যায়। কেশবচন্দ্র ১৮৬৪, অক্টোবর মাস (কার্ত্তিক ১৭৮৬ শক) হইতে আব একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামে।

কৃষ্ণনগর

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্যো এবং বিবিধ লোকহিতে মনেপ্রাণে যোগ দিলেন; এজন্য তাঁহাকে প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতে হইত। তবে তিনি ব্যাঙ্কের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাকালীন ব্রাহ্মধর্ম প্রচাবোপলক্ষে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে কৃষ্ণনগরে একবার গমন করেন। তাঁহাব ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতায় রক্ষণশীল হিন্দুরাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং কেশবচন্দ্রকে আন্তরিক সাধুবাদ করেন। ইহার একটি কারণ ছিল। নদীয়া-কৃষ্ণনগরের খ্রীষ্টান মিশনরীদের নিরতিশয় প্রভাব-

প্রতিপত্তি বিগত চতুর্থ দশক হইতেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। এযাবৎ হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিরোধের কোন চেষ্টাই একরূপ হয় নাই। কেশবচন্দ্রের প্রচারেব ফলে খ্রীষ্টানী প্রচেষ্টায় ভীষণ ব্যাঘাত জন্মিল, আবার হিন্দুসমাজও অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। একটি সভায় কৃষ্ণনগরস্থিত পাদ্রী ডাইসন কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এই বক্তৃতায় বিশেষ ফলোদয় হইল না। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া খ্রীষ্টানদেব বিরোধিতা করিতে প্রয়াস পাইল। ইহার তিন বৎসর পরেও কেশবচন্দ্রের কৃতিত্বের প্রশংসায় কৃষ্ণনগরবাসী মুখর ছিলেন। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নয় বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগবে অধ্যয়ন করিতে গিয়া ইহা অবগত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ স্মৃতিকথায় বাল্যকালে শ্রুত এই কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্মে ঐকান্তিক আসক্তি এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে নিষ্ঠা দেখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দেব ২৩শে জানুয়ারী কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ" উপাধিতে ভূষিত কবেন। ঐ বৎসবের ১৩ই এপ্রিল নববর্ষের দিনে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের 'আচার্য্য'পদ প্রাপ্ত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহাব পব 'প্রধান আচার্য্য'রূপে আখ্যাত হইতে থাকেন। অতঃপব ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দেও কেশবচন্দ্র একবার পাদ্রীদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন। এবাব তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার' পত্রের সম্পাদক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। রেভারেণ্ড দে'র উক্তিব প্রতিবাদে কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন তাহাতে ইউরোপীয় পাদ্রীরা স্তম্ভিত হইলেন। কেশবচন্দ্রের সার্থক জবাবে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ পর্য্যন্ত এই মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন: 'The Brahmo Samaj is a power of no mean order in the midst of us'। গত

শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের প্রথমার্দ্ধে সাধারণ মানুষের ভিতরে নূতন চেতনার দ্বারা আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ তথা কেশবচন্দ্রের কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই পরিক্রমা

এতাবৎকাল কেশবচন্দ্রেব কার্য্যকলাপ কলিকাতাব মধ্যেই প্রায় নিবদ্ধ ছিল, যদিও তাঁহার শক্তি ও কৃতিত্বের কথা ভারতবর্ষেব অন্যান্য প্রদেশেও ছডাইয়া পডিয়াছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি দক্ষিণ ভাবত পর্য্যটনে বাহির হইলেন। এই বৎসর ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাত্রা করেন এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই পরিভ্রমণ সমাপনান্তে এপ্রিল মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই দুই প্রদেশে দুই মাসের অধিক কাল থাকিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে রত হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তিনি ঐ দুই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করিযা নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে মিলিতে থাকেন। ফলে, সাধারণ শিক্ষিতদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভেরও সুযোগ পাইলেন। নানা সভায় বক্তৃতা দিয়া তিনি তাঁহাদেব ভিতরে চেতনার উদ্রেক করিতে প্রয়াসী হন। পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত দেশকর্ম্মী কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট বিলাত-প্রবাসী দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে বোম্বাইয়ে কেশবচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বোম্বাই ও মাদ্রাজে ধর্ম্মসমাজ স্থাপিত হইল। বোম্বাইয়ের সমাজ 'প্রার্থনা-সমাজ' নামে আখ্যাত হয়। প্রার্থনা-সমাজের প্রাণ ছিলেন মহাদেবগোবিন্দ রাণাডে। পূর্ব্ব দশকে রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আদর্শে মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে

রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ দশকে ধর্ম্ম সমাজও স্থাপিত হইল। আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্যবোধের উন্মেষে বাঙালী নেতৃবৃন্দ আগাইয়া আসেন। ব্যক্তিগত কারণ ব্যতিরেকে সমষ্টিগত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ভারত-পরিক্রমায়ও তাঁহারা লিপ্ত হন। বর্ত্তমানকালে কেশবচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম ইহার পথ দেখান। কেশবচন্দ্র দক্ষিণ ভারত পর্য্যটনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বেথুন সোসাইটির ১২ই জানুয়ারী ১৮৬৫ দিবসীয় মাসিক অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া তিনি এই মর্ম্মে মন্তব্য করিলেন :

"The lecturer then proceeded to discuss the question, which, a comparative view of native society in the three Presidencies, had suggested to his mind, namely, the mission, which each was destined to fulfil in the great future of India. The mission of Bombay seemed to him to be the promotion of the material prosperity of India, her activity and enterprise, and her first rate business habits and talents, rendering her peculiarly qualified for that great task. Madras, he thought, would, from her conservation and orthodoxy, effectively prevent the introduction of foreign fashions into the country, and guard her against inroads on the purity of her national institutions and primitive manners. The mission of Bengal was the promotion of intellectual and political prosperity."*

বোম্বাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য,মাদ্রাজের রক্ষণশীলতা এবং বঙ্গের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টা ভাবী ভারত সংগঠনে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে—কেশবচন্দ্রের উক্তি হইতে এই কথা সূচিত হয়। গত যুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় কেশবচন্দ্রের উক্তির দূরদর্শিতা ও যথার্থতা আমাদের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

* The Proceedings and Transactions of the Bethune Society, from November 10th, 1859 to April 20th, 1869, p. LXX.

ভাঙা-গড়া ঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ কেশব-জীবনের একটি কঠিন পরীক্ষাকাল। তিনি এই সময়ে এরূপ কতকগুলি কার্য্যে হাত দেন যাহাতে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামী যুবকদল সমাজ-সংস্কারকে ত্বরান্বিত করিতে চাহেন, উপাচার্য্যদের উপবীত ত্যাগ ও গ্রহণাদি কয়েকটি ব্যাপারের প্রতিবাদ দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীরা পছন্দ করেন না—কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধ ও মনান্তরের কারণস্বরূপ এই বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সমসাময়িক ঘটনাসমূহ একটু তলাইয়া দেখিলে এগুলি গৌণ কারণ বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। কেশবচন্দ্র সংস্কারমূলক ব্যাপারগুলি ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের পর একটি প্রতিনিধিস্থানীয় মণ্ডলী স্থাপন করিতে অভিলাষী হন, যাহা শুধু বাংলার নহে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ধর্ম্ম-সমাজগুলির মধ্যেও যোগাযোগ স্থাপন করিয়া পরস্পর উন্নতি সাধনে যত্নপর হইবে। বঙ্গদেশে প্রতিনিধি-সভা গঠিত হইল, নিয়মাবলীও রচিত ও গৃহীত হইল। এইরূপ প্রতিনিধি-সভার কয়েকটি অধিবেশন এই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ প্রতিনিধি-সভা গঠনের প্রস্তাবেই দেবেন্দ্রনাথ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। পাছে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃত্বভার প্রতিনিধি-সভার হাতে চলিয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি ট্রাষ্টীর ক্ষমতাবলে উহার কর্ত্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন পরিচালকপদে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বসান। কেশবচন্দ্রের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হইল; কেশবচন্দ্র প্রকাশ্য সভায় এরূপ কার্য্যের

সমালোচনা করিতে ছাড়িলেন না। এইভাবে বিরোধ ক্রমে বিচ্ছেদে পরিণত হইল। কেশবচন্দ্র সদলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি নিজ হস্তে 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কেশবচন্দ্র—অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হন। এই প্রথম তিনি ফরিদপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ পরিভ্রমণ করেন। এই সময় ময়মনসিংহে গিরিশচন্দ্র সেন তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হন।

কেশবচন্দ্র স্বপক্ষীয়দের লইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু কর্ম্মের গতি আদৌ ব্যাহত হইল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কর্ম্মপ্রতিভা দিকে দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। যেমন চিন্তাজগতে তেমনি কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইল। এই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঁহারই উদ্যোগে একটি মহিলা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরণের সম্মেলন এই প্রথম। মনে হয় এই সম্মেলন হইতে 'ব্রাহ্মিকা সমাজে'র উৎপত্তি। ভারতীয় মহাজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে নারীরও যে সহযোগিতা আবশ্যক এবং তদুপযোগী শিক্ষায়ও যে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে এ বিষয়টি কেশবচন্দ্র মনেপ্রাণে বুঝিয়াছিলেন। এই বৎসরে তাঁহার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কার্য্য—কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে তৎকর্ত্তৃক Jesus Christ : "Europe and Asia" বক্তৃতা প্রদান (৫ই মে ১৮৬৬)। এই বক্তৃতা লইয়া তখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইংরেজগণ তাঁহাকে 'খ্রীষ্টান' বলিয়া ধারণা করিয়া লইল। এই বক্তৃতাপাঠে তৎকালীন বড়লাট লর্ড লরেন্স তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইতে আগ্রহান্বিত হন। দেশীয়দের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথের পক্ষীয়েরা এই বক্তৃতার সবিশেষ আলোচনা

করেন। এই সব তর্ক-বিতর্ক ও ভুলবুঝাবুঝি দেখিয়া কেশবচন্দ্র এই বৎসরের ২৮শে সেপ্টেম্বর "Great Men" শীর্ষক দ্বিতীয় বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতায় জগতের মহাপুরুষদের জীবনাদর্শ বিবৃত করিয়া তিনি তাঁহাদের প্রতি নিজ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সারাংশ সংগ্রহপূর্ব্বক এই বৎসরে 'শ্লোক-সংগ্রহ' বাহির করা হইল।

এদিকে ব্রাহ্ম-প্রতিনিধি-সভার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান মিররে' কেশবচন্দ্র স্বনামে ও তাঁহার অনুপ্রেরণায় অন্যেরা প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। বার বার এই সভার অধিবেশন হয়। শেষে ১লা নবেম্বর শতাধিক ব্রাহ্মের আহ্বানে প্রতিনিধি-সভার একটি সাধারণ সম্মেলন আহূত হইল। ১১ই নবেম্বর (১৮৬৬) সভার অধিবেশনে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হয়। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামকরণের হেতু কি? এ বিষয়ে অনেকের হয়ত পরিষ্কার ধারণা নাই বাংলাদেশে কেশবচন্দ্রের জন্ম, বাংলার অবস্থা তাঁহার বিশেষ জানা। দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ করিয়া বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিষয়ও তিনি অবগত হইয়াছেন। উত্তর-ভারত পর্য্যটনে তিনি তখনও বাহির হন নাই। কিন্তু স্বীয় অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টিবলে তিনি সমগ্র ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইণ্ডিযান এসোসিয়েশন ভারতের শুধু ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলসমূহের ঐক্য কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র ধর্ম্মক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের ঐক্যচিন্তাকে এই কথাটির মধ্যে রূপ দিতে চাহিলেন—তাই তৎ-প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'; ইংরেজী নাম—"The Brahmo Samaj of India": মাত্র 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' নহে। ধর্ম্মক্ষেত্রের এই ভারতীয়তাবোধ ক্রমে অন্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই একথা জানেন।

মিস মেরী কার্পেণ্টার

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে বিলাত হইতে মিস মেরী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি কলিকাতায় আসিলেন ২০শে নবেম্বর তারিখে। বিলাতের সমাজ-বিজ্ঞান-সভাব অন্যতম উদ্যোক্তা; কারা-সংস্কার, অপরাধী এবং দরিদ্র ইংরেজ সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা তিনি বিলাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভারতবাসীদেব, বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগীদেব নিকট আর একটি কারণে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। রাজা বামমোহন বায়ের শেষ জীবনে, বিলাত-প্রবাসকালে, মিস কার্পেণ্টাব তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। 'রামমোহনের শেষ জীবন' শীর্ষক তাঁহার একখানি ইংরেজী পুস্তকও ছিল। তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনেব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—এখানকার স্ত্রীজাতিব উন্নতি-সাধন এবং সেহেতু সুষ্ঠু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। কেশবচন্দ্র স্বতঃই তাঁহাকে সাদব অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। কলিকাতায় একটি ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল স্থাপনের জন্য তিনি মিস কার্পেণ্টারকে সকল বকম সাহায্য করিলেন। বেথুন স্কুলের সঙ্গে সরকাব এই নর্ম্মাল স্কুল বা শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষণ বিভাগও খুলিয়াছিলেন। এদেশে আসিবার পর মিস কার্পেণ্টার বিলাতস্থ সভার আদর্শে কলিকাতায় একটি সমাজ-বিজ্ঞান-সভা গঠনেও উদ্যোগী হন। বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্র এ বিষয়েও মিস কার্পেণ্টারকে সবিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী 'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স এসোসিয়েশ্যান' নামে এই সভা স্থাপিত হয়। বিলাত হইতে ফিরিবার পর কেশবচন্দ্র এই সভার সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে বিষয় পরে বলিব।

উত্তর-ভারত পরিক্রমা

ইহার পর কেশবচন্দ্র উত্তর-ভারত পরিক্রমায় বাহির হন। তিনি বর্দ্ধমান হইতে ৭ই জানুয়ারী (১৮৬৭) রওনা হইয়া পাটনা, এলাহাবাদ, কানপুর, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, এবং পরে মুঙ্গের হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন (১৫ই এপ্রিল)। এই উত্তর-ভারত পরিক্রমা নানা দিক দিয়াই সার্থক হইয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতের মত উত্তর-ভারতেও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কেশবচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম পরিভ্রমণ করিলেন। ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার মূল উদ্দেশ্য; প্রত্যেকটি স্থলে বক্তৃতা, উপদেশ ও উপাসনার মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত সাধারণের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের ভিতরকার সুপ্ত জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবোধের উন্মেষে এই সমুদয় বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। তিনি পাঞ্জাবে অবস্থানকালে শিখজাতির ঐতিহ্যপূর্ণ আচার আচরণ প্রত্যক্ষ করেন। এই সমাজের ভালমন্দ অনেক কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই শিখ সম্প্রদায় ভারতবর্ষে একটি শক্তির মূলাধার। শিখ সমাজের মধ্যেই ভারতবর্ষে আধুনিককালের গণতন্ত্রের অনুরূপ শাসনপদ্ধতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্ব সমাজের ভিতরেও শিখ সমাজের গণতান্ত্রিক প্রথা চালু করিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। কয়েক মাস পরে ১৮৬৭, ১৯শে ডিসেম্বর বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে তিনি একটি বক্তৃতা করেন, তাঁহার উত্তর-ভারত পর্য্যটনের অভিজ্ঞতার অংশ-বিশেষ লইয়া। এবার তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—"A Visit to the Punjab।" শিখ জাতির কথাই ছিল তাঁহার বক্তৃতার প্রধান বিষয়বস্তু। এই বক্তৃতার

শেষেও তিনি ভারতে মহাজাতির সংগঠনের ভিত্তি-কথার উল্লেখ করেন। উপসংহারে তিনি বলেন:

> "He concluded by saying that from what he had seen of Madras, Bombay, Bengal and the Punjab, he was of opinion that...had a noble and distinctive mission to accomplish, and that much depended upon the blending of all the races by instituting a system of active co-operation among the educated natives of all Presidencies and Provinces."*

প্রচলিত ধারণা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সাধারণের একটি মিলনক্ষেত্র রচনার কথা সর্ব্বপ্রথম এলেন অক্টেভিয়ান হিউমই বলিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে, কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র সেন এরূপ একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। আর শুধু উল্লেখ করা নয়, তিনি বেথুন সোসাইটিকে এরূপ একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনায় অগ্রণী হইতে অনুরোধ জানান।

বিবাহ-আইন আন্দোলনের দ্বিতীয়বার

(উত্তর-ভারত পরিক্রমা)

কেশবচন্দ্রের সমাজোন্নতির ভাবনা ও কর্ম্মৈষণা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ১৮৬৮, ২২শে জানুয়ারী কলিকাতায় বর্ত্তমান কেশব সেন ষ্ট্রীটস্থ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মগণ শ্রেণীবৈষম্য স্বীকার করেন না। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে যে-সব বিবাহ

---

* The Proceedings and Transactiens of the Bethune Society,...etc, p. CXV.

হইতেছিল তাহার বিষয় বিধিবদ্ধ করাইবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কেশবচন্দ্র অগ্রণী হইয়া এই উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মদের সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ ও সবর্ণ বিবাহ (ব্রাহ্মমতে) আইন-সঙ্গত করিয়া লইবার প্রচেষ্টা এই যে আরম্ভ হইল ইহা শেষ পর্য্যন্ত এক অভিনব আকার ধারণ করে এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আইনসিদ্ধ হইয়া '১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন' নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হয়। এই বৎসর কেশবচন্দ্র বাংলাদেশের কোন কোন জেলা-শহরে যান এবং দ্বিতীয়বার উত্তর-ভারত পরিক্রমায় গমন করেন। কেশবের বাগ্মিতা, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং সদাচরণ ঐ সব অঞ্চলের লোকেদের একেবারে আপন করিয়া লইয়াছিল; মুঙ্গেরস্থ এক বিশেষ দল তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেও অগ্রসর হন। এই ব্যাপারে কলিকাতায় ও অন্যত্র নেতৃবৃন্দদের মধ্যে এবং পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায়, এমন কি নিজের অন্তরঙ্গদের মধ্যেও প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু নির্লিপ্ত ও নিরপরাধ কেশব-চন্দ্রের সময়োপযোগী উক্তিতে এই সকল সন্দেহ ও প্রতিবাদের নিরসন হইল।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

নানা কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা কেশবজীবনের একটি প্রধান কীর্ত্তি। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগস্ট সাড়ম্বরে এই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। উপাসনা হয় সমস্তদিনব্যাপী। এখানে নরনারীর সমান অধিকার প্রকাশ্যে ঘোষিত হইল। এইদিন সায়ংকালীন উপাসনার পূর্ব্বে ব্রহ্মমন্দিরে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণবিহারী সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ একুশ জন

আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইঁহারা ব্যতীত দুই জন মহিলাও ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন ; একজন আনন্দমোহন বসুর পত্নী স্বর্ণপ্রভা বসু এবং দ্বিতীয়, কৃষ্ণবিহারী সেনের নবমবর্ষীয়া পত্নী যাদুমোহিনী দেবী। ইহার পর হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা চলিতে লাগিল। প্রধান-উপদেষ্টা—কেশবচন্দ্র সেন। মন্দিরের উপাসনা ও বক্তৃতা হইত বাংলায়। কেশবচন্দ্রের সুললিত বাংলা বক্তৃতায় জ্ঞানীগুণীরাও আকৃষ্ট হইতেন। কথিত আছে, বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় অবস্থানকালে প্রতিদিন কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। তাঁহার সহজ সরল বাংলা বঙ্কিমচন্দ্রকে বড়ই আকৃষ্ট করিত। ইনি কেশবচন্দ্রের কোন কোন সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা হয়ত অনুপ্রাণিত হইয়াও থাকিবেন। অবশ্য এ বিষয়টি আরও অনুধাবন ও অনুসন্ধানসাপেক্ষ। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইংলণ্ড ভ্রমণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিলেন। সমাজের কার্য্যক্ষেত্র ইতিমধ্যেই বিস্তৃত হইয়াছে। সমুদয় ব্যবস্থা করিতে তাঁহার কিঞ্চিৎ সময়ও লাগিয়া যায়। স্থির হইল, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি বিলাত যাত্রা করিবেন।

ইংলণ্ড-ভ্রমণ

বিলাতে গিয়া ইংরেজ জাতিকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন এবং নিজের ও দেশের উন্নতি সাধনের উপায়াদি বিশেষ ভাবে জানিয়া লইবেন—এই ছিল কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড-যাত্রার মূল উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পাঁচ জন সঙ্গীসহ তিনি কলিকাতা হইতে বিলাত যাত্রা করিলেন। তাঁহার পাঁচ জন সঙ্গী

ছিলেন যথাক্রমে ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দের পিতা), আনন্দমোহন বসু, রাখালচন্দ্র রায়, গোপালচন্দ্র রায় এবং প্রসন্নকুমার সেন। প্রসন্ন-কুমার কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত সঙ্গী ও সচিব ছিলেন। এক প্রসন্নকুমার ব্যতিরেকে সঙ্গীগণ বিলাতে নিজ নিজ শিক্ষা ও কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়েন। কেশবচন্দ্র একুনে কিঞ্চিদধিক সাত মাস পরে ১৮৭০, ২০শে অক্টোবর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিলাতে যে সব বক্তৃতা করেন, তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ সাধারণের বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক হয় এবং এখানে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের কতকটা ভূয়োদর্শনও ঘটে। ইহার ফলে ভারতবর্ষ ও ইউরোপীয় সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। নানা দিক হইতেই কেশবচন্দ্রের বিলাতগমন জাতির পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর হইয়াছিল।

কেশবচন্দ্র বিলাতে গিয়া স্বভাবতই একেশ্বরবাদী ধর্ম্মপ্রাণ ইংরেজ নরনারীর সঙ্গে পরিচিত হইলেন। বিখ্যাত বেদবিদ্যাবিদ অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর, দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল, সমাজসেবী মিস মেরী কার্পেণ্টার প্রমুখ ইংরেজ-প্রধানদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। আবার রাজনৈতিকপ্রবর গ্লাডস্টোনের সঙ্গেও তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। ভারতবর্ষ হইতে আগত পুরুষ-প্রধান কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য রাণী ভিক্টোরিয়াও উদ্‌গ্রীব হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার ঘটে ১৩ই আগস্ট তারিখে। বলা বাহুল্য, এ আলোচনারও মূল বিষয় ছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে। ইহা ছাড়া, কেশবচন্দ্র বিলাতের বিভিন্ন প্রগতিশীল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া উহাদের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন। ব্রিস্টলে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিস কার্পেণ্টার 'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপন করেন। ইহার

উদ্দেশ্য ছিল—বিশেষ ভাবে ভারতীয় নারীজাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-সাধন প্রচেষ্টা। কেশবচন্দ্র এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা দেন এবং মিস কার্পেণ্টারের এবম্বিধ সদভিপ্রায়ের আন্তরিক সমর্থন জানান। ভারতবর্ষের নারীজাতির অবস্থা ও উন্নতিপ্রয়াস সম্পর্কে কেশবচন্দ্র একাধিক সভায় বক্তৃতা করিলেন। ১লা আগস্ট তারিখে 'ভিক্টোরিয়া ডিসকাশন সোসাইটি'র মাসিক অধিবেশনে প্রদত্ত 'ভারতের নারীজাতি' শীর্ষক কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় কোন কোন ইংরেজ মহিলা ভারতবর্ষে নারীগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। মিস এনেট একরয়েড (পরে মিসেস বিভারিজ) তাঁহাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এদেশে আসেন এবং নারীদের শিক্ষাদানে রত হন।*

ভারতবর্ষের শাশ্বত ধর্ম্ম ও ভারতবাসীর ধর্ম্মপ্রবণতা, ভারতীয় নারীজাতির উন্নতিসাধন-প্রয়াস, সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন বক্তৃতায় যেমন ইংরেজ সাধারণকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছিলেন অন্যদিকে তেমনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সু ও কু দিকের প্রতিও তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি একাধিক সভায় ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য, 'সরকারের মাদকদ্রব্য নীতি' প্রভৃতি বক্তৃতায় এদেশস্থ ব্রিটিশ শাসকদের তীব্র সমালোচনা করিলেন এবং এই নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া কিরূপে এই শাসন জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে, সে বিষয়েও নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সকল বক্তৃতার ফলে শাসকমহলে বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের রক্ষণশীল সংবাদপত্রসমূহ কেশবচন্দ্রের উক্তি-গুলির সমালোচনা না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'

---

* *India Called Them* by Lord Beveridge. p. 85.

(তখন বাংলা ও ইংরেজী) বিলাতে কেশবচন্দ্রের কৃতকর্ম্মের আন্তরিক সমর্থক ছিলেন। 'সোমপ্রকাশ' ছিলেন তাঁহার উপর বড়ই চটা, তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যের নিন্দায় যখন এই পত্রিকাখানি রত হইলেন তখন 'ঢাকাপ্রকাশ' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কঠোর ভাষায় ইহার নিন্দাবাদ করেন। 'পত্রিকা' কেশবচন্দ্রের সমর্থনে লেখেন :

> "কেশববাবু ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তা বলিয়া ইংলণ্ডে মহাসমাদর পাইয়াছেন, রাজনৈতিক বক্তা বলিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার বোধ হয় সেখানে স্থান হইত না। তাঁহার বক্তৃতাশক্তিও চমৎকার আছে, ইংলণ্ডবাসীরা তাঁহাকে ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী বলিয়া লইয়াছেন। এমত অবস্থায় কেশববাবুর দ্বারা আমরা দেশের কত উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি। অতএব তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই প্রাণপণে সমর্থন না করিয়া যেখানে কেহ কেহ বিপক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে আমরা ইহাই বলি যে, ভারতবর্ষের পাপের অদ্যাবধি শেষ হয় নাই।" (২১ জুলাই, ১৮৭০)

বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয়, সভা-সমিতিতে যোগদান, বিভিন্ন স্থলে জনসভায় বক্তৃতা—এই সমুদয় কার্য্যেই কেশবচন্দ্র সকল সময় ক্ষেপণ করেন নাই। তিনি ইংরেজ পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এই কাঠামোই তাহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল। ভারতবর্ষে ফিরিয়া কেশবচন্দ্র জাতির আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির দিকে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। জাতি-গঠনের মূলে যে রচনাত্মক কার্য্য তাহা ভুলিলে চলিবে না।

যুব-চিত্তে প্রভাব

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে কেশবচন্দ্র বাঙালী-জীবনে যে ভাব-বন্যা আনিয়া দেন, সপ্তম দশকে তাহা কর্ম্মের মধ্যে বিশেষভাবে স্থিতিলাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রার্থনা-বক্তৃতাগুলি শুনিতে যাইতেন, এরূপ জনশ্রুতির কথা বলিয়াছি। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় ইংরেজী আত্মজীবনীতে যুবচিত্তে কেশবচন্দ্রের প্রভাবের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সপ্তম দশকের প্রথমে আরও বহু কিশোর এবং যুবক তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পরবর্ত্তীকালে নানা কারণে কেশবচন্দ্রের উপর বিরূপ হইয়া উঠেন। কিন্তু যৌবনের প্রথম উন্মেষে কেশবচন্দ্রের আদর্শে কত গভীর ভাবে তিনি আলোড়িত হইয়াছিলেন, আত্মচরিতে তাহার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কৈশোরেও কেশবচন্দ্রের পূর্ণ প্রভাব অনুভূত হয়। অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু কিরূপে খ্রীষ্টান হইতে হইতে কেশবচন্দ্রের প্রাণমাতানো প্রার্থনায় 'হিন্দু'ই রহিয়া গেলেন, নিজে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। ভারত-প্রসিদ্ধ নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তকে বলা হইত "Keshab Chunder Sen of Eastern Bengal", অর্থাৎ, 'পূর্ব্ববঙ্গের কেশবচন্দ্র সেন'। কেশবচন্দ্রের নীতি-ধর্ম্মমূলক উপদেশ ও প্রার্থনা দ্বারা অশ্বিনীকুমার ছাত্রজীবনে কলিকাতায় বাসকালে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত নেতৃবর্গ বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি, ছাত্রজীবনের প্রথম অবস্থায় কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা ও বক্তৃতা দ্বারাও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। এক কথায়, সপ্তম দশকের প্রথমার্দ্ধে কেশবচন্দ্র বাঙালী-জীবনে যে এষণার উদ্রেক করেন,

তাহা দ্বারা সমাজ পরিশুদ্ধ হইয়া নূতন কর্ম্মশক্তি লাভ করে—আর এই কর্ম্মশক্তিই শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে আত্মপ্রকাশ করে। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সংযোগ এই সময়কার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম দুইটিকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়া লইয়াছিলেন। ষষ্ঠ দশকে এই দুইটিই এক বিশিষ্ট পথে চলিয়াছিল। ধর্ম্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠনই ছিল তাঁহার মুখ্য কার্য্য। কিন্তু তাঁহার বরাবর লক্ষ্য ছিল জাতির সেবা, এবং জাতিগঠনকল্পে বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা। প্রথমে দক্ষিণ-ভারত এবং পরে উত্তর-ভারত পরিক্রমায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তিনি স্থিরনিশ্চয় হন। ইংলণ্ড পরিভ্রমণের ফলে তাঁহার এই ধারণা অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ হইল। এ উদ্দেশ্যে বাধাবন্ধহীন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ ও কর্ম্মীদের দায়িত্ব অনেক ; কিন্তু ব্যাপকতর ও বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রতি স্তরে এই ঐক্য-প্রচেষ্টার প্রতিফলন আবশ্যক। আর ইহা সম্ভব সমাজের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়তর হইলে। কেশবচন্দ্র বিলাত-প্রবাসকালে বিবিধ কাজকর্ম্মের মধ্যেও ইংলণ্ডবাসীর আভ্যন্তরীণ শক্তির মূলাধার প্রত্যক্ষ করিতে ভুলেন নাই। ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল বৃহত্তর সমাজের অর্থ-নৈতিক কাঠামো দৃঢ়ীকরণ। সুনীতি, সদাচার, উন্নত-ধর্ম্ম পালন ও অনুষ্ঠান সার্থক করিতে হইলে সাধারণের মূল অভাব ও দৈন্য জানিতে হইবে। এই দুইটি জানিয়া, যত সামান্য আকারেই হউক, ইহা নিরাকরণে প্রয়াসী হইতে হইবে। সমাজের ক্ষতের কারণ শুকাইয়া গেলে দেহ সুস্থ ও শক্তিমান হইয়া উঠিবে। কেশবচন্দ্রের জীবন যাঁহারাই আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার ধর্ম্মচর্চ্চার বিভিন্ন

ও বিচিত্র প্রযাসেব বিষয় অবগত হইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এই 'ধর্ম্মবীর' কেশবচন্দ্রেব চিত্তে বৃহত্তর ভারতীয সমাজের উন্নতি চিন্তাও ফল্গুধারাব মত অগোচবে নিযত বহিযা চলিতেছিল। ইংলণ্ড হইতে ফিরিযা অগোচববাহী সমাজোন্নতি-চিন্তা কর্ম্মেব ভিতরে আসিযা আত্মপ্রকাশ কবিল। 'ধর্ম্মবীব' কেশবচন্দ্র 'কর্ম্মবীর' হইলেন।

ভারত-সংস্কার সভা

কেশবচন্দ্র স্বদেশে ফিরিযাই কর্ম্মসমুদ্রে যেন ঝাঁপাইয়া পডিলেন। তিনি ১৮৭০, ২০শে অক্টোবর কলিকাতায পৌছেন, ইহাব মাত্র বার দিনের মধ্যে একটি বৃহৎ কর্ম্ম-সংস্থা গঠন করেন। তাঁহার সহকর্ম্মী ও অনুবর্ত্তীবা তাঁহাব সঙ্গে সোৎসাহে এই কর্ম্ম-সংস্থায আসিয়া যোগ দিলেন। এই সংস্থাটিব নাম—'ভাবত-সংস্কাব সভা', ইংরেজী নামকরণ হয—"The Indian Reform Association" নামকরণেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয। কেশবচন্দ্রেব কর্ম্মক্ষেত্র বঙ্গদেশ, কিন্তু ভাবতবর্ষের কল্যাণার্থেই ইহাব প্রতিষ্ঠা। কোন প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক হিতার্থে কেশবচন্দ্র ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, সমগ্র ভাবতবর্ষ এবং সমুদয় মানুষই তাঁহাব লক্ষ্য। ভাবত সংস্কাব সভার পাঁচটি বিভাগ, এবং প্রত্যেকটি বিভাগের ভাব যোগ্য কর্ম্মীদেব উপব প্রদত্ত হয। সম্পাদকগণের নামসহ বিভাগগুলি এইরূপে বিভক্ত হইল: (১) স্ত্রী-জাতিব উন্নতি, সম্পাদক—উমেশচন্দ্র দত্ত, (২) শিক্ষা: শিল্প-বিদ্যালয় ও শ্রমজীবীদেব জন্য বিদ্যালয়, সম্পাদক—জযকৃষ্ণ সেন (২য বর্ষে অমৃতলাল বসু ও কৃষ্ণবিহাবী সেন), (৩) সুলভ সাহিত্য, সম্পাদক—উমানাথ গুপ্ত, (৪) সুরাপান ও মাদক নিবাবণ, সম্পাদক—যাদবচন্দ্র

রায় (২য় বর্ষে কানাইলাল পাইন), এবং (৫) দাতব্য, সম্পাদক—কান্তিচন্দ্র মিত্র। সভার কার্য্য প্রধানতঃ এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হইলেও আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারত-সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিভিন্ন বিভাগে ইহার কার্য্য অবিলম্বে সুরু হইল। স্ত্রীজাতির উন্নতি বিভাগে শিক্ষয়িত্রী, বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, ছাত্রীদের সভা (বামাহিতৈষিণী সভা) প্রভৃতি স্থাপিত হয়। এই বিভাগের কথা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বলা হইবে। ভারত- সংস্কার সভার কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা এবং সহকর্ম্মী ব্রাহ্মদের ভিতরে একটি অর্থনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে 'ভারত-আশ্রম' স্থাপিত হয় (১৮৭২)। ২৮শে নবেম্বর ১৮৭০, কলুটোলায় কেশব-ভবনে দ্বিতীয় বিভাগের কার্য্য উদ্‌যাপিত হয়। এই দিনকার সভায় বহু গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতি হন হাইকোর্টের বিচারপতি ভারতহিতৈষী জে. বি. ফিয়ার। শিল্প-বিদ্যালয় এবং শ্রমজীবী বিদ্যালয় এই সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হইল। শিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ধার্য্য হয় এইরূপ: (১) সূত্রধরের কার্য্য, (২) সূচীকার্য্য, (৩) ঘড়ি মেরামত, (৪) মুদ্রাঙ্কন ও লিথোগ্রাফ, (৫) এন্‌গ্রেভিং বা খোদাইয়ের কাজ। এই বিদ্যালয়টি প্রাতে বসিবার কথা হয়। শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় ছিল: (১) ভাষা, (২) গণিত, (৩) সাধারণ ও প্রাকৃতিক ভূগোল, (৪) ভারতবর্ষের ইতিহাস, (৫) বস্তুবিচার, (৬) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (৭) নীতিশিক্ষা। এ ধরনের বিদ্যালয়গুলির হিতকারিতা সভায় সভাপতি এবং অন্যান্য বক্তাদের দ্বারা বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়। ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন-দৃষ্টে কেশবচন্দ্র প্রথম বিদ্যালয়টি স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়

বিদ্যালয়টি ভারতবর্ষের শ্রমিকদের একটি আদর্শ-শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি গঠন করেন। সাধারণ শ্রমজীবীরা (ইহাদের মধ্যে কৃষককেও ধরিতে হইবে) ভারতবর্ষে সংখ্যাগবিষ্ঠ। তাহাদেব মধ্যে জ্ঞানের আলো বিকীবণ করিলে তাহারা নিজেদের জীবন ও জীবিকাকে উন্নত এবং পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারিবে। শ্রমজীবীদের উন্নতি-চিন্তা ও তদনুরূপ কর্ম্মপ্রয়াস দ্বারা কেশবচন্দ্র এ বিষয়ের পথ-প্রদর্শক হইয়া রহিয়াছেন। এই দশকেই বরাহনগবে সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমজীবীদের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনের নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 'ভারত-শ্রমজীবী' পত্রিকা (১৮৭৪) প্রকাশ করেন।

তৃতীয় বিভাগেব কার্য্য আরম্ভ হইল ১লা অগ্রহায়ণ, ১২৭৭ (১৫ই নবেম্বর, ১৮৭০) এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক 'সুলভ সমাচার' প্রকাশ দ্বারা। ইহার পূর্ব্বে এত কম মূল্যের কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। সর্ব্বসাধারণের দেশ-বিদেশের সংবাদ পরিবেশন কবাই ছিল এরূপ পত্রিকাপ্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। সহজ সরল ভাষায় 'সুলভ সমাচারে'র নিবন্ধ ও সংবাদগুলি রচিত হইত। 'সুলভে'র ভাষারই অনুবর্ত্তী ছিল স্বদেশী যুগেব ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা'র ভাষা। ইহার প্রচার অতি দ্রুত বাড়িয়া যায়।

'সুরাপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণ' এবং 'দাতব্য' বিভাগ সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। সুরাপান ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সমাজ-দেহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কবিয়া ফেলিতেছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহার অপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার নিরোধে তৎপর হন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিরোধকল্পে একটি সভা গঠন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র তাহার

একজন সভ্য ছিলেন। প্যারীচরণ তখন 'হিতসাধক' এবং 'Well-Wisher' নামে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় দুইখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কেশবচন্দ্র এই বিষয়টিকে ভারত-সংস্কার সভার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করিয়া দেন। 'সুরাপান ও মাদক-নিবারণ' বিভাগের মুখপত্র ছিল 'মদ না গরল!' এই বিভাগের কার্য্য দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ভারত-সংস্কার সভার পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে সকৌন্সিল বড়লাটের নিকটে আবেদন করা হয়। ইহাতে খানিকটা ফল ফলিল। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকল্পে কতকগুলি বিধি সরকার প্রবর্ত্তন করেন। কেশবচন্দ্র কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুখ্যতঃ সুরাপানের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে তরুণ ছাত্রদের লইয়া 'আশালতা দল' (Band of Hope) গঠন করিলেন। কেশবচন্দ্রের নির্দ্দেশে সভা মাঝে মাঝে পুস্তিকা প্রচার করিতেন। সুরাপান ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিবারণকল্পে অষ্টম দশকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারত-সভার পক্ষ হইতেও জোর আন্দোলন চলিয়াছিল। পরিশেষে ইহা ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

'দাতব্য' বিভাগের কার্য্য ছিল—দরিদ্র ছাত্রদের বেতন ও পুস্তক দিয়া সাহায্য করা, অন্ধ, খঞ্জ, বধিরকে অর্থসাহায্য, বিধবা ও দুঃস্থ পরিবারদিগকে নিয়মিত মাসিক সাহায্য, অনাথ আতুরদিগকে ঔষধপথ্য বিতরণ প্রভৃতি। এই বিভাগও নিজ উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হয়।

ভারত-সংস্কার সভা জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীরই উন্নতিমূলক ও হিতকর প্রতিষ্ঠান। এ দিক দিয়া ইহা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পুরোবর্ত্তী। রাজনীতি ক্রমে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। ভারত-সংস্কার সভার অভ্যুদয়কালে ভারতের রাজনীতিবিষয়ক

আন্দোলনের ভার পড়িয়াছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভার উপর। তখনও রাজনীতি সমাজ-জীবনের সমুদয় বিভাগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে নাই, আবার এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন যাঁহাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্ভবপর ছিল না, অথচ তাঁহারা ভারতবাসীর একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষীই ছিলেন। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না হইয়াও একটি ব্যাপকতর ও বৃহত্তর উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। ইহাতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বী বহু মনীষী যোগদান করেন। সরকারী কর্ম্মচারী, খ্রীষ্টান পাদ্রী, প্রগতিশীল ব্যক্তি, রক্ষণশীল হিন্দু কাহারও যোগ দিতে কোনরূপ বাধা ছিল না। সভাব সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন মতের ও ধর্ম্মাবলম্বীর মিলন ঘটিয়াছিল। সভার প্রতিটি বিভাগই জনকল্যাণকব। কাজেই তাঁহারা সাগ্রহে ইহার কার্য্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ও বিশেষতঃ গান্ধী-যুগে কংগ্রেস জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। রাজনীতি বাদ দিলে, ইহার যাবতীয় কর্ম্মসূচীরই সূচনা দেখিতে পাইতেছি এই ভারত-সংস্কার সভার মধ্যে। ভারত-সংস্কার সভার কার্য্য ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল প্রায় সর্ব্ব বিভাগে। ইহার পরে নানা কারণে সভার কার্য্য অনেকটা সঙ্কুচিত হয়। কলিকাতাস্থ ভারত-সভা সমাজোন্নতিমূলক বহু কার্য্যের ভার তখন গ্রহণ করে। স্ত্রী-জাতির উন্নতি ও শিক্ষা-প্রচেষ্টা কিন্তু তখনও চলিয়াছিল। তবে তখন ইহা ভিন্ন খাতে চলিতে আরম্ভ করে।*

* ভারত-সংস্কার সভার বার্ষিক রিপোর্টগুলি শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণ 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড' ; উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত) পুস্তকের ১৪২৫-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা

ভারতবর্ষের শুধু সামাজিক নয়, সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-চিন্তাও করিয়াছেন কেশবচন্দ্র। বিজ্ঞানের উন্নতি ভারতবাসীর কাম্য। কিন্তু কোন্ সূত্র ধরিয়া ইহার সূচনা সম্ভব, মনীষীগণ তাহার চিন্তায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে মিস মেরী কার্পেণ্টারের* আগমনে বঙ্গদেশে কিরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা দিয়াছিল তাহার আভাস আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা (The Bengal Social Science Association) প্রতিষ্ঠান এতাদৃশ কর্ম্মতৎপরতার একটি উৎকৃষ্ট ফল। বিজ্ঞান-অনুশীলনে স্বাভাবিক আসক্তি কেশবচন্দ্রের ছিল। আবার সমাজের সেবা ও উন্নতির পক্ষে সমাজ-বিজ্ঞান চর্চ্চা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠায় যে তাঁহার যোগ থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র যেমন ভারত-সংস্কার সভা স্থাপন করেন তেমনি বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার সঙ্গেও যুক্ত হন। শেষোক্ত সভার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইল ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ তারিখে। কেশবচন্দ্র অধ্যক্ষ-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইহার শিক্ষা-শাখার সভাপতি-পদও তিনি প্রাপ্ত হইলেন। এই পদে তাঁহার পূর্ব্বে নিযুক্ত ছিলেন পাদ্রী লঙ্। পর পর দুই বৎসর (১৮৭১ ও ১৮৭২) কেশবচন্দ্র সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই

---

* বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক 'বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা'র আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত "প্রবাসী", কার্ত্তিক, পৌষ এবং চৈত্র ১৩৬১ সংখ্যাত্রয়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

দুই বৎসর শিক্ষা-শাখার সম্পাদক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। সমাজ-বিজ্ঞান সভার কার্য্যবিবরণ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র শেষ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। শেষ কয় বৎসর মূল সভার সম্পাদক ছিলেন মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ।

কেশবচন্দ্র ভারত-সংস্কার সভার মাধ্যমে স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধনে বিশেষভাবে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সমাজ-বিজ্ঞান সভার শিক্ষা-শাখার সভাপতিপদ গ্রহণ করিয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা উভয় বিষয়েই সবিশেষ অবহিত হইলেন। শিক্ষা-শাখার সভাপতি-পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রথম সুযোগেই তিনি "ভারতের নারীজাতির উন্নতি" সম্বন্ধে ১৮৭১, ২৪ ফেব্রুয়ারী একটি বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতা হিন্দুযুগ হইতে বিভিন্ন সময়ে নারীজাতির শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে ব্রিটিশ আমলের শিক্ষারীতি সবিস্তারে উল্লেখ করেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ইতিহাস বর্ণনাকালে বক্তৃতাটিতে কিছু কিছু তথ্যগত ভুল দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসের একটি আনুপূর্ব্বিক ধারা আমরা ইহার মধ্যে পাইতেছি। এরূপ ইতিহাস রচনার ইহাই বোধ হয় প্রথম প্রয়াস। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে বিভিন্ন উপায়ও তিনি এই বক্তৃতায় বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিলেন। পর বৎসর ১৮৭২ সনের ১৪ই মার্চ্চ সমাজ-বিজ্ঞান সভার বার্ষিক অধিবেশনে কেশবচন্দ্র "Reconstruction of Native Society" বা 'দেশীয় সমাজের পুনর্গঠন' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় এই কটি বিষয় আলোচিত হয়: (১) শিক্ষাযোগে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তার, (২) খ্রীষ্ট-ধর্মপ্রচার, (৩) ব্রাহ্মসমাজ, (৪) ব্যবস্থাপক সভার সংস্কারমূলক প্রস্তাবাবলী। ইহার পরে দেশের পুনর্গঠনের বিষয়ে তিনি বলেন:

"সর্ব্বপ্রথমে চরিত্রগঠন নিতান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি চরিত্রের উন্নতি না হইল তাহা হইলে জাতির গঠন কিছুতেই হইল না। প্রতি ব্যক্তির চরিত্র যাহাতে গঠিত হয়, তজ্জন্য বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু নীতিশিক্ষা দিতে গেলেই ধর্ম্মের সহিত তাহার যোগ থাকা চাই। গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, এজন্য বিদ্যালয়ে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে গবর্ণমেণ্ট অসম্মত। ইহা অবশ্য ভাল, কিন্তু অসাম্প্রদায়িক 'প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান' (Natural Theology) অনায়াসে বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া শিক্ষকেরা আপনারা সচ্চরিত্র হইয়া দেশের প্রতি, গুরুজনদের প্রতি এবং অপরের প্রতি কর্ত্তব্যশিক্ষা দিতে পারেন। কতকগুলি চরিত্রবান শিক্ষিত লোক হইলে, তাঁহারা আপনাদের প্রভাব চারিদিকে বিস্তার করিতে পারিবেন। নৈতিক বিশুদ্ধতা বিনা সমাজ কখন পুনর্গঠিত হইতে পারে না। প্রতি ব্যক্তির চরিত্র গঠন করিতে গেলে, গৃহের সংশোধন সর্ব্বদা প্রয়োজন। সামান্য শিক্ষালাভ করিয়া নারীগণের বিশেষ অলাভ হইয়াছে। একদিকে তাঁহারা প্রাচীন আচার-ব্যবহারাদির সহিত অনুভূতি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। গৃহকার্য্যে অনিপুণা হইয়া পড়িতেছেন, অপর দিকে নূতন জ্ঞানালোকেও উন্নত হইতেছেন না, নূতনভাবে গঠিতচরিত্র হইতেছেন না।...নারীগণের শৃঙ্খলামোচন নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত। নারীগণ সর্ব্ববিধ কার্য্যে ও ব্যবহারে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবেন, ইহার প্রতিরোধ কে করিবে? তবে নারীগণের বিদ্যাশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, সমাজ-সংস্কারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শৃঙ্খলমোচন হয়, ইহাই

আকাঙ্ক্ষণীয়। শৃঙ্খলমোচনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচার-ব্যবহারাদির সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি অকল্যাণকর ব্যবহাব উঠিয়া গিয়া, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলকর ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়া সমুচিত।"*

সমাজ-বিজ্ঞান সভায় প্রদত্ত এই বক্তৃতায় কতকটা ফল হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব সিণ্ডিকেট 'প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান' শিক্ষা-দান বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। সচ্চবিত্র সেবাপরায়ণ 'মানুষ' গঠনে অশ্বিনীকুমাব দত্ত পববর্ত্তীকালে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইহাও মনে হয় কেশবচন্দ্রেব বক্তৃতাব একটি প্রত্যক্ষ ফল।

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেশবচন্দ্র আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না। উপরোক্ত বক্তৃতায় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কথাতেও তাহা বেশ বুঝা গিযাছে। কেশবচন্দ্র ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভাবত-সংস্কার সভাব সভাপতি এবং সমাজ-বিজ্ঞান সভাব অন্তর্গত শিক্ষা-বিভাগেব নায়ক। কাজেই এ সময প্রকাশ্যভাবে নিজ নাম দিয়া বডলাটকে পত্র লেখা হয় ত সমীচান মনে করেন নাই, 'Indo Philus' (ভারত-বন্ধু) ছদ্মনামে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুককে শিক্ষা-সংস্কারের উদ্দেশ্যে নয়খানি পত্র লিখিলেন। এই পত্রগুলি 'ইণ্ডিয়ান মিররে' ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দেব ৮ই মে হইতে ১৬ই আগষ্টেব মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রগুলিতে কেশবচন্দ্র জনসাধারণেব শিক্ষা-ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, নারীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। এই পত্রগুলি প্রকাশে তখনই কোন ফল না হইলেও শিক্ষা-সংস্কারের প্রতি সুধী ও মনীষী ব্যক্তিদের এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র, ২য় খণ্ড—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, পৃ ৯৩৬ ৭।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার প্রধান উদ্যোক্তা মিস মেরী কার্পেণ্টারের মৃত্যু হইলে, এই সভা ১৮৭৭, ২৮শে জুলাই একটি শোকসভার আয়োজন করেন। সভায় কেশবচন্দ্র মিস কার্পেণ্টারের জীবনব্যাপী কর্ম্মসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ ভারতবর্ষের হিতার্থে তাঁহার কৃতির বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করেন। বক্তৃতাটি সভার 'Transactions'-এ এখনও আত্মগোপন করিয়া আছে। কেশবচন্দ্রের ইংরেজী বক্তৃতা-গ্রন্থে এটিও সন্নিবেশিত হওয়া বিধেয়।

'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা' ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। এই প্রতিষ্ঠানটি বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষস্থানে রহিয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাকালে কেশবচন্দ্র ডাঃ সরকারের বিশেষ সহায় হন। কয়েক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ডাঃ সরকার ১৮৭৬, ২৯শে জুলাই ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা স্থাপন করিলেন। সভার প্রথম অধ্যক্ষ-সভায় বাংলার গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী মনীষী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্থান পাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রকেও সভার একজন অধ্যক্ষরূপে দেখিতে পাই। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দীর্ঘদিন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও এই সভা জীবিত ছিল। বর্ত্তমানের নূতন পরিবেশে ইহা এক বিরাট গবেষণাগারে পরিণত হইয়াছে।

এলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট

পঞ্চম দশকের শেষে এবং ষষ্ঠ দশকের প্রথম দিকে সিপাহী যুদ্ধের শোচনীয় পরিণতির ফলে জাতির জীবনে এক সঙ্কটময় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। সপ্তম দশকের মধ্যভাগেও এইরূপ সঙ্কট দেখা দেয়।

শিক্ষিত বাঙালী ও শ্বেতাঙ্গ সমাজের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া পড়ে, আর ইহাতে ইন্ধন জোগাইতে থাকে সরকারের অনুসৃত বিধি-বিধানগুলি। এ দেশের বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্বার্থগত বিরোধ প্রকট হইয়া উঠে। রাজনৈতিক কারণে উচ্চশিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধের উন্মেষ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে সুষ্ঠু রূপ দিবার নিমিত্ত মানবিকতার ভিত্তিতে শ্রেণী ধর্ম্ম বর্ণ ও মতবাদ নির্ব্বিশেষে আত্মোৎকর্ষমূলক একটি মিলনক্ষেত্র রচনাও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এই মিলনক্ষেত্র সৃষ্ট হয় এলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউটের মধ্যে। সাধারণের নিকট ইহা 'এলবার্ট হল' নামেই ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যে সমুদয় উদ্দেশ্য লইয়া পরবর্ত্তীকালে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার বীজ অনেকাংশে এলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউটের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। আর উহার প্রথম পরিকল্পনা-রচনার ও প্রতিষ্ঠাব সম্মান কেশবচন্দ্রেব অনুবর্ত্তী ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারেরই প্রাপ্য।

এলবার্ট হল বা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্পূর্ণই কেশবচন্দ্র সেনের। ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ (সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। এই উপলক্ষে তাঁহাব পিতা এলবার্টের নামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া কেশবচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হয়:

> "That in commemoration of Royal Highness the Prince of Walse' 'Visit to British India' an Association be formed to be styled the Albert Institute, with a view to promote literary and social intercourse among all classes of the community, and that in connection with the above Institute there be a Public Hall to be styled the Albert Hal'."

সাহিত্যিক ও সামাজিক আলাপ-আলাপনের নিমিত্ত এলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউটের স্থাপনা, আর এই উদ্দেশ্যে 'এলবার্ট হল' নামে একটি

সাধারণগম্য হল বা ভবনের পত্তনের আয়োজন হইল কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে। এলবার্ট হলের দ্বার-উন্মোচন উৎসব আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পন্ন হইল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল। বঙ্গের ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কেশবচন্দ্র প্রস্তাবনায় এলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউটের পরিকল্পনার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া ইহা দ্বারা যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তদুদ্দেশ্যে বলেন :

"In the midst of jarring and conflicting interests and the numerous growing political and religious divisions in native society, consequent on a state of excitement which a liberal English education has produced, it was thought desirable to provide a place for kindling social intercourse, where men of all classes and creeds at least for the time being might forget their differences and enter into social fellowship and friendly communion. It was therefore thought that a Hall such as this would prove to be of immense advantage to the people of the country for Hindu, Mahomedans, Christians, Native Christians and Brahmos and where all political parties might meet for simple co-operation and intercourse. This Hall will not belong to any exclusive political or religious party but will be the common property of all classes of native society."*

বিভিন্নমুখী ও বিরোধীভাবাপন্ন মতবাদের লোকদের মিলনক্ষেত্র হইবে এই ইন্‌ষ্টিটিউট বা হল। কেশবচন্দ্র বলেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, দেশীয় খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম—সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায় এখানে আসিয়া সম্মিলিত হইবেন একই উদ্দেশ্যে। একটি কমিটি বা অধ্যক্ষসভার উপরে এই প্রতিষ্ঠানটির ভার অর্পিত হইল। ১৮৭৮, ২৮শে এপ্রিল গবর্ণমেণ্টের নিকট যে মেমোর‍্যাণ্ডাম প্রেরিত হয়, তাহাতে অধ্যক্ষ-সভার সদস্যদের

* *The Indian Daily News* April 28, 1876 : "Opening of the Albert Hall."

নাম এইরূপ পাইতেছি : সভাপতি—সার এশ্‌লি ইডেন ; সহকারী সভাপতি—রমানাথ ঠাকুর ; সদস্য—নরেন্দ্রকৃষ্ণ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কমলকৃষ্ণ, আর্কডিকন বেলী, এইচ. বেল, ঈ. লাফোঁ, সি. এইচ. টনি, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, আমীর আলি, আসগর আলি, আবদুল লতিফ খাঁ ; সম্পাদক—কেশবচন্দ্র সেন ; সহঃ সম্পাদক—আনন্দমোহন বসু। হলের ট্রাষ্টিও গঠিত হইল। এলবার্ট হল কলিকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানরূপে অবিলম্বে পরিচিত হয়। গ্রন্থগার, পাঠাগার এই ইন্‌ষ্টিটিউটে- অঙ্গ। এখানে ব্রহ্মবিদ্যালয়, কলিকাতা স্কুল (এলবার্ট স্কুল ও কলেজ), বেদবিদ্যালয় প্রভৃতিও ক্রমে স্থাপিত হয়। প্রধান 'হল'-ঘরে সাধাবণেব চিত্তোৎকর্ষক বক্তৃতাদিরও ব্যবস্থা হইতে থাকে। এলবার্ট হল বা ইন্‌ষ্টিটিউট দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্ররূপে বাঙালী জাতির অশেষ কল্যাণসাধম করিয়াছে।

ধর্ম্মচর্য্যা, সাধুসঙ্গ, উত্তর-ভারত পরিক্রমা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'ধর্ম্মবীব' কেশবচন্দ্র 'কর্ম্মবীর'রূপে ভারতভূমে অবতীর্ণ হইলেন। কেশবচন্দ্রের কর্ম্মৈষণা কিরূপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায় তাহার আভাস আমরা এতক্ষণে যথেষ্ট পাইলাম। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মচর্য্যা কিন্তু সমানে চলিয়াছিল। মন্দিরে প্রদত্ত তদীয় প্রার্থনা-বক্তৃতাগুলি যুবচিত্তে কি উন্মাদনারই উদ্রেক করিত! প্রতি বৎসব মাঘোৎসবকালে কলিকাতা টাউন হলে কেশবচন্দ্র ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন। এই সকল সভায় বাংলার গুণী-জ্ঞানী ইউরোপীয় ও ভারতীয়েরা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার

ধর্ম্মোপদেশে বিমোহিত হইতেন। ভারতের বড়লাট, বঙ্গের ছোটলাট এবং পদস্থ ইংরেজ ও ভারতীয়েরাও এই সকল বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। শুধু প্রার্থনা বা বক্তৃতা দ্বারা মানুষের প্রাণে ধর্ম্মভাব স্থায়ী করা যায় না। এই উদ্দেশ্যে মণ্ডলী গঠন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার প্রভৃতিতে কেশবচন্দ্র মনঃসংযোগ করিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত ভারত আশ্রমেও তাঁহার একটি কীর্ত্তি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী বেলঘরিয়াস্থ জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটিকায় স্থাপিত এই আশ্রম কেশবচন্দ্রের যাবতীয় কর্ম্মের কেন্দ্র হইয়া উঠে। কোন্নগর ও শ্রীরামপুরের মধ্যবর্ত্তী মোড়পুকুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত 'সাধন-কানন' কিছুকাল পরে আর একটি সাধন ও কর্ম্মকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। 'সাধন-কাননে' আধুনিক কালের 'গ্রাম-সেবার' কার্য্যসূচী আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়, অবশ্য ইহাও ধর্ম্ম-বিষয়াদি ছাড়া। ইহার বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে বাহির হয়:

"অল্পদিন হইল, যে উদ্যান (সাধন-কানন) ক্রয় করা হইয়াছে, তাহাতে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুযায়িগণ প্রাচীনকালের অথচ নূতন প্রকারের ধরনে বাস করেন। তাঁহারা বৃক্ষতলে কুশাসন, বনাতের আসন এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বসিয়া প্রাতঃকালে একত্র উপাসনা করিয়া থাকেন।...উপাসনার পর তাঁহারা রন্ধন করেন, এবং দুপ্রহরের মধ্যে তাঁহাদের ভোজনকার্য্য শেষ হয়। আহারের পর অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া, একঘণ্টাকাল তাঁহারা সৎপ্রসঙ্গ করেন। তদনন্তর কেহ কেহ লেখাপড়া ও অন্যান্য সামান্য কাজ করিয়া থাকেন। অপরাহ্নে জল তোলা, বাঁশ কাটা, পথ প্রস্তুত ও সমান করা, গাছ পোঁতা, গাছ সরাইয়া দেওয়া ও জল সেচন, তাঁহাদের কুটির প্রস্তুত করা, নানা স্থান পরিষ্কার করা এই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন; কেউ মাথা খুলিয়া, কেউ মাথায়

ভিজা গামছা বাঁধিয়া, রৌদ্রে খুব পরিশ্রম করেন। ছয়টা পর্য্যন্ত এইরূপে কার্য্য করিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামের পর সকলে নির্জ্জন সাধনে গমন করেন। সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিলে—মনে কব, সাড সাতটা হইলে—তাঁহারা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তৎপর কীর্ত্তনের দল বাঁধিয়া বনে-আচ্ছন্ন পাডার রাস্তায় বাহির হন, প্রায় গরিবদের কুটিরে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের কল্যাণার্থ কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করেন। এই সকল কার্য্যের ভিতরেও বাবু কেশবচন্দ্র সেন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য বডলোকের সঙ্গে পত্রালাপ, আলবার্ট হলের উন্নতি ও ভাল অবস্থার জন্য উদ্যমসাধ্য উপায় গ্রহণ, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদিরও সময় পান।"*

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মচর্য্যা যে সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে এমন নয়, তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধু ও সহকর্ম্মীদের নিকট হইতে সময়ে সময়ে বাধাও পাইয়াছেন যথেষ্ট। ১৮৭২ সনের তিন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তিনি এ বিষয়ক প্রচেষ্টায় আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে ভীষণ বাধার সম্মুখীন হন। উক্ত সনের ১৯শে মার্চ্চ এই বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু যে আকারে ইহা বিধিবদ্ধ হয তাহা আদৌ কেশবচন্দ্রের মনঃপূত ছিল না। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া মন্দিরে পুরুষের মত নারীরও প্রকাশ্যে উপাসনায় যোগদানের দাবি জানান। কেশবচন্দ্রের দ্বারাই ইহার মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু তৎকর্তৃক উপাসক ও প্রচারকমণ্ডলী গঠন লইয়া ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে আবার কলহের গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিপক্ষের মুখপত্রস্বরূপ 'সমদর্শী' নামে একখানি মাসিক পত্রও (অগ্রহায়ণ ১২৮১)

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র—দ্বিতীয় খণ্ড—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, পৃ. ৩২৭-৮। ৪ঠা জুন, ১৮৭৬ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিররে' প্রকাশিত বিবরণের মর্ম্ম।

প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আন্দোলন বিশেষ দানা বাঁধিয়াছিল তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ লইয়া। এ বিষয় পরে বলিব।

কেশবচন্দ্র বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের সাধুসন্তদের সংস্রবে আসিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান দুই জন, দয়ানন্দ সরস্বতী এবং পরমহংস রামকৃষ্ণ। দয়ানন্দ আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে বাংলায় আগমন করেন এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাগানবাড়ীতে আসিয়া উঠেন। এখানে কেশবচন্দ্র সদলবলে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দয়ানন্দের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়া তাঁহারা বিশেষ প্রীত হন, এবং কেশবচন্দ্রের অনুরোধে তিনি কলিকাতা নগরীর মধ্যে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দেন। দয়ানন্দ সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। বক্তৃতার ভাষা এত সরল ও প্রাঞ্জল হইত যে, সামান্য-শিক্ষিতেরাও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। কেশবচন্দ্র পরমহংস রামকৃষ্ণদেবেরও সংস্রবে আসিলেন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল, এবং কেশবচন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রথমবার সাক্ষাৎকারের বিবরণ ২৮শে মার্চ্চ ১৮৭৫ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' এইরূপ দিয়াছেন:

> "We met one (a sincere Hindu devotee), not long ago, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never-ceasing metephoss and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pundit Dayananda Saraswati, the former being as gentle, tender, and contemplative as the later is tardy, masculine and polemical. Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to inspire such men as these."

কেশবচন্দ্র ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অন্ততঃ তিন বার উত্তর ভারত পরিক্রমা করেন এইরূপ মুহুর্মুহু পরিক্রমার উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ ধর্ম্ম প্রচার হইলেও ভারতবাসীদের ঐক্যবোধের উন্মেষে ইহা বিশেষ সহায় হইয়াছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌ, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, বেরিলী দেরাদুন, লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, কানপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থলে গমন করেন। প্রতিটি স্থলেই তিনি ধর্ম্মমূলক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। লাহোরেব সালেমার বাগে তিনি প্রথম বক্তৃতা দিলেন হিন্দী ভাষায় (৭ই নবেম্বর, ১৮৭৩)। ১৮৭৬, ডিসেম্বব মাসে তিনি দিল্লীর দরবাবে যোগ দিতে যান। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-সভার পক্ষে সিভিল সার্ব্বিস আন্দোলন পবিচালনাব জন্য সমগ্র উত্তর-ভারত পর্য্যটন কবিলেন। কেশবচন্দ্রের উত্তর ভাবত পরিক্রমা তাঁহার সাদর সম্বর্দ্ধনার পথ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া দেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'সিভিল সার্ব্বিস' আন্দোলন উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট জনসভা হয় তাহাতে কেশবচন্দ্র সাগ্রহে যোগ দিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির তিনি ছিলেন একজন সদস্য।

কেশবচন্দ্র ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দেব ডিসেম্বর মাসে দিল্লীর দরবাবে যোগ দেন। তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনকে 'বিধাতার আশীর্ব্বাদ' বলিযা মনেপ্রাণে বিশ্বাস কবিতেন। এই হেতু তখন বাংলাদেশে যে নব্য বিপ্লবী ভাবধারা যুবক মনে নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা কেশবচন্দ্রের উক্ত ভাবনার বিরোধী ছিল। এ সমযকার নব্য ভাবোদ্দীপ্ত যুবক বিপিন-চন্দ্র পাল পরবর্ত্তীকালে কেশবচন্দ্রের ভাবনার সার্থকতা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কেশবচন্দ্র বাণী ভিক্টোরিয়ার 'এম্‌প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' নামগ্রহণ উপলক্ষে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার-প্রদত্ত কোনরূপ

উপাধি গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে একটি কৌতুককর কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁহাকে "K. C. S. I." উপাধি প্রদানের কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি ত মনুষ্য-প্রদত্ত কে. সি. এস. আই. হইতে পারি না জগদীশ্বর স্বয়ং আমাকে কে. সি. এস. আই. করিয়াছেন,' অর্থাৎ তিনি যে 'Keshab Chunder Sen of India!'

১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের আরও কয়েকটি কার্য্য এখানে উল্লেখযোগ্য। কলুটোলার পৈতৃক ভবন ত্যাগ করিয়া তিনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নবেম্বর আপার সারকুলার রোডস্থিত নূতন বাটিতে (কমলকুটির, বর্ত্তমানে ভিক্টোরিয়া কলেজ) চলিয়া আসেন। সমাজের প্রচারকগণের জন্য পৃথক পৃথক বাসভবন লইয়া 'মঙ্গলবাড়ী'ও এই সময় স্থাপিত হইল। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভায় মিস মেরী কার্পেন্টারের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতার কথা বলিয়াছি। মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থাও তাঁহার উদ্যোগে করা হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। কলিকাতা স্কুলের নাম এই বৎসর হইতে 'এলবার্ট স্কুল' রাখা হইল। ১৮৭৮, ২৪শে জানুয়ারী তিনি 'আশালতা দল' (Band of Hope) গঠন করেন, উদ্দেশ্য—সুরাপান নিবারণে যুবকচিত্তের উদ্বোধন। পরবর্ত্তী মে মাসে কেশবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বালক-বন্ধু' নামে একখানি সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হয়। 'সুলভ সমাচার' ছিল সাধারণ শিক্ষিতদের পাঠ্য, 'বালক-বন্ধু' বালক বালিকাদিগের বোধগম্য সরল ভাষায় লিখিত পত্রিকা।

কুচবিহার-বিবাহ ও তাহার প্রতিক্রিয়া

কিন্তু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধেই কেশবচন্দ্র এক ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে পড়িলেন। ইহার মূল কুচবিহারের রাজকুমারের সঙ্গে তাঁহার কিঞ্চিদধিক তের বৎসর বয়সেব জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ (৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৮)। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একদল ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রের উপ পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে বিরূপ হইয়াছিলেন। এই বিবাহ লইয়া তাঁহারা ভীষণ আন্দোলন সুরু করিয়া দিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইন অনুযায়ী এই বিবাহ নিষ্পন্ন হয় নাই—ইহাই ছিল প্রতিবাদকারীদের মৌলিক আপত্তি। তাঁহাবা কেশবচন্দ্রেব মতামত ও আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা দৃষ্টে এতই আপত্তি জানাইতে লাগিলেন যে, উভয় দলের মিলনের আশা সুদূরপরাহত হইল। এই বিরোধী দল ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে কলিকাতা টাউন হলে এক জনসভার অনুষ্ঠান করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন। নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিবচন্দ্র দেব, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দুর্গামোহন দাস, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বিশেষ অগ্রণী হইয়াছিলেন। ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, ইহাব কায্যকলাপ নূতন সমাজ অনেকাংশে অনুসরণ করেন। মন্দির স্থাপন, প্রচারক নিয়োগ, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা, যুবসভা প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্যে নূতন সমাজ-পরিচালকগণ হাত দিলেন।

কেশবচন্দ্রের পক্ষে এই বিচ্ছেদ খুবই মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে রহিলেন তাঁহাদের লইয়াই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার প্রতিভা নূতন নূতন কর্ম্ম

প্রণালীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভার বার্ষিক সভায় তাঁহার এই কর্ম্মপ্রণালীর আভাস আমরা পাইয়াছি। এলবার্ট স্কুলে তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনঃস্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে বয়স্কা মহিলাদিগের মধ্যে ঈশ্বর-প্রীতি ও সেবার ভাব উদ্রেক করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মিকা সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। সাধরণ ব্রাহ্মরা আলাদা হইয়া গেলে, তাঁহাদের পত্নীগণ আনন্দমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী স্বর্ণপ্রভা বসুর নেতৃত্বে বঙ্গমহিলা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় তাঁহার অনুবর্তিনীদের দ্বারা আর্য্য নারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কেশব সহধর্ম্মিণী জগন্মোহিনী দেবী এই সমাজের নেতৃস্থানীয়া হইলেন। আয নারী সমাজের মুখপত্রস্বরূপ 'পরিচারিকা' মাসিকপত্র বাহির করেন প্রতাচন্দ্র মজুমদার।

বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র চর্চ্চার ব্যবস্থা

কেশবচন্দ্র এই সময়ে আর যে একটি কার্য্যের সূচনা করিলেন তাহা দেশের, সমাজের এবং বাংলা সাহিত্যের বিশেষ হিতকারী হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আন্তরিক মিলনের পক্ষে এই উপায়টির সার্থকতা যথেষ্ট। কেশবচন্দ্র তাঁহার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে কয়েকজনের উপব বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্য-চর্চ্চার ভার প্রদান করিলেন। খ্রীষ্টান শাস্ত্র অনুশীলন ও আলোচনাব নিমিত্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিয়োজিত হইলেন। প্রতাপচন্দ্র অতি নিষ্ঠার সহিত জীবনের অবশিষ্ট কাল খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও শাস্ত্র আলোচনায় কাটান। তৎসম্পাদিত ইংরেজী পত্রিকা এবং

তাঁহার রচিত ইংরেজী পুস্তকাবলী তাহার প্রমাণ। অঘোরনাথ গুপ্ত বা সাধু-অঘোরনাথ বৌদ্ধ-শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি মাত্র দুই বৎসর পরে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উপব পুস্তক লিখিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার পুস্তকাবলী অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচায়ক। গিরিশচন্দ্র সেন গ্রহণ করেন মুসলমান ধর্ম্ম ও শাস্ত্র আলোচনার ভার। তাঁহার কোরাণের মূলানুগ বঙ্গানুবাদ প্রসিদ্ধ। গিরিশচন্দ্রের মহম্মদীয় শাস্ত্রভিত্তিক অন্যান্য রচনাও বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। সাধাবণের নিকট তিনি 'মৌলবী গিরিশচন্দ্র' নামে পরিচিত হন। হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্র আলোচনার ভার লন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়। তাঁহার গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থের উপবে ভাষ্যাদি রচনা বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' সঙ্গীত-নায়করূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের 'চারণ'-কবি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনায় তিনি ব্যাপৃত হইলেন। কেশবচন্দ্র ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বিহারের নানা স্থলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন। ইহার পব তিনি ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠনেও বিশেষ অবহিত হইলেন। এই সময়কার উপদেশ, প্রার্থনা ও বক্তৃতা কেশব-অনুবর্ত্তী ব্রাহ্মদের মনে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বাংলা সাহিত্যও এ সমুদয়ের দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে।

নববিধান

কেশবচন্দ্র প্রতিভাবান্ পুরুষ ; ধর্ম্মক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিভা ক্রমশঃ স্ফূরিত হইতেছিল। হিন্দুধর্ম্মের সার লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম, আবার

ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্থক হইবে জগতের সকল ধর্ম্মের সমন্বয়-সাধন দ্বারা। কেশবচন্দ্র নিজ জীবনে—দৈনন্দিন আচার-আচরণে জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও মহাপুরুষদের রীতি অনুষ্ঠানে মন দিলেন, যীশুখ্রীষ্ট, শাক্যমুনি, মহম্মদ, চৈতন্য—বিভিন্ন মহাজনগণের সাধনভজনে নিজেকে অভ্যস্ত করিতে লাগিলেন; আর এই পথেই কেশবচন্দ্র যে সত্য আবিষ্কার করিলেন তাহার নাম দিলেন 'নববিধান'। স্বল্পকথায় তিনি 'নববিধানে'র এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন:

"গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিশান, হিন্দুধর্ম্মের নিশানের পরিবর্ত্তে এখন গগনে সার্ব্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল। হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন, বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র মিলিল। নববিধানের বেদের অন্ত নাই, কেননা সত্যই ইহার বেদ। ইনি দেশকালে বদ্ধ নহেন, সমুদায় বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত। ইহাতে সমস্ত নীতি ও সমস্ত ধর্ম্ম একীভূত। সকল বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। যোগাদি ধর্ম্মের সমুদায় অঙ্গকে ইনি আপন বলিয়া গ্রহণ করেন। সকল প্রকার সাধনের প্রতি ইনি অনুরাগী। জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য সমুদায় ইহার রাজ্যের অন্তর্গত। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম্ম—ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসার শাস্ত্রে পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিবেন।"*

কেশবচন্দ্র অন্যত্র বলিয়াছেন, পৃথিবীর জন্য না হউক অন্ততঃ ভারতের জন্য এই নববিধান একটি আশীর্ব্বাদতুল্য। এই বিষয়ের

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র, তৃতীয় খণ্ড; পৃ. ১৩৫৭-৮।

ব্যাখ্যান তাঁহার উপদেশাবলীতে প্রদত্ত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র আমৃত্যু নববিধানের সাধন ও প্রচারকল্পে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। "The New dispensation"পত্রিকায় (২৪শে মার্চ্চ, ১৮৮১ হইতে প্রকাশিত) তিনি প্রতি সপ্তাহে এই বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদান করিতে থাকেন। অন্যান্য কার্য্যেও তিনি সমান তৎপর ছিলেন। কলিকাতার অক্সফোর্ড মিশনের প্রতিষ্ঠা, মুক্তিফৌজের অভিনন্দন এবং সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কলিকাতায় সুষ্ঠুভাবে বেদচর্চ্চার জন্য বেদ-বিদ্যালয় পত্তন, নূতন করিয়া স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি সোৎসাহে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর-প্রমুখ মনীষীবৃন্দ ও বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপও চলিতেছিল অবিরত।

স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টা

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম যুবকগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মবন্ধু সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার দুইটি উদ্দেশ্য—দেশোন্নতি এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অগ্রহায়ণ ১৭৮৫ শক (ইং ১৮৬৪) সংখ্যাতে লেখেন, "বয়স্থা নারীগণের শিক্ষার্থে সভ্যেরা এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন,…"। সাধারণ বিদ্যালয়সমূহের পরিপূরকরূপে ব্রাহ্মবন্ধু সভা 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা'র প্রবর্ত্তন করেন। সভার পক্ষ হইতে 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' সম্বন্ধে সম্পাদক হরলাল রায় ইহার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ব্যক্ত করেন:

> "ঈশ্বর প্রসাদে এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বালিকাগণ বিদ্যালয়ে দুই তিন

বৎসরের অধিক পড়িতে না পারায় যথাবাঞ্ছিত ফল উৎপন্ন হইতেছে না। যাহাতে বালিকাগণ উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারে এইরূপ একটি কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধু সভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। বৎসরে দুই বার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত পাত্রীদিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক। যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন তাঁহারা তাঁহাদিগের নাম, ধাম, বয়স, পাঠ্য পুস্তক ও পাঠে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, এই সমুদায় বিবরণ সহ আমাকে পত্র লিখিবেন। আমার নামে পত্র কলুটোলার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।"

শিক্ষার্থীদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রতি শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত করা হইল। ব্রাহ্মবন্ধু সভা প্রায় দুই বৎসরকাল পরে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য বামাবোধিনী সভার হস্তে অর্পণ করেন। শেষোক্ত সভা উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্ম যুব-নেতাদের দ্বারা ইহার মুখপত্র 'বামাবোধিনী পত্রিকা' পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবধি অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অক্টোবর ১৮৬৭ (আশ্বিন ১২৭৪) সংখ্যায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লেখেন :

"বিগত ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে,* ১২৭০ বঙ্গাব্দে এই কলিকাতা মহানগরীতে 'থিস্‌টিক্ ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটি' নামে একটি ব্রাহ্মবন্ধু সভা সংস্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিবিধানার্থে কিয়ন্মাস পরে

* ইহা ভুল, '১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দ' হইবে।

উক্ত সভার অন্তর্গত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাসভা নামে একটি স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।...১২৭১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ কলিকাতা ব্রাহ্মবন্ধু সভা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত ১২টি ছাত্রীকে পুরস্কার প্রদান কবেন। এই পুবস্কার প্রদত্ত হইলে, অনন্তর ১২৭১ বঙ্গাব্দেব শেষে ব্রাহ্মবন্ধু সভা এই অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীর ভার বামাবোধিনী সভার হস্তে অর্পণ করেন। তদবধি বামাবোধিনী সভা তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাবলম্বিত প্রণালীর সহিত তাহা একত্রিত করেন এবং ১২৭২ বঙ্গাব্দের প্রাবম্ভে বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকাব সভ্যদিগেব অনুমত পবীক্ষা-পুস্তক সকলেব একটি নূতন তালিকা প্রকাশ করেন। তাহাতে অন্তঃপুব স্ত্রীশিক্ষাব সময় পাঁচ বৎসরে বিভক্ত কবা হয়...১২৭০।১২৭১ এই দুই বৎসর ব্রাহ্মবন্ধু সভাব হস্তে তাহার ভার থাকে। এবং ১২৭২।৭৩।৭৪ এই তিন বৎসর উহা বামাবোধিনী সভার হস্তে আসিয়াছে।"

তৎকাল প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার পবিপূরক হিসাবে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা কেশব-মণ্ডলী কর্তৃক পরিকল্পিত ও অনুসৃত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয়গুলিবও যাহাতে সম্যক্ উন্নতি হয়, সে উদ্দেশ্যেও ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে আয়োজন চলিতে থাকে। শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা দ্বারাই প্রধানতঃ উহা সম্ভব। ঐ বৎসর নবেম্বর মাসে ভারত-হিতৈষিণী কুমারী মেরী কার্পেণ্টার ভাবতবর্ষে আগমন করেন। তিনি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন এবং কলিকাতায় আসিয়া নারী-শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় রত হইলেন। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ইহার সাফল্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্র কিন্তু

কার্পেণ্টারের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে উৎসুক হইলেন। কলিকাতার বেথুন স্কুলের সঙ্গে একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত-সরকারকে কার্পেণ্টার একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রে বিশেষ কাজ হইল। কিছুকাল আলোপ আলোচনার পর সরকার এইরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগ হইতে তিন বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে একজন ইউরোপীয় মহিলা শিক্ষাব্রতীর তত্ত্বাবধানে বেথুন স্কুলের সঙ্গে ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল বা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইল। কেশবচন্দ্রের সহায়তায় কুমারী কার্পেণ্টারের উদ্দেশ্য কার্য্যকরী হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কেশবচন্দ্র "Indian Reform Association" বা ভারত-সংস্কার সভা স্থাপন করেন বলিয়াছি। সভার অন্তর্গত "স্ত্রী-জাতির উন্নতি-সাধন" বিভাগের সভাপতি হন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত। উমেশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই 'বামাবোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন ও পরিচালন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নানাপ্রকারে নারীজাতির সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। কাজেই উপযুক্ত পাত্রেই এই বিভাগের সম্পাদনভার অর্পিত হইল। এই বিভাগের কার্য্য সাধিত হইবার কথা হয় "বালিকা-বিদ্যালয়, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, বামাগণের উপযোগী পত্রিকা প্রচার, সময়ে সময়ে পুস্তকাদি প্রকাশ এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক দান" ইত্যাদি* দ্বারা।

স্ত্রীজাতির উন্নতি-সাধন বিভাগের কার্য্যও শীঘ্রই আরম্ভ হইল। বেথুন স্কুল-সংলগ্ন নর্ম্যাল স্কুলের অবস্থা ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শোচনীয়

* বামাবোধিনী পত্রিকা—অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (ডিসেম্বর ১৮৭০)।

হইয়া দাঁড়ায়। কেশবচন্দ্র স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উক্ত বিভাগে একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ১৮৭১ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী স্থাপন করিলেন। "বামাবোধিনী পত্রিকা" মার্চ্চ ১৮৭১ সংখ্যায় বিদ্যালয় সম্বন্ধে লেখেন—

"ভারত-সংস্কার সভার অধীনে যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার ছাত্রী সংখ্যা ১৭টি হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রতিদিন বাঙ্গালা শিক্ষা দেন এবং একটি বিবি (মিস নিকলসন) ইংরাজী ও শিল্পকার্য্য শিখান। ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপকারী বিষয় সকল অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।"

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরেই, এই বৎসরের মে মাসে কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় এবং ছাত্রীদের উদ্যোগে নারীজাতির কল্যাণকর বিভিন্ন বিষয়ের যথাযথ আলোচনার উদ্দেশ্যে 'বামাহিতৈষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়।* কেশবচন্দ্র সেন ইহার সভাপতি হইলেন।

প্রথম বৎসর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং অঘোরনাথ গুপ্ত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্রতী হন। ছাত্রীগণ প্রায় সকলেই বয়স্থা; অল্পকালের মধ্যে তাঁহারা পাঠে উৎকর্ষ দেখাইতে সমর্থ হইলেন। তাঁহাদের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ছাত্রীসংখ্যাও ক্রমে বাড়িয়া জুলাই মাস (১৮৭১) নাগাদ বাইশ জনে দাঁড়ায়। বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় এবং ষাণ্মাসিক পরীক্ষাদি সম্বন্ধে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'—শ্রাবণ ১২৭৮ লেখেন,

"বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ন্যূনাধিক ১৫০৲ দেড়শত টাকা হইয়া থাকে, তজ্জন্য বামাকুলহিতৈষী মহাত্মাগণের দাতব্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর। এইরূপ অবস্থায় বিদ্যালয়টির কার্য্য চলিয়া গত

---

* বামাবোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ ১২৭৮ (মে ১৮৭১)।

মাসের প্রথমে ইহার ষাণ্মাষিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে।...

"৮ই আগষ্ট ছাত্রীগণের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়।..."

উক্ত পত্রিকা পারিতোষিক-প্রাপ্ত ছাত্রীদের নাম এইরূপ উল্লেখ করেন,

১ম শ্রেণী। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন, কুমারী সৌদামিনী কাস্তগিরী, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী।

২য় শ্রেণী। শ্রীমতী যোগমায়া গোস্বামী, জগন্মোহিনী রায়, জগত্তারিণী বসু, সারদা সুন্দরী ঘোষ, কুমারী সরলা বসু।

৩য় শ্রেণী। শ্রীমতী মনোমোহিনী সেন, কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, বসন্তকুমারী মৈত্র।

'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় পারিতোষিক-প্রাপ্ত ছাত্রীদের উৎকৃষ্ট রচনাবলী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এখানে এই পত্রিকাখানির সঙ্গে স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিধান বিভাগ তথা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সম্পর্কের কথাও একটু বলা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি, উক্ত পত্রিকার সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিধান বিভাগেরও সম্পাদক। এই বিভাগের একখানি মুখপত্রের আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছিল, বামাবোধিনী পত্রিকাই এ অভাব পূরণ করিল। ভাদ্র ১২৭৮ সন (সেপ্টেম্বর ১৮৭১) হইতে পত্রিকাখানি ইহার মুখপত্র রূপে গৃহীত হয়।* বামা-রচনা অধ্যায়ে ছাত্রীদের উৎকৃষ্ট রচনাসমূহ

* "বর্ত্তমান ভাদ্র মাস হইতে ইহার সম্পাদকীয় ভার ভারত-সংস্কারক সভার বামা-কুলোন্নতি সাধক (Female Improvement) বিভাগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। বামাবোধিনী পত্রিকার স্বত্ব যেমন বামাবোধিনী সভার ছিল সেইরূপ থাকিবে। ইহার

ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। বামাহিতৈষিণী সভায় পঠিত ছাত্রীগণের প্রবন্ধাদিও ইহাতে স্থান পাইতে থাকে।

পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে (১৮৭১) শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌গণ বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করেন। ছাত্রীরা বাংলা শিক্ষায় কতখানি উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন কৃষ্ণমোহনের মন্তব্য* হইতে তাহা বিশেষ উপলব্ধি হয়।

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পুরা ইংরেজী নাম 'Female Normal and Adult School' বিদ্যালয়টি কলিকাতার মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে প্রথম আরম্ভ হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়ায় ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা তথায় স্থানান্তরিত হয়। এখানে তিন মাস অবস্থানের পর আশ্রমের সঙ্গে বিদ্যালয়টি মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছি উদ্যানবাটিকায় চলিয়া যায়। এইখানেই ৬ই এপ্রিল (১৮৭২) তারিখে তৎকালীন বড়লাটের পত্নী লেডী নেপিয়ারের পৌরোহিত্যে প্রথম বাৎসরিক পারিতোষিক প্রদান উৎসব সম্পন্ন হয়। উৎসব অন্তে ফাদার লাফোঁ বিজ্ঞান বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন (বামাবোধিনী পত্রিকা চৈত্র, ১২৭৮)। কাঁকুড়গাছি হইতে অল্প কাল পরেই ভারত-আশ্রম কলিকাতা মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিলে স্ত্রীবিদ্যালয়ও এখানে স্থানান্তরিত হইল।

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়—১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রায়

লেখন কার্য্য কেবল ভারত-সংস্কার সভার উক্ত বিভাগ হইতে সম্পন্ন হইবে।"—বামবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১২৭৮।

* বামাবোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১২৭৮।

এক শত আশী টাকা—দেশী-বিদেশী কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির অর্থসাহায্যে মিটানো হইতেছিল। কিন্তু শুধু মাত্র চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া ইহার স্থায়িত্ব বিধান সম্ভব নহে। সুতরাং সরকারের সঙ্গে কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী বেথুন স্কুল সংলগ্ন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সরকার তুলিয়া দিলেন। এই সময় ছোটলাট সার জর্জ ক্যাম্বেল এই মর্ম্মে মন্তব্য করেন যে, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পক্ষে এরূপ বিদ্যালয় সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করা সম্ভব নহে। কেশবচন্দ্র পরবর্ত্তী ২রা ফেব্রুয়ারী সরকারের জ্ঞাতার্থ তাঁহার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বিষয়ে একখানি পত্র লেখেন। ইহাতে বলেন যে, তাঁহার বিদ্যালয় দ্বারা সরকারের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সরকারী সাহায্য ন্যায়তঃ ইহার প্রাপ্য। এই পত্র হইতে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমরা সম্যক্ জানিতে পারি। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের চব্বিশটি ছাত্রী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ছয়টি বালিকা লইয়া ইহার সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা এই পত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে কিরূপ উন্নত ধরণের শিক্ষা দেওয়া হইত প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের নাম দৃষ্টে তাহা বেশ বুঝা যায়। বাল্মীকি রামায়ণ, নারী জাতি-বিষয়ক প্রস্তাব, মেঘনাদবধ কাব্য, পদ্মিনী উপাখ্যান, অলঙ্কার শাস্ত্র, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, গণিত ও শারীর বিদ্যা—বাংলা পাঠ্য পুস্তক। প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক ছিল—P. C. Sircar's Fifth Book of Reading, M. Culische's Course of Reading, Lennie's Grammar।

দ্বিতীয় বৎসরে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি হইল। কেশবচন্দ্র ইহার উন্নতি বিষয়ে সবিশেষ যত্নপর হইলেন। শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে শিবনাথ শাস্ত্রী) কেশবেব প্রতি নিতান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি এই বৎসর সবে এম-এ পাস করিয়া ভারত-আশ্রমে আসিয়া যোগ দিলেন। এখানকার বিদ্যালযে শিক্ষকতা কার্য্যেও তিনি ব্রতী হন। শিবনাথ লিখিয়াছেন—কেশবচন্দ্র বিদ্যালয়েব শিক্ষায ইউনিভারসিটির রীতি অনুসরণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। মেয়েদেব জ্যামিতি লজিক মেটাফিজিক্স্ পডাইবাব কথা উত্থাপন করিলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "এ সকল পড়াইয়া কি হইবে? মেয়েদের আবাব জ্যামিতি পডিয়া কি হইবে? তদপেক্ষা elementary principles of science মুখে মুখে শিখাও।" অতঃপর শিবনাথ বলিতেছেন, "আমি science এব মধ্যে mental science আনিলাম। তখন আমি তাজা কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, mental scienceএ মাথা পুরিয়া রহিযাছে, আমার ছাত্রীদিগকে তাহা না পড়াইলে কি থাকিতে পাবি? আমি মুখে মুখে mental science বিষযে ও logic বিষয়ে উপদেশ দিতাম, ছাত্রীবা লিখিয়া লইতেন। সে সকল note এখনও আমার পুবাতন ছাত্রীদেব কাহাবও কাহারও নিকট থাকিতে পাবে।"*

---

* এখানে শিবনাথ তাঁহার বক্তৃতায় যে সব r o e ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক লিখিয়া রাখার কথা বলিয়াছেন তৎসমুদয় 'মনোবিজ্ঞান' শিরোনামে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'—শ্রাবণ ১২৮০, মাঘ-ফাল্গুন ১২৮১, বৈশাখ এবং কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮২ সংখ্যায প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত (কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ) সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পাদটীকায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা-সম্পাদক লেখেন,—

"পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল উপদেশ দেন ছাত্রীগণ তাহা লিখিয়া লইয়া পুস্তকাকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাই ক্রমশঃ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল।"

আমার প্রধান ছাত্রী ছিলেন তিন জন, রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী খাস্তগির (যিনি পরে Mrs. B. L. Gupta হইয়াছিলেন) ও প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সেন। ইঁহারা সকলেই তখন বয়স্থা ও জ্ঞানানুরাগিণী। ইঁহাদের পড়াইতে আমার অতিশয় আনন্দ হইত।*

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে বয়স্কা নারীগণ অধ্যয়নে লিপ্ত ছিলেন। শিবনাথ লিখিয়াছেন—কেশব-পত্নীও এখানে অধ্যয়ন করিতেন এবং তিনি তাঁহাকেও পড়াইতেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ইহাকে সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। ক্ষেত্র যে আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট বিদ্যালয়কে বার্ষিক দুই হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। তবে ইহার সঙ্গে এই মর্ম্মে একটি সর্ত্ত জুড়িয়া দিলেন যে, বেসরকারী দান হইতেও উক্ত পরিমাণ টাকা প্রতি বৎসর সংগ্রহ করিতে হইবে। পাঁচ বৎসরের জন্য এইরূপ সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হইল। ১৮৭৩, ৩রা এপ্রিল অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পারিতোষিক উৎসবে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক কন্যা মিস বেরিং সহ যোগদান করিয়া বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের প্রতি স্বীয় সহানুভূতি ও সমর্থন প্রদর্শন করিলেন। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে *Report of Public Instruction* বা শিক্ষাবিষয়ক সরকারী বিবরণে (পৃ. ৪৮৯) এই পারিতোষিক প্রদান উৎসবে সকন্যা লর্ড নর্থব্রুকের উপস্থিতি, ইংরেজ মহিলাগণ কর্ত্তৃক উপস্থিতমত ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ, সরকারী সাহায্যদান প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

---

* শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত (২য় সংস্করণ), পৃ. ১৯৩।

বিদ্যালয়ের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। তৃতীয় বৎসরে (১৮৭৩) ইহার ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় আটাশটিতে। ইহার সংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয়ে চল্লিশটি ছাত্রী পাঠাভ্যাস করে। শিক্ষয়িত্রী বা বয়স্থা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ বাংলা ভাষায় আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী পুস্তকাদি পাঠেও নিবিষ্ট হন। এ বৎসর বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন—মিসেস্ উইন্স (লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), শশিভূষণ দত্ত, এম-এ,—১ম শিক্ষক, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—২য় শিক্ষক, যোগমায়া চক্রবর্ত্তী—সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রাজলক্ষ্মী সেন এবং রাধারাণী লাহিড়ী প্রভৃতি ছাত্রী-শিক্ষক। এবার ছাত্রীদের পরীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করেন—কুমারী পিগট, কুমারী হেসাব, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শিবচন্দ্র দেব, কৃষ্ণবিহারী সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। শিবনাথ তখন স্বীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি এংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া যাওয়ায় এখানকার কার্য্যে যুক্ত থাকিতে পারেন নাই। এবারকার উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের পারিতোষিক বিতরণ প্রসঙ্গে "বামাবোধিনী পত্রিকা", ফাল্গুন-চৈত্র ১২৮০ (মার্চ্চ-এপ্রিল ১৮৭৪) লেখেন,—

> "কলিকাতা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতাশ্রমের সুপ্রশস্ত গৃহে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য এক্ষণে নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই স্থানেই পারিতোষিক দানের সভা হয়। সভাস্থলে অনারেবল হবহাউস (ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক) ও তাঁহার পত্নী, ফাদার লেফণ্ট, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বহুসংখ্যক হিন্দু ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিবি হবহাউস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।..."

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মধ্যে নানা বিষয় লইয়া এই সময় মতভেদ উপস্থিত হইল। এ কারণ স্ত্রীবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। চতুর্থ বৎসরে, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ এখানকার অধ্যাপনাকার্য্যে রত হইলেন। মহেন্দ্রনাথ বসু অধ্যক্ষ হন। গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়), উমানাথ গুপ্ত, প্রসন্নকুমার সেন ও গিরিশচন্দ্র সেনকে ভারত সংস্কার সভার অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে এ বৎসর এখানে শিক্ষাদানে ব্রতী হইতে দেখি।* চতুর্থ সাম্বৎসরিক পারিতোষিক প্রদান উৎসব সম্পন্ন হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে দিবসে। প্রথম শ্রেণীর রাধারাণী লাহিড়ী, রাজলক্ষ্মী সেন, অন্নদায়িনী সরকার প্রভৃতি পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। স্ত্রী-বিদ্যালয়-সংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয়ের কোন কোন ছাত্রীও পুরস্কার লাভ করে। এবারকার পারিতোষিক দান প্রসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ের উন্নততর শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে "বামাবোধিনী পত্রিকা" (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) লেখেন,—

> "ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ৫ বৎসর চলিতেছে এবং এখানে যতগুলি বয়স্কা হিন্দু ছাত্রী অধ্যয়ন করে, বঙ্গদেশের আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় না। অধিক বয়স্কা শিক্ষার্থিনী ভদ্র রমণীগণের থাকিবার জন্য ভারতাশ্রম উপযুক্ত স্থান সমাবেশ করিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ের এত দূর উন্নতি হইয়াছে যে বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা যে ইংরাজী পুস্তক অধ্যয়ন করেন, ইহার ছাত্রীরা তাহাই করিতেছেন।"

বিদ্যালয়টি ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দেও ভালরূপে চলিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মধ্যে প্রকাশ্য মতবিরোধ এ সময় কতকটা নিরসন হইয়াছিল।

---

* ধর্ম্মতত্ত্ব—১ ফাল্গুন ১৭৯৬ শক : "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক বিবরণ।"

'প্রগতিশীল' ব্রাহ্মদেশে নেতা দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত বালিগঞ্জের বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় এই স্ত্রীবিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা যে তখন চলিতে থাকে তাহার আভাস আমরা ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে (পৃঃ ৭৭) এইরূপ পাইতেছি,—

> "The Mirzapore school is maintained by Babu Keshub Chunder Sen ; it is rather an adult female school than a normal school, its objects being similar to those of the Banga Mahila Bidyalaya of Ballygunge, with which it may shortly be amalgamated."

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উভয় বিদ্যালয় মিলিত হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় দ্বারা আশানুরূপ কাজ হইতেছে না—এই অজুহাতে গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন।*

ব্রাহ্মসমাজে অন্তর্বিরোধ, সরকারী সাহায্য প্রত্যাহার প্রভৃতি নানা কারণে ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত এই স্ত্রীবিদ্যালয়ের কার্য্য রীতিমত চলিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র ১৮৭৯ সনের প্রথমেই যে আর একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহার কথা 'সংবাদ প্রভাকরে' ১১ মার্চ্চ ১৮৭৯ তারিখে এইরূপ পাওয়া যায়,—

> "বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কার সভার অধীনে একটি স্ত্রীবিদ্যালয় ছিল, কিন্তু তাহার ফল সন্তোষপ্রদ না হওয়ায়, ইডেন সাহেব গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক সাহায্য ৫০০ টাকা (?) রহিত করায় বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। কেশববাবু এক্ষণে আর একটি স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, পাইকপাড়ার

* *Report of Public Instruction, Bengal, for 1878-79*, p. 85.

কুমার ইন্দ্রনাথ সিংহ তাহাতে ১০০০ টাকা এবং কুমার পূর্ণচন্দ্র সিংহ ৫০০ টাকা চাঁদা দান করিয়াছেন।"

এই বিদ্যালয়টির নাম দেওয়া হইল 'মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল'। কেশবপন্থী ব্রাহ্মদের স্ত্রীগণ ও তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মহিলারা ১২৮৬ সালের ২৭শে বৈশাখ কেশবচন্দ্রেরই অনুপ্রেরণায় 'আর্য্যনারী সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। 'পরিচারিকা' নামে মাসিক পত্রিকাখানি (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) ইহার মুখপত্র হইল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে এই সমাজ উক্ত স্কুলের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলেন। আর্যনারী সমাজের মুখপত্র 'পরিচারিকা' ফাল্গুন ১২৮৭ সংখ্যায় উহার সাম্বৎসরিক বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে লেখেন,—

> "গত নবেম্বর মাস হইতে ভারত সংস্কার সভার অধীনস্থ স্ত্রীবিদ্যালয় আর্য্যনারী সমাজের অধীন হইয়াছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা-কার্য্যের অধিকাংশ ভার আর্য্যনারী সমাজের সভ্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন।"

ইতিমধ্যে স্ত্রীজাতির শিক্ষা-ব্যবস্থায় বঙ্গদেশে নব নব পন্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। বেথুন স্কুল বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যাপীঠে পরিণত হয় (আগষ্ট ১৮৭৮)। পর বৎসর হইতে এখানে কলেজের শ্রেণীও খোলা হয়। প্রবেশিকা ও তদূর্দ্ধ পরীক্ষাসমূহে নারীগণ পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র ছিলেন পুরুষ এবং নারী উভয় শ্রেণীর একই প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার বরাবর বিরোধী। নিজ আদর্শানুযায়ী অগ্রসর হইতে না পারায় প্রিয় স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীও তাঁহার পছন্দ হইত না। কাজেই প্রচলিত শিক্ষা-

পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ নারী ও পুরুষের একই ধরনে উচ্চশিক্ষা প্রদানে তাঁহার ঘোরতর আপত্তি ছিল। ইহার ভিতরকার ত্রুটি নিবারণকল্পে কেশবচন্দ্র নারীদের জন্য একটি নূতন ধরনের উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে এই নিমিত্ত তিনি যে অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেন (৩১ মার্চ্চ ১৮৮২) তাহা হইতে মূল উদ্দেশ্য বুঝা যায়। অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের শিক্ষাদান ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ইহাতে তিনি বলেন,—

"এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী উচ্চতম ও সমগ্র শিক্ষারীতির অভাবে এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত অসম্পন্নভাবে অবস্থান করিতেছে। ভারত সংস্কার সভার কমিটি এই সেই গুরুতর জাতীয় অভাব মোচনে অগ্রসর হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মনের বিশেষ উপযোগী একটি শিক্ষাপ্রণালী বিধিবদ্ধ করাই তাঁহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। এই শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা এদেশের স্ত্রীলোকেরা জনসমাজে আপনাদের প্রকৃত মর্য্যাদার উপযুক্ত হইতে পারিবেন। স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য এবং কার্য্যক্ষেত্রের জন্য যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক তাহা অস্বীকার করা যায় না। পুরুষ জাতির উপযোগী শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদিগের মত উপাধি এবং সুখ্যাতির অনুসন্ধান করিতে স্ত্রীলোকদিগকে বাধ্য করা অত্যন্ত অনিষ্টকর ও অন্যায়কার্য্য। এ কারণ যাহা পুরুষের উপযোগী শিক্ষা দিয়া স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবকে বিকৃত করে অথবা যাহা তাঁহাদিগকে কেবল বাহ্য বেশভূষা ও অসার সভ্যতার অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগের দুর্গতি সাধন করে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে তাহা যত্নের সহিত পরিত্যক্ত হইবে। এবং সর্ব্বপ্রযত্নে এখানে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষিত হিন্দু স্ত্রী এবং হিন্দু মাতা হইবার উপযুক্ত

শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। স্বাভাবিক এবং জাতীয় শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের হিন্দুপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করাই সভার উল্লিখিত কার্য্যের বিশেষ লক্ষ্য। কলিকাতা নগরীতে এজন্ম সরল ভাষায় কতকগুলি বক্তৃতা হইবে।...বিজ্ঞানের সরল সত্য সকল, নীতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্যাকরণ এবং রচনা, ইতিহাস, ভূগোল, গৃহকার্য্য এবং আদর্শ হিন্দু স্ত্রীচরিত্র এই সমস্ত উপদেশের অন্তর্গত বিষয় হইবে ; তত্ত্ববিদ্যা, চিত্র এবং সূচীর কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হইবে। যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা এখানে উপদেশ শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদিগকে বার্ষিক পরীক্ষার অধীন হইতে হইবে, ছাপান প্রশ্নের কাগজ সকল তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইবে। কলিকাতা ও বিদেশের অন্যান্য যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা উপযুক্তরূপে শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিতে আসিবেন তাঁহাদিগকেও পরীক্ষায় গ্রহণ করা হইবে। পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে অলঙ্কার, প্রশংসাপত্র এবং ৫০ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তি পুরস্কাররূপে প্রদত্ত হইবে।"*

ভারত সংস্কার সভার অধীনে এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। কেশবচন্দ্র ইহার সভাপতি হইলেন। স্থির হইল যে, পূর্ব্বোক্ত মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ১৮৮২, ১লা মে দিবসে ১০নং আপার সারকুলার রোডে এই উচ্চ স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ের একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিও গঠিত হয়। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনাদি ব্যবস্থা বিস্তারিত ভাবে এইরূপ ধার্য্য হইয়াছিল—মহিলাদের জন্ম পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট করা, পাঠ্য পুস্তকের অনুমত

* পরিচারিকা—বৈশাখ ১২৮৯।

কলেজ-গৃহে নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে একবার বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা ও মহিলাগণকে তাহাতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দান, বৎসরে একবার পরীক্ষা গ্রহণ এবং উৎকৃষ্ট ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ। কলেজ— সিনিয়র ও জুনিয়র, মাত্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।* বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসেই ফাদার লাফোঁ চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণাদি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথম দিনে প্রায় পঞ্চাশটি মহিলা উপস্থিত ছিলেন।† ইহার পরে এইরূপ বক্তৃতাদান নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল। অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৮৯ সংখ্যা 'পরিচারিকা' নিম্নলিখিত বক্তা ও বক্তৃতার উল্লেখ করেন,—

> "সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ফাদার লাফোঁ বিজ্ঞান বিষয়ে, বাবু কেশবচন্দ্র সেন নীতি বিষয়ে, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এম-এ ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিষয়ে, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নারীজীবন বিষয়ে, ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি শারীর বিধানবিদ্যা বিষয়ে, পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রাচীন আর্য্যানারীদিগের আচার ব্যবহার বিষয়ে, এক এক জন করিয়া প্রতি শনিবারে ১০নং আপার সারকুলার রোডস্থিত এই বিদ্যালয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহাদের অনেকের উপদেশের সারাংশ গত কয়েক সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। গড়ে প্রায চল্লিশ জন মহিলা উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন।"

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস নাগাদ এই বিদ্যালয়টি ভিক্টোরিয়া কলেজ নামে অভিহিত হয়। ২রা জানুয়ারী ছাত্রীগণের বাৎসরিক পরীক্ষা গৃহীত হইল। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী,

* *The New Dispensation*, March 11, 1883.

† পরিচারিকা—জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীননাথ মজুমদার এবং কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং পরীক্ষা লইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। দুই জন নারীকে ইংরেজী ও বাংলা পুস্তক রচনাব জন্যও পুরস্কার দিবার কথা ঘোষিত হইল। পরীক্ষক সভার সভাপতি ছিলেন কেশবচন্দ্র এবং সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী সেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী তিন শত এবং বিজনগ্রামের মহারাণী পাঁচ শত টাকা দান করিলেন। ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর ও কুচবিহারের মহারাজা, এবং বরোদার গাইকোয়াডের নিকট হইতেও অর্থসাহায্য পাওয়া গেল।

কলেজের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য ৯ই মার্চ্চ ১৮৮৩ দিবসে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইল। কলিকাতার লর্ড বিশপ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। গৃহকর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া ঘরে বসিয়া দেশীয় রীতি অনুসারে মহিলাগণের এরূপ শিক্ষালাভের নূতন ব্যবস্থাকে তিনি বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। যে যে বিষয়ে উৎকর্ষের জন্য পারিতোষিক বিতরিত হয় তাহা দৃষ্টে জানা যায়—নারীজাতির কিরূপ ব্যাপক শিক্ষা কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছিল। শুধু কলিকাতায় নহে, সুদূর মফস্বল হইতেও মহিলাগণ এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পারিতোষিকের বিষয়, পারিতোষিক ও তৎপ্রাপ্ত ছাত্রীদের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল,—

> "শ্রীমতী মোহিনী সেন উচ্চ শ্রেণীর সমুদায় বিষয়ের পরীক্ষায় অত্যুৎকৃষ্ট রূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি বার্ষিক দুই শত টাকার ছাত্রীয় বৃত্তি ও স্বনামাঙ্কিত একটি সুন্দর রূপার বড়ী পুরস্কার পাইয়াছেন, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী উক্ত শ্রেণীর পরীক্ষায় দ্বিতীয়-স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি একশত টাকার ছাত্রীয় বৃত্তি ও রৌপ্য

মেডল পারিতোষিক পাইয়াছেন, কুমারী চারুবালা সেন নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি বার্ষিক একশত টাকার ছাত্রীয় বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীতে উত্তম বাংলা গদ্য রচনার জন্য যে পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল তাহাতে কিশোরগঞ্জের শ্রীমতী কিশোরী মোহিনী সেন এবং ঢাকা জেলার কোন পল্লীগ্রামের এক কুলবধূ এই দুই জনে তুল্যরূপে অত্যুচ্চ নম্বর পাইয়াছেন। দুই জনেই পঁচিশ টাকা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত কুলবধূটি উত্তম হস্তলিপির জন্যে পনর টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ঢাকা জেলার পল্লীগ্রামের একটি হিন্দু কন্যা শিল্পের জন্য দশ টাকা, একটি ব্রাহ্মিকা উত্তম রন্ধনের জন্য ২৫ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। এবং পরীক্ষোত্তীর্ণা সকল ছাত্রীই পুস্তকাদি পারিতোষিক লাভ করিয়াছেন।"*

কলিকাতাস্থ বর্ত্তমান ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া কলেজের স্মৃতিমাত্র বহন করিতেছে।

বামাহিতৈষিণী সভা

বামাহিতৈষিণী সভা নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়াছি। 'বামাবোধিনী' পত্রিকা এই সভার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা এবং ইহার প্রথম দুইটি অধিবেশনের বিষয় বৈশাখ ১২৭৮ (মে ১৮৭১) সংখ্যায় এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :

* পরিচারিকা—ফাল্গুন ১২৮৯।

"গত আশ্বিন মাসের বামাবোধিনীতে একটি স্ত্রীসমাজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করা যায়, তদনুসারে কলিকাতায় কয়েকবার স্ত্রীলোকদিগের একটি সভা হয় এবং কুমারী পিগট তাহার অধ্যক্ষতা করেন। আমরা পাঠকগণের অবগত করিয়াছি, এই সভা পরে ভারত-সংস্কার সভার অধীনে বিদ্যালয় আকারে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রস্তুত হইয়াছে।...এক্ষণে যারপর নাই মহোল্লাসের বিষয় বলিতে হইবে, সেই শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইতে আবার নারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কার্য্য যেমন চলিতেছে চলিবে, অথচ স্বতন্ত্র একটি সভাদ্বারা স্ত্রীজাতির সর্ব্ববিধায় উন্নতি সাধনেব উপায় অবলম্বিত হইবে ইহা অপেক্ষা সুসংবাদ আর কি আছে?"

"ভারত সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে এবং শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়েব ছাত্রীগণের উৎসাহে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম বামাহিতৈষিণী সভা। বামাগণের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহার অধিবেশন পক্ষান্তে শুক্রবার অর্থাৎ মাসে দুই বার হইবে। সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাক্রান্ত মহিলাগণ এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষকগণও সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। সভাস্থলে স্ত্রীজাতির হিতজনক রচনা পাঠ বক্তৃতা ও কথোপকথন হইবে। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় ৩০ জন ভদ্র হিন্দু মহিলা উপস্থিত হন এবং মহামান্য জজ ফিয়ার সাহেবের স্ত্রী বিবি ফিয়ার দর্শক হইয়া আইসেন। সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। প্রথমতঃ বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। এবং তাহাতে তাহাদের

শরীর মন ও আত্মা এই তিন বিষয়ক উন্নতি অর্থাৎ সুস্থতা, বিদ্যা ও ধর্ম্ম সাধন না হইলে পূর্ণ উন্নতিসাধন হইবে না সুন্দর রূপে প্রদর্শন করেন। পরে তাঁহার চারিটি ছাত্রী সেই বিষয়ে রচনা পাঠ করিলেন। কেশববাবু বিবি ফিরিয়াকে এই সকল বিষয় ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভ্য শ্রেণী মধ্যে তাঁহার নাম সংযুক্ত করিতে বলিলেন। কুমারী পিগট, ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু দুর্গামোহন দাসের পত্নীগণ ও উপস্থিত অন্যান্য মহিলাগণ সভার সভ্য হইলেন।"

বামাহিতৈষিণী সভার সভাপতি হইলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং সম্পাদক শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী রাধারাণী লাহিড়ী। প্রথম বৎসরে প্রতিপক্ষান্তে অন্যূন যোলটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। একটি অধিবেশনে নারীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়। রাজলক্ষ্মী সেন এবং সৌদামিনী খাস্তগিরি এই বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং এই দুইটিই ১২৭৮, ভাদ্র সংখ্যা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাঙালী মহিলার কিরূপ পরিচ্ছদ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রের সিংহগড় হইতে জনৈকা বঙ্গনারীর একখানি পত্র পরবর্ত্তী কার্ত্তিক সংখ্যা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল। ইনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

রাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছিস্থ উদ্যানে ভারত আশ্রমে* ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল এই সভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব স্থায়ী

* ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭২। এই আশ্রম একদল দেশহিতব্রতী ত্যাগী কর্ম্মী গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ 'প্রবাসী' আষাঢ় ১৩৫৭, পৃ. ২৭১-৭৩ দ্রষ্টব্য।

সভাপতি কেশবচন্দ্র সেনের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয়। সম্পাদক রাধারাণী লাহিড়ী বৎসরের কার্য্যাবলীর একটি বিবরণ পাঠ করেন।

প্রথম সাম্বৎসরিক সভায় রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী মজুমদার প্রমুখ মহিলা ছাত্রীরা নারীজাতির উন্নতিমূলক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সভাপতি কেশবচন্দ্র স্ত্রীজাতির শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন—

"স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন প্রকৃতি। উভয়ের স্বভাব ভিন্ন এবং অধিকারও ভিন্ন। দুই জনেরই উন্নতির পথে চলিবার অধিকার এবং উভয়েরই তদুপযোগী স্বভাব আছে। কিন্তু এ অধিকার ভিন্ন; যদিও পরিমাণে সমান। বলসাপেক্ষ কার্য্য পুরুষজাতির অধিকার; দয়া মমতার কার্য্য স্ত্রী জাতির কোমল প্রকৃতির উপযোগী। যখন স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, তখন তাঁহাদের উন্নতিসাধনের চেষ্টাও এ দেশে বিভিন্ন হওয়া উচিত। স্ত্রী জাতির উন্নতিসাধন তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ বিদ্যাশিক্ষা; ২ গৃহের সুনিয়ম সংস্থাপন; ৩ জনসমাজে স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার।

"দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, ভারতবর্ষের কোন স্থানে স্ত্রীশিক্ষায় বিশুদ্ধ প্রণালী সংস্থাপিত হয় নাই। কেবল ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতির আলোচনাতে স্ত্রীজাতির উন্নতি হয় এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। স্ত্রীজাতিকে স্ত্রীজাতীয় সদ্‌গুণে উন্নত করিতে হইবে, পুরুষজাতীয় গুণে তাহাদিগকে উন্নত করিলে উন্নতি না হইয়া অবনতিই করা হইবে। স্ত্রী জাতির যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে হৃদয়ে স্বাভাবিক কোমলতা ও মধুরতা রক্ষা করিতে হইবে। কাঁঠালকে আম্র বা আমড়াকে নিম্ব করিলে তাহাকে

উন্নতি বলা যায় না। প্রকৃতি বিনাশ উন্নতি নহে। প্রকৃতি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দেখা উচিত যে প্রকৃতিসঙ্গত শিক্ষা হইতেছে কি না? গৃহকার্য্য সম্পাদন, পিতামাতার সেবা, সন্তানপালন, পুরুষগণসহ সমুচিত ব্যবহার এ সকল বিশেষরূপে শিক্ষা করা উচিত। ইতিহাস অঙ্ক ন্যায় প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত হওয়া যায়, দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে সম্ভ্রান্ত লোকের বাটিতে বিদায় লাভ করা যায়, এক একজন স্ত্রী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারেন, কিন্তু ইহা স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বিশুদ্ধ স্ত্রী, বিশুদ্ধ মাতা, বিশুদ্ধ কন্যা, বিশুদ্ধ ভগ্নী হওয়া স্ত্রীজাতির জ্ঞানলাভের এই লক্ষ্য। স্বামী, কন্যা, মাতা ও ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য না-জানা নারীদিগের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় মূর্খতা। কেবল ইতিহাস, ভূগোল পড়িলে তোমরা কৃতবিদ্য বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারিবে না। ব্যাকরণে সন্ধি শিখিয়াছ বটে, কিন্তু আপনার পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে এখনও সন্ধি স্থাপন করিতে পারিলে না। যেখানে গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা নাই, বস্ত্র মলিন, শয্যা মলিন, শরীর অপরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব, যেখানে পিতামাতা পুত্রকন্যা ইহাদিগের মধ্যে অসদ্ভাব, স্বামী স্ত্রীতে অপ্রণয় ও অসম্মিলন, সেখানে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা নাই। যাহাতে পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সংসারধর্ম্ম পালনে তাচ্ছিল্য ভাব দূর হইয়া তৎপ্রতি অনুরাগ হয় এরূপ জ্ঞান শিক্ষা অত্যাবশ্যক।"*

বামাহিতৈষিণী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণও পাওয়া যাইতেছে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন

* বামাবোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ ১২৭৯ (মে ১৮৭২)

বেলঘরিয়ায় এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এবারেও কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সম্বৎসরের বিভিন্ন অধিবেশনে যে কয়টি বিষয় আলোচিত হয় তাহা যথাক্রমে—(১) পুরাকালের হিন্দু ও বর্ত্তমানকালের সুসভ্য ইংরেজ রমণীদিগের কি কি গুণ অনুকরণীয়, (২) সন্তান পালন, (৩) দয়া, (৪) আদর্শ রমণী, (৫) বঙ্গীয় রমণীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাঁহাদিগের প্রতি ইংলণ্ডীয় নারীগণের কর্ত্তব্য, (৬) নারীগণের ধর্ম্মহীন শিক্ষা অনুচিত কিনা, কি প্রকার শিক্ষা দিলে নারীগণের সমগ্র উন্নতি হইতে পারে, (৭) নারীজীবনের উদ্দেশ্য।

বামাহিতৈষিণী সভার আর কোন বিবরণ এতাবৎ পাওয়া যায় নাই। কিছুকাল চলিবার পর এই সভাটির কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ "প্রচারকগণের সভায় নির্দ্ধারণ" নামক পুস্তকে (পৃ. ৬৪) ২৯ মাঘ ১৮০০ শকের সভায় এই নির্দ্ধারণটি পরিদৃষ্ট হয়,— 'ব্রাহ্মিকা সমাজ এবং বামাহিতৈষিণী সভা পুনরুদ্দীপনের কথা হইল।' ইহার পর সভা যে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাইতেছি। 'পরিচারিকা' আশ্বিন ১২৮৬ (১৮৭৯) সংখ্যায় "লণ্ডন" শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পাদটীকায় আছে, "বামাহিতৈষিণী সভায় সভাপতি কর্ত্তৃক বিবৃত।"

মৃত্যু

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং শোকসভায় তাঁহার

গুণাবলী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সময়ে কেশবচন্দ্র সম্পর্কে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র (মাঘ ১৮০৫ শক) উক্তি কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি—

"এই শ্রীমান ধর্ম্মপ্রচারক্ষেত্রে অটলপদে দাঁড়াইয়া যে কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন, জগৎ তাহা কখনও ভুলিবে না। ইঁহার পবিত্র উপদেশ দীপ্ত দিবালোকের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া, অনেককেই মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয়াছিল। সঙ্কটে অধ্যবসায়, গন্তব্য পথের কণ্টকশোধন করিবার জন্য চেষ্টা, প্রতিপক্ষের অত্যাচাব সহিবার জন্য মহানুভবতা এবং সকলকে একসূত্রে বাঁধিবার জন্য দক্ষতা কেবল ইঁহারই ছিল। এই সমস্ত বিষয়ে এই মহাত্মার পদাঙ্ক বালুকারাশির উপর নয়, শিলাপটে পতিত আছে। এক্ষণে এই উজ্জ্বল ভাবত-নক্ষত্র অস্তমিত, যদিচ ইদানীং আমাদের সঙ্গে তাঁহার কোন কোন বিষয়ে কিছু মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, তথাচ আমরা একজন প্রকৃত বন্ধু ও ভ্রাতাকে হারাইলাম এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয় এক সময় যাঁহার উপর ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত আশা-ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিও একটি সর্ব্বপ্রধান সৎশিষ্যকে হারাইলেন।"

পত্র-পত্রিকা পরিচালন ও সম্পাদন

The Indian Mirror : পত্র-পত্রিকা সম্পাদন ও পরিচালনে কেশবচন্দ্রের কার্য্যকলাপ বিষয়ের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। তিনি ইংরেজী পাক্ষিক-পত্র 'ইণ্ডিয়ান-মিররে'র প্রতিষ্ঠাবধি (১লা আগস্ট ১৮৬১) বৈষয়িক সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকাখানি তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচালনাধীনে আসে। ইহার সম্পাদক হন নরেন্দ্রনাথ সেন। নরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

তিনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এটর্নিশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্নি হন ও 'মিররে'র সংস্রব ত্যাগ করেন। ইহার পর 'মিরর'-সম্পাদন ও পরিচালন-ভার কেশবচন্দ্র গ্রহণ করেন। 'মিরর' ১৮৬৯, ১লা জানুয়ারী তারিখে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৮৭১, ১লা জানুয়ারী দৈনিক পত্রিকারূপে এখানি প্রকাশিত হইল। সম্পাদনা-ভার পুনরায় অর্পিত হয় নরেন্দ্রনাথ সেনের উপর। তদবধি ইহার সম্পাদনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। পত্রিকার স্বত্বাধিকারও ক্রমে তাঁহারই হইয়া যায়। পত্রিকাখানির শিরোভূষণ ছিল "Veluti in Speculum"। ইহার ইংরেজী মর্ম্ম—"As from the Watch-Tower"।

The Sunday Mirror : কেশবচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় ১৮৭৩, ২৯শে জুন হইতে প্রতি সপ্তাহে রবিবার এখানি প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রধানতঃ ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় ও রচনাসমূহ ইহাতে স্থান পাইত। ইহার শিরোভূষণ ছিল "Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward man"।

ধর্ম্মতত্ত্ব : কার্ত্তিক ১৭৮৬ শক (অক্টোবর ১৮৬৪) হইতে মাসিকরূপে পত্রিকাখানি বাহির হয় মুখ্যতঃ কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে। ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে: "ধর্ম্মনীতি; ধর্ম্মতত্ত্ব; সামাজিক উন্নতি; ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি; নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা; সাধুদিগের জীবন; বেদ পুরাণ বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক হইতে সত্যধর্ম্ম প্রতিপাদক ভাব" প্রকাশ। দ্রঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', অগ্রহায়ণ, ১৭৮৬ শক।

'ধর্ম্মতত্ত্ব' ১৭৯০ শকে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। তখন হইতে ইহার শিরোভূষণ হয়:

"সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্য শাস্ত্রমনশ্বরং ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥"

সুলভ সমাচারঃ ভারত-সংস্কার সভার 'সুলভ সাহিত্য' বিভাগের অন্তর্গত হইয়া কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক এখানি প্রকাশিত হয় ১লা অগ্রহায়ণ ১২৭৭ সাল হইতে। ইহার পরিচালনার ভার উক্ত সভার পক্ষে কেশবচন্দ্র গ্রহণ করেন। 'সুলভ সমাচারে'র সম্পাদক প্রতি বৎসর এক একজন নিয়োজিত হইতেন। ইহার প্রথম সম্পাদক— উমানাথ গুপ্ত। সমাচারের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ বর্ণিত হয়ঃ "হিত উপদেশ, নানা সংবাদ, আমোদজনক ভাল ভাল গল্প, আমাদের দেশের এবং বিদেশের ইতিহাস, বড় বড় লোকের জীবন, যে সকল আইন সাধারণের পক্ষে জানা নিতান্ত আবশ্যক, চাল ডাল প্রভৃতির দর এবং বিজ্ঞানের মূল সত্যসকল যতদূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে···"ইত্যাদি।

'সুলভ সমাচারে'র বৈশিষ্ট্য দুইটি। প্রথমতঃ এখানি একপয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক। পূর্ব্বে এরূপ স্বল্পমূল্যে পত্রিকা এদেশে প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যই মুখ্যঃ ইহার ভাষা অতি সহজ, সরল, অথচ সরস এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট। সুলভ সমাচারের ভাষা ও ভাবাদর্শ কেশবচন্দ্র দ্বারা অনুপ্রাণিত ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। তিনি ইহার অন্যতম নিয়মিত লেখক ছিলেন। ভাষায় এবং ভাবে অন্য লেখকগণও তাঁহার অনুসরণ করেন। একারণ কোন্ কোন্ লেখা কেশবচন্দ্রের, তাহা বাছাই সম্ভব নয়। সুলভ সমাচারের প্রথম শিরোভূষণঃ

"ধনমান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে ওঠা দায়।
জ্ঞান ধর্ম্ম চাও যদি অবারিত দ্বার;
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।"

বর্ত্তমানে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া একটা রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে। ইহার সূচনা দেখি 'সুলভ সমাচারে'র মধ্যে। শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে লঘু রচনা ও লঘু চিত্রাবলী সমন্বিত হইয়া সমাচারের একখানি ক্রোড়পত্র বাহির হইত।

বামাবোধিনী পত্রিকা : ভারত-সংস্কার সভার অন্তর্গত স্ত্রীজাতির উন্নতি বিভাগের মুখপত্রস্বরূপ পূর্ব্ববৎ উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় এই পত্রিকাখানি পরিচালিত হয়। সভার মুখপত্রবিধায় ইহার পরিচালনায় কেশবচন্দ্রের যে বিশেষ হাত ছিল তাহা বলা চলে। ইহাতে কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত 'বামাহিতৈষিণী সভা'র যাবতীয় সংবাদও বাহির হইত। কি স্বদেশে কি বিদেশে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীজাতির উন্নতিবিষয়ক বিবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধ, এবং ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের রচনাও সাগ্রহে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করিতেন।

মদ না গরল ? : ভারত-সংস্কার সভার অন্তর্গত "সুরাপান ও মাদক দ্রব্য নিবারণ" বিভাগের মুখপত্র। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, কেশবচন্দ্র ইহার সম্পাদনা-ভার তাঁহার উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন। এখানি মাসিকপত্র, বৈশাখ ১২৭৮ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার হাজার খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইত।

ধর্ম্মসাধন : সাপ্তাহিক পত্র, ২১শে বৈশাখ ১৭৯৪ শক (১৮৭২) হইতে প্রকাশিত হয়. ইহা কেশব-মণ্ডলীর সঙ্গত-সভার মুখপত্র। ইহার সম্পাদনা-ভার ছিল উমেশচন্দ্র দত্তের উপর। এখানিও এক পয়সা মূল্যের পত্রিকা। ইহাতে কেবল সঙ্গতের বিবরণ ও ব্রাহ্মমন্দিরের উপদেশের সারমর্ম্ম পরিবেশিত হইত। 'ধর্ম্মসাধনে'র শিরোভূষণ :

"ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না,
কর সাধন, পূর্ণ হবে মনস্কাম।"

বালকবন্ধু : পাক্ষিক পত্র। ২০শে বৈশাখ ১৮০০ শকে (১৮ এপ্রিল, ১৮৭৮) পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—কেশবচন্দ্র সেন। নাম হইতেই বুঝা যায়, বালক-বালিকাদের পাঠোপযোগী রচনা ইহাতে পরিবেশিত হইত। পত্রিকাখানি সচিত্র, নগদমূল্য মাত্র এক পয়সা। গল্প, কবিতা, নীতিকথা, হেঁয়ালি, অঙ্ক প্রভৃতি ইহাতে স্থান পাইত। কিছুদিন বাহির হইবার পর 'বালকবন্ধু' বন্ধ হইয়া যায়। কেশবচন্দ্রের জীবিতকালে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর এখানি পুনরায় মাসিক পত্রাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরিচারিকা : ভারত-সংস্কার সভার অন্যতম মুখপত্র। নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিষয়ে কেশব-মণ্ডলীর কার্য্যকলাপের বিবরণ যথারীতি ইহাতে প্রকাশিত হইত। কুচবিহারবিবাহেব পর সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত কেশব-বিরোধী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেব অন্যতম কর্ণধাব হন। তখন একখানি স্বতন্ত্র মহিলা-পত্রিকার প্রয়োজন অনুভূত হইল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে গিরিশচন্দ্র সেনের প্রস্তাবে ও উদ্যোগে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'পবিচারিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র ১২৮৫, ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পবে 'পরিচারিকা'-পরিচালনার ভার লইলেন কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'আর্য্য নারীসমাজ'। বলা বাহুল্য, আরম্ভ হইতেই 'পরিচারিকা'র সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কেশব-প্রবর্ত্তিত নারীজাতির উন্নতি-মূলক অভিনব প্রচেষ্টাসমূহের সকল বিবরণই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে 'পরিচারিকা'য় প্রদত্ত হইত।

বিষ-বৈরী : কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ব্যাণ্ড অফ হোপ বা আশালতা দলের মুখপত্র। কেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল সেনের সম্পাদনায়

১২৮৭ বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৮০) মাসিকরূপে প্রকাশিত হয়। এখানি বিনামূল্যে বিতরিত হইত।

The New Dispensation : 'নববিধান'-এর ভাব প্রকাশ ও প্রচারার্থ কেশবমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ এই ইংরেজী সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশিত হয়। প্রতি সপ্তাহে কেশবচন্দ্র নববিধানের উচ্চ ভাবাদর্শ বিভিন্ন দিক হইতে ইহাতে ব্যাখ্যা করিতেন।

The Liberal : কেশবচন্দ্রের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের সম্পাদনায় এই সাপ্তাহিক পত্র ১৮৮২, জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। এখানি সংবাদপত্র আখ্যা পাইবার যোগ্য। কিছুকাল পরে ইহা The New Dispensation-এর সঙ্গে মিলিত হইয়া The New Dispensation and the Liberal নাম গ্রহণ করে।

রচনার নিদর্শন

অনেক দিন হইল, এই বেদী হইতে জীবন-পুস্তকের মহিমা বর্ণন করা হইয়াছে। সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। বিশ্বাসীর জীবন, সাধকের জীবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সকল বস্তু অপেক্ষা আদরনীয় আপনার জীবন। যদি ব্রহ্মাণ্ডপতি মনুষ্য-জীবনকে বেদ বেদান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া থাকেন, তবে বিশ্বাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, জীবনের কথা ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিবৃত করেন। সেই জন্য পরম পিতার আদেশে এই বক্তার জীবনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই লোকেশ, গণেশ, মহেশ যিনি, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে, বারবার প্রণাম করিয়া, এই সুমিষ্ট মধুময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্ম্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটী ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, কর্ম্মজীবনের সেই উষাকালে "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতবে উত্থিত হইল। ধর্ম্ম কি, জানি না ও ধর্ম্মসমাজ কোথায়, কেহ দেখায় নাই; গুরু কে, কেহ বলিয়া দেয় নাই; সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অগ্রসর হয় নাই; জীবনেব সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাস স্বরূপ "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই" এই শব্দ উচ্চাবিত হইত। কেন, কিসেব জন্য প্রার্থনা কবিব, তাহাও সম্যক্‌রূপে বুঝিতাম না, তর্ক করিবারও সময় হয় নাই। কেন প্রার্থনা করি, জিজ্ঞাসা করিবার লোকও ছিল না। কে প্রার্থনা করিতে বলিল, তাহাও কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভ্রান্ত হইতে পাবি এ সন্দেহও হইল না। প্রার্থনা করিলাম। ভিত্তি স্থাপনেব সময় কে অট্টালিকাব সৌন্দর্য্য চিন্তা করে? কি রং দিব বারাণ্ডায়, তাহা কি মানুষ তখন ভাবে? তখন কেবল অটল ভাবে ভিত্তিই স্থাপন করিতে হয়।… [জীবনবেদ : পৃ. ১-২]

…কবে সংসারের আসক্তিতে মৃত্যুগ্রাসে পড়িব, কবে টাকা ছুঁয়ে মরিব, এ ভয় বড় করি। যেমন কাম ক্রোধকে ভয়ানক বোধ কবি, তেমনই স্ত্রী পুত্র সংসারকেও বিপদজ্ঞান কবি। পাছে ঈশ্বব অপেক্ষা এই সকলকে ভালবাসি, পাছে সংসাবকে অধিক প্রিয় বোধ করি, এই আশঙ্কায় সংসাবকে ভীষণ দৈত্য মনে হইত। পাছে ভক্তি না হয়, এই ভয়ে অমাবস্যা ভালবাসিতাম। বাগানে গিয়া আমোদ করিবার ইচ্ছা হইত না, হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতাম না, অন্ধকার স্থানে চুপ করিয়া জড়ের মতন থাকিতাম। কেবল দুই একটি মনের কথা ঈশ্বরকে জানাইতাম।

আর কাহাকেই বা জানাইব? এইরূপে জীবনের মূলে বৈরাগ্য হইল। জীবন-বৃক্ষের আকার প্রকার সকলই বৈরাগ্য দ্বারা হইল। বৈরাগ্যমূলক জীবনে যাহা হওয়া আবশ্যক, তাহাই হইল। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবের জয় হইল। বিবেক ও বৈরাগ্য দুই ভাই মিলিয়া পাপ জীবনকে শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে দেখি, সংসার কাছে আসিতে পারিল না।

আত্মপীডন ও ভার্য্যাপীড়নের দ্বারা ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল। অবশেষে যাহারা ভয়ের কারণ ছিল, তাহারাই বন্ধু হইল; যে শ্মশানে বাড়ী আরম্ভ করা হইয়াছিল, সেই শ্মশানে ফলফুল শোভিত উদ্যানে পরিণত হইল। মধ্যস্থলে হরির পথ হইল। শশ্মান যে কোনকালে ছিল, এমন আর বোধ হয় না। আরম্ভ দুঃখে, সুখ শেষে। যাঁহারা হাসিতে হাসিতে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন, যাঁহারা আরম্ভ হইতে সৌভাগ্যশালী, তাঁহাদের দলে আমাকে শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। মাথার উপর দিয়া আমার কত বিপদই গিয়াছে। শব করিয়া না ফেলিলে দেবত্ব পাইবে না, এই বিধি ঈশ্বর আমার উপর খাটাইয়াছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি শস্য বপন করিয়াছিলাম, এখন হাসিতে হাসিতে শস্য সঞ্চয় করিতেছি। প্রথম কত কাঁদিয়াছি এখন হরির শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ কবিয়া হাসিতেছি। এ বিধি সকলের বিধি হইতে পারে না। যাঁর পক্ষে যাহা বিধি তাঁহাকে তদনুসারে চলিতে হইবে। কিন্তু এ জীবনের একটি কথা সকলের পক্ষেই খাটিতে পারে। যদি কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, যদি কোন কীর্ত্তি রাখিতে হয়, যদি মহদ্ব্যাপার প্রসব করিতে হয়, তাহা হইলে এই গর্ভ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। কেহ কোন কীর্ত্তি রাখিতে চাও, কেহ প্রচারক হইবে মনে কর, কেহ ব্রত লইয়া লোকের মঙ্গল করিবে, এরূপ যদি মনে করিয়া থাক,

কিছুদিনের জন্য একবার বনে যাইতেই হইবে। দ্বিজ হইতে যদি চাও, একবার দণ্ডধারী হইয়া অন্ততঃ কয়েকপদ ঘুরিয়া আসিতেই হইবে;—এই যে উপনয়ন সংস্কারের ব্যবস্থা হিন্দুরা করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার উপকার আমাদিগকে লইতে হইবে। যদি দ্বিজ হইবার বাসনা কর, ঈশ্বরের হাতে যদি আপনাকে দেখিতে চাও, অন্তরের ভিতর যে জন্তু আছে, তাহাকে মারিতে হইবে, কুপ্রবৃত্তি সকলকে তাড়াইতে হইবে। কিছু দিন শোকের অশ্রু পড়িবে, মড মড করিয়া হৃদয়ের হাড ভাঙ্গিবে, অবশেষে চমৎকার ভাগবতী তনু লাভ হইবে। বাঁচিতে যদি প্রয়াস কর, একবার মর। ঈশার ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে গিয়া ফিরিয়া এস।…[জীবনবেদ : পৃ. ২৯-৩০]

…আমি দাসত্ব সহ্য করিতে পারিতাম না; এখনও পারি না। কাহাকেও বাসনার বশবর্ত্তী, কি রিপুর বশবর্ত্তী দেখিলে অন্যায় বোধ করিতাম, কোন ক্রমেই সহিষ্ণু হইতে পারিতাম না। আমার অস্ত্র অধীনতা কাটিবার জন্য সততই চক্‌মক্‌ করিত। কৃত অনিষ্ট ফল অধীনতা দ্বারা ফলিয়াছে, ভাবিয়া ঠিক করি নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া যে অস্ত্র-হস্তে দাঁড়াইয়াছিলাম তাহা নয়, অবশেষে এই মহামন্ত্র, গুরুমন্ত্রের আশ্চর্য্য প্রভাব দর্শন করিলাম। এই পৃথিবীতে কত ভাব ভাই ভগিনীকে দাস দাসী করিয়া রাখিয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইবে বলিয়া, ইষ্টদেবতা এমন শিক্ষা দিলেন যে, অধীনতা দেখিলেই আমি উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম। রাগের দাস হইতে কাহাকেও দেখিলে, রাগের উপরেই রাগ হইত। পিতার দাস, কি সন্তানের দাস হওয়াও সহ্য হইত না; ধনের দাস, মনের দাস অথবা কোন সম্প্রদায়ের দাস হইতে যখনই কাহাকেও দেখিতাম, রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। মানুষকে ঈশ্বর স্বাধীনতা দিলেন, আর সেই

মানুষ পৃথিবীর বাজারে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া, পৃথিবীর পাপের নিকট পরাস্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে। রকম রকম লোক রকম রকম লোকের কাছে পদানত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করে। ক্রীতদাস হইবার এত ইচ্ছা! পাঁচদশ বৎসর দাসত্বই করিতেছে! এক এক বিশেষ নারীর দাসত্ব করাকে কি বলে? ব্যভিচার বলে। মানুষের দাসত্ব করাকে কি বলে? দাসদলের মধ্যে গণ্য করে। ধনের দাস হইলে লোভী বলে এ সমস্তই পাপ; দাস হওয়াই পাপ।

আসক্তি সংসারের রাজা হইলে মজিতে হয়। যে গ্রামে যাই, যে বাড়ীতে যাই, রাগ বলে, দেখ, আমার কত দাসদাসী; লোভ বলে, দেখ, কত আমার চাকর, আমি কত বড় রাজাকে পর্য্যন্ত মারিতেছি। দাসত্ব বিধি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একেবারে পোড়াইয়া মারিতেছে। হা বিধাতঃ! স্বাধীনতা যে মুক্তি, অধীনতা যে নরক। স্বাধীনতার জয়-পতাকা উড়াইয়া অধীনতার দুর্গকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতে হইবে। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতায় পড়া হইবে না। কেহ বলেন, গুরুকে মানিও; মন বলে, ভয় করে। পিতামাতাকে মানিও; আশঙ্কা হয়। বন্ধু-বান্ধব যাঁরা, ধর্ম্মেতে যাঁহাদের সহিত মিলন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে মানিও; আত্মা বলে, বড় ভয় করে। খুব যাঁহারা বিশেষ অনুগত, ধর্ম্মে সৎকর্ম্মে অনুকূল, আদরের সহিত তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিও; মন বলিল, অধীন হইতে আমি ভীত হই। কোন বন্ধুর বিশেষ মায়াতে আমি বদ্ধ হইব না। খুব বড় বন্ধু দেখিলেন যে, আমি ভালবাসি বটে, কিন্তু মায়াতে বদ্ধ হইলাম না। এই জন্য আমার বন্ধুরা বলিলেন, খুব যে আমাদের ভালবাসে, তা নয়, ভিতরে এ ব্যক্তি আবার নিজের বুদ্ধিকে দাঁড় করায়; আমরা যা বলি, তা করে না। বন্ধুরা বলেন, এইটি কর, আমি তাহা করি না। অন্যের ভাল কথায় ভাল কাজও করিব না,

ঈশ্বরের কথায় করিব। অন্যের কথায় যাহা করিলাম না, ঈশ্বরের কথায় তাহা আগ্রহের সহিত করিব। যতক্ষণ না ঈশ্বরের কথা শুনিব, ততক্ষণ আমি কাজ আরম্ভ করিব না। এ প্রকার প্রতিজ্ঞায় অন্যের বিপদ হইতে পারে, কিন্তু আমি সৌভাগ্যশালী, আমার ইহাতে বিপদ না হইয়া লাভই হইয়াছে। [জীবনবেদ : পৃ. ৩৭-৩৮]

চারি সহস্র বৎসরের পর আবার হিমালয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যে গম্ভীর হিমালয় পর্ব্বত, বহু শতাব্দী গত হইল, জাগ্রৎ জীবন্তভাবে ব্রহ্মনাম গান করিয়াছিল, প্রাচীন আর্য্যদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিল, এবং সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রহ্মের যশ ঘোষণা করিয়াছিল, কালক্রমে সেই পর্ব্বত নিস্তেজ এবং নির্জীব হইয়া ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। প্রাচীন কালে সমুদায় ভারত এই হিমালয়ের পদতলে বসিয়া ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগধর্ম্ম শিক্ষা করিত এবং হিমালয় হইতে বিনিসৃত গঙ্গাতে স্নান করিয়া ভারতবাসিগণ সেই গঙ্গার তীরে বসিয়া হরির আরাধনা এবং জপতপ করিতেন। এই পর্ব্বতের নিকট আর্য্যগণ যেমন ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয় করিতে শিখিয়াছিলেন এমন আর কোন্ জাতি পারিয়াছিল? হিমালয় যেমন প্রাচীন আর্য্য যোগী ঋষিদিগকে উচ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিযাছে এমন আর কে শিক্ষা দিয়াছে।

দেখিতে হিমালয় কেবল কঠিন প্রস্তররাশি, কিন্তু বাস্তবিক উহা ভারতের বৃহৎ ঘনীভূত যোগধর্ম্ম। হিমালয় অভেদ্য কে উহাকে ভেদ করিতে পারে? হিমালয় অটল, অচল, কে উহাকে আন্দোলিত করিতে পারে? এই অভেদ্য হিমাচল গুরু হইয়া আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যদিগকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছে। প্রমাণ বেদ বেদান্ত। ভারতের যোগধর্ম্ম হিমালয়-সম্ভূত। অভ্রভেদী হিমালয় হিন্দুস্থানের মস্তক। সেই উচ্চ মস্তকের ভিতর হইতে যোগতত্ত্ব ধ্যানতত্ত্ব এবং

নানা প্রকার জ্ঞানতত্ত্ব বাহির হইয়াছে। যখন সমুদয় যোগধর্ম্ম বাহির হইয়া গেল, তখন হইতে ঐ পর্ব্বত ক্রমশঃ নিস্তেজ এবং নিরুদ্যম, নিষ্ক্রিয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া নিদ্রায় অচেতন হইল। অনেক বৎসর যোগ শিক্ষা দিবার পর হিমালয়ের বুঝি আর কিছু শিখাইবার ছিল না, গঙ্গাযমুনাকে প্রেরণ করিয়া হিমালয়ের আর বুঝি কোন নদী উৎপাদন করিবার শক্তি রহিল না; তাই বুঝি হিমালয় নিদ্রিত? কিংবা ভারতবাসীর নিকট আর তাদৃশ আদর পাইল না বলিয়া গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় অবসন্ন হইল?

আগে যেমন সেই হিমালয় কথা কহিয়া উপদেশ দিত এখনও আবার সেই পর্ব্বত জীবন্তভাবে কথা কহিতেছে এবং নবীন বংশীয় ভারতবাসী-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে;—'হে ভারতের নব্য সম্প্রদায়, প্রাচীনকালে যেমন তোমাদের ভক্তিভাজন পূর্ব্বপুরুষগণ আমার কাছে বসিয়া পরব্রহ্মের সহিত যোগসাধন করিতেন তোমরাও তাঁহাদিগের ন্যায় যোগী ও তপস্বী হও। তোমরা আর ক্ষুদ্র পরিমিত দেবতার অর্চ্চনা করিয়া হীন হইয়া থাকিও না। আর্য্যস্থানের প্রাচীন মহত্ত্ব স্মরণ কর। বেদ উপনিষদের উচ্চ তত্ত্ব আবার ধারণ কর। পতিত যোগমুকুট তুলিয়া পুনরায় মস্তকে ধারণ কর। আধুনিক সভ্যতা ও বিষয়-বিলাসে মুগ্ধ হইও না। অসার ধন মানের লালসায় অধ্যাত্মযোগ বিনাশ করিও না। বাহ্যিক জড়জগৎ ছাড়িয়া হৃদয়রাজ্য-মধ্যে গভীর ধ্যানে ভূমানন্দ উপভোগ কর। বিজাতীয় জড়বাদ ও জড়াসক্তি পরিহার করিয়া স্বজাতীয় আধ্যাত্মিকতার গৌরব রক্ষা কর। আমি প্রধান হিমাচল তোমাদের বহুকালের গুরু ও বন্ধু, আমাকে অবজ্ঞা করিও না। আমি পরব্রহ্মরূপ পরম রত্ন যেমন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দিয়াছিলাম তেমনি আবার তোমাদিগকে দিব।

ভারতের মস্তক আমি, আমার মস্তকের মণি ব্রহ্মযোগ, সাবধান তাঁহাকে অবহেলা করিও না।'…[সেবকের নিবেদন : ১ম খণ্ড পৃ. ১-২]

এ দেশে বড় মানুষ ও নবাবদের মধ্যে আমোদ প্রমোদ করিবার অনেক উপায় আছে। পায়রা উডান তার মধ্যে একটা। লক্ষ্ণৌ সহরে কত নবাব পায়রা পুষিয়া আমোদ করেন। সময়ে সময়ে নূতন নূতন কৌতুক আমোদে বাবুদের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। বড মানুষেরা সময় যাহাতে সুখে কাটে, সেজন্য কপোতদলকে আকাশে উডাইবার চেষ্টা করেন। কলিকাতায়ও বডমানুষেরা পায়রা উড়ান। পায়বা উড়ান একটা অসার সামান্য ব্যাপার হইলেও, ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত আছে। পায়রা দলবদ্ধ হইয়া উডে কেন? আমার মনে হয়, এই উপস্থিত ভদ্রলোকগুলি পায়বার খাঁচা। চিন্ময় জীবাত্মা পাখী এক খাঁচাব ভিতর থাকে, পাখী স্ত্রী পুত্র লইয়া গৃহে থাকে না। সে যখন প্রথমে ভাল ছোট খাঁচার মধ্যে সতেজ হইল, তখন উড়িল। ভাই, বন্ধু, এখনো কি সবল হইয়াছ?

জীবাত্মা পক্ষী, বিবেক বৈরাগ্য তাব দুইটি পক্ষ। পাখী ঐ দুই পক্ষ বিস্তাব করিয়া আকাশে উডিয়া যায়। পাখী, তুমি কি এখনও স্ত্রীপুত্রে বদ্ধ থাকিবে? আমরা আর্য্যসন্তান, আমাদের শরীরে আর্য্যরক্ত এখনও বিদ্যমান। এই শবীব কাট, দেখিবে, সেই রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে। যোগী ঋষিদিগেব আত্মাপক্ষী উড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমাদেব পাখী উডে না। তাঁহাবা যোগমন্ত্রে সব উড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা সেই মাটীতেই আছি। আমরা যদি বলি, ওরে বাড়ী, ছোট হ, ছোট হয় না; ওরে সোনা, তুই ধূলি হইয়া যা, সে ধূলি হয় না। ওরে পাখী, শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িয়া যা, সে মায়া বন্ধন ছেঁড়ে না। পাখী উডে না। তবে কি আকাশের বিহঙ্গ উডিবে না। আমি

বলি ইহার একটি উপায় আছে। খুব উচ্চ স্থানে যাও, দেখিবে পৃথিবীর বস্তু সব ছোট হইয়া গিয়াছে। তখন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধকে শিশু মনে হয়, প্রকাণ্ড বৃক্ষকে তৃণের মত বোধ হয়। উচ্চস্থানে স্ত্রীপুত্র সব কোথায় পড়ে আছে, সব পায়ের তলায়। তখন কোথায় আমি, কোথায় ঘর বাড়ী। আমি এত বড় হইয়া যাই যে, পৃথিবীকে সরাখানা দেখি ; আর লোকগুলি যেন কীট পতঙ্গ।

অত্যুন্নত পায়রা জীবাত্মা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এত বড় বড় উপাধি পান, এত ধন উপার্জ্জন করেন ; কিন্তু একটী পায়রার সঙ্গে তুলনা কর দেখি? সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, সে খাবারও ভাবনা ভাবে না, ঘর বাড়ীরও চিন্তা করে না। নিশ্চিন্ত বৈরাগী এমন আর কে আছে? পায়রা আপনার আনন্দে বিচরণ করে, সুখে বিহার বিহার করে। সেইরূপ মানুষ যখন উড়িতে থাকে, উড়িতে উড়িতে সে কতদূর যায়, পৃথিবীর লোকে আর তাহাকে দেখিতে পায় না ; চিদাকাশের এমন উচ্চস্থানে উঠে যে, তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। পায়রা কি একা উড়ে? বিধাতার কৌশল অতি অপূর্ব্ব। সাদা কাল লাল নানাবিধ রংএর পায়রা উড়িতে উড়িতে আকাশে উঠে। যখন সূর্য্যের আলোক সমস্ত পায়রার গায়ে পড়ে, তখন তদুপরি স্বর্ণরশ্মির বিস্তার হয়। কি চমৎকার শোভাই দেখা যায়। মানুষ-পক্ষী! তুমি বিবেক বৈরাগ্যের পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়, অগ্রসর হও, উর্দ্ধে উঠ। যোগসাধন পায়রাকে কেউ কখন শিখায়নি, পায়রার গুরু স্বয়ং ঈশ্বর। যখন তাহারা হেলিতে দুলিতে ঢেউ খেলিতে খেলিতে তরঙ্গের মত আকাশের পানে উড়িতে থাকে, তখনকার দৃশ্য মনোহর। যদি দুইটা পায়রা দলছাড়া হয়, তাহারা আবার আসিয়া দলে মিশিয়া যায়। কি আশ্চর্য্য ঐক্য!

পাখী যখন পৃথিবীতে থাকে, তখন এটা তেঁতুলগাছের পাখী, সেটা বটগাছের পাখী, এইরূপ ভেদাভেদ থাকে। পৃথিবীতেই জাতিভেদ, কিন্তু আকাশে এক। পৃথিবীতে থাকিলেই অমুকের পায়রা, কলিকাতার পায়রা, কোন্নগরের পায়রা, ফরাসডাঙ্গার পায়রা গণনা করা যায়। আকাশে ভেদাভেদ নাই, সব একাকার। গ্রামে থাকিতে গেলেই দাগ দিবে। তুমি বাঙ্গালী কাল, তুমি কাফ্রি আরও কাল, তুমি ইংরেজ শাদা। কিন্তু আকাশের সব এক। চিদাকাশে আত্মা পায়রা উড়িল, জ্ঞান-সূর্য্যের আলোক পক্ষীর পক্ষের উপর পড়িল, সত্য-সূর্য্যের আলোকে উহা ক্রমাগত উড়িতে আরম্ভ করিল। যোগী হইয়া বিহঙ্গ-সকল উড়িতেছে। হিংসা নিন্দা নীচে, চিন্তা দুর্ভাবনা পৃথিবীতে, কাম ক্রোধ স্বার্থপরতা মাটিতে বাস করিলেই হয়, আকাশে এ সব কিছুই নাই। অতএব পায়রা হও দেখি, যোগবলে আকাশে উড় দেখি? আমাদের যোগিগণ পাখী হইতেন, ধ্যান-সমাধিতে চিদাকাশে উড়িয়া যাইতেন। আমার মন-পাখীও উড়িয়া গেল। ঐ পায়রার দল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পায়রা তো আকাশের, আকাশ তার বাড়ী, আকাশ তার ঘর, ভূমানন্দসাগর তার পানীয় জল। দেবত্ব এসেছে মনের ভিতর, জ্ঞানবল, ভক্তিবল, পুণ্যবল, প্রেমবল সকলই পাইতেছি। আরও উপরে উঠি, আরও আনন্দ শান্তি লাভ করি, চিদানন্দ আকাশে আকাশে বিহার করা যাউক। [মাঘোৎসব : পায়রা উড়ান]

শাক্য, সর্ব্বত্যাগী হইয়া তুমি কি দেখিলে? তুমি কি পাইলে? বৈরাগ্যমন্ত্রের গুরু, কি তুমি অনুভব করিলে? বল, হে শাক্য, কি সাধনে তুমি বৈরাগ্যরত্ন পাইলে? তোমার যে এত বড় রাজ্য ছিল, অনায়াসে তুমি তাহা পরিত্যাগ করিলে!! কিরূপে তোমার মনে এত তেজ হইল? বিশ্বজননী যখন তোমাকে সৃজন করিলেন,

তখন তোমার প্রাণের ভিতরে এমন কি বিশেষ পদার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তুমি সকল বৈরাগীদিগের উপরে উচ্চ সিংহাসন লাভ করিলে? পৃথিবীর দুঃখ জ্বালা নির্ব্বাণ করিবার জন্য তুমি কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় পদার্থ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলে? তুমি জননীর নিকট কি গূঢ় মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছিলে? তোমার কোন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি ছিল না, তুমি সমস্ত প্রবৃত্তির আগুন নির্ব্বাণ করিয়াছিলে, তুমি কিছুই কামনা করিতে না। তোমার শিষ্য দরিদ্র বৈরাগীগুলি ভিক্ষা চাহিতেও পারে না। হে শাক্য, হে বৈরাগ্যের অবতার, হে হরিসন্তান, বল, তোমার জীবন-বৃত্তান্ত বল, তোমার প্রাণের ভিতরে নির্ব্বিকার হরি কি অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জন সামগ্রী রাখিয়া দিয়াছিলেন। তুমি কিরূপে সকল দুঃখ জ্বালা নির্ব্বাণ করিলে? তোমার পথাবলম্বীরা বৈরাগী। তাহারা কল্য কি আহার করিবে জানে না, ভিক্ষাও করিতে পারে না। এমন দুঃখ দরিদ্রতার ধর্ম্ম তুমি প্রচার করিলে, অথচ বড় বড় রাজা সকল তোমার শিষ্য প্রশিষ্যের পদানত হইল। বৈরাগ্যের নিকট রাজার মস্তক অবনত, বৈরাগীর কাছে সম্রাট বশীভূত। শাক্যমুনি, পৃথিবীর নৃপতিরা তোমাকে রক্ষা করিল না; কিন্তু তোমাকে এবং তোমার বন্ধুদিগকে বাঁচাইলেন হরি। তুমি বৈরাগ্যধামে মহাধনী ছিলে। বৈরাগ্যধন, নির্ব্বাণরত্ন পাইবার জন্য, তুমি রাজত্ব স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব ছাড়িলে। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা সত্যের জন্য সকলই ছাড়েন! পৃথিবীর অসারতা বুঝিয়া, সংসার ছাড়িয়া তুমি বৃক্ষতলে গিয়া বসিলে; স্বর্গের ঈশ্বর দেখিলেন, তুমি সত্যের জন্য সকলই ছাড়িতে পার। এই জন্য স্বর্গ হইতে তোমার মস্তকের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল, ধর্ম্মরাজ্যে কাঁসর ঘণ্টা বাজিল, তোমার স্বর্গের পিতা তোমাকে

গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন করিলেন। তোমার উচ্চ বৈরাগ্য এবং গভীর ধ্যানের কথা শুনিয়া পৃথিবীর বড বড রাজারা বলিল, "আমরা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।" কোথায় তিব্বত, কোথায় চীন দেশ, কোথায় ব্রহ্মরাজ্য, এ সকল স্থান তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। হে গৌতম, তুমি এখনও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছ; তুমি পৃথিবীতে বৈরাগ্যের পথ, নির্ব্বাণের পথ, জীবে দয়া দেখাইয়াছ। তুমি জীবে দয়ার অবতার। তুমিই বলিলে—"একটি পোকাও মারিও না, জীব-হিংসা করিও না।" তোমারই জীবনে সকল দুঃখনিবৃত্তির উপায় ঘনীভূত হইয়াছিল। তোমার দয়ার্দ্র হৃদয় কাহারও দুঃখ সহ্য করিতে পারিত না। পাপী কষ্ট পাইলে তোমার কষ্ট হইত। দুঃখের অবস্থা তোমার সহ্য হইত না, তুমি সর্ব্বত্র দুঃখ নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিতে। তোমার আত্মা বলেন, "কাহাকেও দুঃখ দিও না, কারও দুঃখে উদাসীন থাকিও না।" সে নিষ্ঠুর-হৃদয়, যে এই নির্ব্বাণমন্ত্রবিরোধী। সে শাক্যের শত্রু, যে, কোন জীবকে কষ্ট দেয়। [সাধু-সমাগম: পৃ. ২৬-২৮]

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর, প্রতিদিন দু'বেলা এই আশ্রম-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, আমারা আকাশের নিকট কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করি, না, যথার্থই; কোন জাগ্রৎ দেবতার পূজা করিয়া থাকি? আমাদের উপাসনার বাক্যাড়ম্বর এবং সঙ্গীতের মধুরতা কি শূন্যে বিলীন হয়, না, সত্যই কোন প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়া আমবা কৃতার্থ হই? প্রত্যহ, হে দীনবন্ধো, যাহাতে তোমাকে সমক্ষে জানিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যে সকল প্রার্থনা করি, সম্মুখে থাকিয়া তুমি শ্রবণ কর, এবং আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি অলক্ষিতভাবে তোমার প্রেমময় স্বর্গধামে

অনেক আয়োজন করিয়া থাক, ইহা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দাও। তুমি কাছে আছ, এবং কাছে থাকিয়া আমাদের দুঃখ পাপ দূর করিবার জন্য নানা প্রকার কার্য্য করিতেছ, ইহা আমাদিগকে স্পষ্টরূপে দেখিতে দাও। তোমাকে না দেখিলে আমরা কিরূপে এক পরিবার হইব? আশ্রমের মধ্যে যদি তোমার অব্যবহিত সহায়তা দেখিতে না পাই, এবং তোমার সহযোগী হইয়া কার্য্য করিতে না পারি, তবে যে ইহা তোমার আশ্রম নহে। নাথ, তোমাকে ছাড়িয়া মনুষ্যের সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা নাই। তোমাকে হারাইয়া আর মনুষ্যের কার্য্য করিতে অভিলাষ করি না। তোমার চরণতলে তোমারই আশ্রমে বাস করিতে চাই, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। "আচার্য্যের প্রার্থনা," ১ম ভাগ পৃ. ৫২-৫৩, ২০।৫।১৮৭২

প্রাণেশ্বর! আজ এই প্রার্থনা যে, এই বেলা, এই শুভ মুহূর্ত্তে আমাদিগকে তুমি ভুলাইয়া লও। এখন যাহা বলাবে, আমরা সকলে তাই বলিব। এই বেলা আমাদের হৃদয় প্রাণ কেড়ে লও। এখন আমরা তোমারই, তুমি আমাদের সব কেড়ে লও, কিছু যেন আর আমাদের না থাকে। আজ যেমন তোমার, তেমনই চিরকাল আমি এবং আমরা সকলেই তোমারই হইয়া থাকিব। জননি! জননি! আজ যে আমাদের অধিক বয়স হইয়াছে, এমন মনে হইতেছে না। বালকের মত তোমার কাছে বসিয়া আছি। আজ এক বৎসরের শোক চলিয়া গেল। এ কি স্বর্গের যাদু? তোমার নামে সকল শত্রু পলায়ন করিল। সুযোগ হইয়াছে, প্রাণনাথ! পরিষ্কৃত আকাশে সন্তানদিগকে আজ পাইয়াছ। আজ যদি সন্তানদিগকে চিরপ্রমত্ত করিয়া লইতে পার, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আজ আমাদের পুরাতন চক্ষু নূতন হইল। কোন্ দেশ হইতে কি মন লইয়া আসিয়া-

ছিলাম, কাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতাম, আজ কি হইল! এই নিগূঢ় কৌশল কে জানে? কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম; এই ভক্তি ঘরে বসিয়া, ভক্তবৎসল তুমি, তোমাকে আমরা প্রেম ভক্তি দিচ্ছি। এক দিন মনে ব্যথা হইত, পাছে কিছুদিন পরে আমাদের ভক্তি প্রেম-ফুল শুষ্ক হইয়া যায়; কিন্তু এই সব ফুল কি শুকাইতে পারে? তোমার স্বর্গেতে ইহাদের জন্ম। ভক্তহৃদয় তুমি যে ফুল বিকশিত করিয়াছ, তাহাতে তুমি যে জলাশয় খনন করিয়াছ, এবং তুমি যে নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছ, সে সকল কি শুষ্ক হইতে পারে? তুমি যে ভক্তি-জল পাঠাইতেছ, তাহা যে ফুরাইবে না। মা হয়ে শিখাইয়া দিচ্ছ, বৎস! বল্ না, তোর এই ভক্তি-জল ফুরাইবে না। তুমি বিশ্বাস দিতেছ, আমি মরিব না। অজর, অমর তোমায় এই বালক বালিকাগুলি। জীবননাথ! প্রাণগতি। তোমাকে ভালবাসিব, আর যাঁহারা তোমার সন্তান, তাঁহাদিগকেও ভালবাসিব। ভিতরে তোমার মুখের বচন শুনিব। হে প্রাণেশ্বর! প্রাণ দিতে তুমিই পার। সৌন্দর্য্য দেখাইতে তুমিই পার, মত্ত তুমিই করিতে পার। আমাদিগকে তোমার প্রেমে প্রমত্ত করিয়া, পৃথিবীতে তোমার স্বর্গের শোভা দেখাও, তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুর পর, এই পৃথিবীতে যে সকল সাধু লোক আসিবেন,তাঁহারা অন্বেষণ করিয়া দেখিয়া বলিবেন, ঐ কতকগুলি লোকের মন হইতে ভক্তির মধুর অগ্নির ধুঁয়া উঠিতেছে। আমরা পৃথিবীতে ইহা দিয়া যাইব। এই কি তোমার সেই স্বর্গের ঘর? সেই শান্তি-নিকেতন? এই ঘর কেহই ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। ঐ সোণার শৃঙ্খল হাতে দাও, আর আমাদের মুখে ক্রমাগত প্রেম-মদ ঢাল; আর যখন দেখিবে, আমরা মদ পানে মত্ত হইয়াছি, তখন ঐ শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া ফেলিও। যদি অচেতন করিতে হয়, এই ভক্তি-রসে আমাদিগকে অচেতন কর; হে সুচতুর হইতেও

সুচতুর পরমেশ্বর! তুমি দুষ্ট সন্তানদিগকে বাঁধিয়াছ। আরও প্রেমের কল, ভক্তির কল চালাইতে থাক। এস, পিতঃ! এতদিন পর আজ তোমাকে ধন্যবাদ-পূর্ণ প্রণাম করি, ভক্তি ফুল-মালা লইয়া তোমার চরণে দিই। অবাক্ ভক্তদিগের অবাক্ ঈশ্বর! সৌন্দর্য্য-পূর্ণ প্রেমময়ী জননি! প্রাণ ভগ্ন হয়, যখন ভাবি, কেমন করে তোমাকে ভুলিয়া যাই? হে প্রাণেশ্বর! অত্যন্ত আহ্লাদিত অন্তঃকরণে, তোমার ভক্ত সন্তানগণ, তোমার ভক্ত প্রজাগণ, তোমার দাস দাসীগণ, দেখ, সকলে মিলে তোমার চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি। "আচার্য্যের প্রার্থনা" ১ম ভাগ পৃ. ২২৯-৩১, ২৪।১।১৮৭৫

এসেছি, মা, তোমার ঘরে। ওরা আস্‌তে বারণ করেছিল, কোনরূপে শরীরটা এনে ফেলেছি। মা, তুমি এই ঘর অধিকার ক'রেছ। এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর। নমঃসচ্চিদানন্দ হরে! আজ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, মঙ্গলবার—১৮০৫ শকের ১০ই পৌষ—এই দেবালয় তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করা হইল। এই ঘরে দেশদেশান্তর হইতে তোমার ভক্তেরা আসিয়া তোমার পূজা করিবেন। এই দেবালয়ের দ্বারা এই বাড়ীর, পল্লীর কল্যাণ হইবে। এই সহরের কল্যাণ হইবে এবং সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে। গত কয়েক বৎসর আমার বাড়ীতে ক্ষুদ্র দেবালয়ে স্থানাভাবে তোমার ভক্তেরা ফিরিয়া যাইতেন। আমার বড় সাধ ছিল, কয়েকখানা ইট কুড়াইয়া তোমাকে একখানা ঘর ক'রে দিই। সেই সাধ মিটাইবার জন্য, মা লক্ষ্মি, তুমি দয়া করিয়া, স্বহস্তে ইট কুড়াইয়া তোমার এই প্রশস্ত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলে। আমার বড় ইচ্ছা, এই ঘরের ঐ রোয়াকে তোমার ভক্তবৃন্দসঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুজালম; এই স্থান ছাড়িয়া

আর কোথায় যাইব? আমার আশা পূর্ণ কর। মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া, তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া, যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ, তোমার ঘর সাজাইয়া দিই।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগকেও বলি, আমার মা বড় সৌখীন মা। ভাই, তোমরা মনে করিও না, আমার মা পাথরের মত শুষ্ক মা, তাঁহার কোন সখ নাই। তোমরা সকলে কিছু কিছু দিয়ে মাব ঘরখানি সাজিয়ে দিও। কিছু কিছু দিয়া তাঁহার পূজা করিও। মিছে মিছে অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়া মায়েব পূজা করিও না। মা তোমাদিগকে বড ভালবাসেন। তোমরা একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ, পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে। ভাই রে, আমার মা বড্ড ভাল রে, বড্ড ভাল, মাকে তোরা চিন্‌লি নে। তোরা মার হাতে যাহা দিস্‌, পরলোকে গিয়ে দেখবি, তাহা আদর যত্নের সহিত সহস্র গুণ বাডাইয়া, তাঁহার আপনার ভাণ্ডারে তিনি বাখিয়া দিয়াছেন। এই মা আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রী সৌন্দর্য্য, মা আমার ইহলোক পরলোক, মা আমার সম্পদ সুস্থতা। বিষম রোগযন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দসুধা। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া, তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে! "আচার্য্যের প্রার্থনা" পৃ. ১৪৯৮-১৫০০, ১।১।১৮৮৪

এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ বিংশতি কোটি লোকের বসতিস্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বিংশতিকোটি লোকের মধ্যে হয়ত বিংশতিকোটি সম্প্রদায়। এক দেশের লোকের সহিত আর এক দেশের লোকের মিল নাই। এক জাতির সহিত অপর জাতির লোকের মিল নাই। এই অনৈক্যই ভারতের সকল অমঙ্গলের নিদান। ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁহারা মুসলমান তাঁহাদের সহিত হিন্দুদিগের মিল না হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা এক আর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে অমিল কেন? যখন আর্য্যগণ প্রথমে ভারতবর্ষ অধিকার করেন তখন তো তাহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ছিল না। তবে আর্য্যদিগের মধ্যে একতা না থাকিবার কারণ কি? আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে দুইটি কারণ প্রতীত হয়। সেই দুইটি কারণ ক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

১ম ভাষা। যতদিন সমস্ত ভারতবর্ষে এক ভাষা না হইবে ততদিন কিছুতেই একতা সম্পন্ন হইবে না। যতদিন আর্য্যদিগের একমাত্র সংস্কৃত ভাষা মাতৃভাষা ছিল ততদিন অনৈক্য উপস্থিত হয় নাই। কালের গতিতে আর্য্যগণ কৃষ্ণত্বক্ শূদ্রদিগের সহিত অর্থাৎ আদিম ভারতবাসীদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া বর্ণসঙ্কর হইলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষেই আর্য্যগণ বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িলেন। আর্য্যদিগের ভাষা এবং আদিমবাসীদিগের ভাষা মিলিত হইয়া বিকৃত ভাষা প্রস্তুত হইতে লাগিল। এজন্য সমস্ত ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই এক ভাষা হইতেই প্রথমে দলভেদের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহারা আপনাদিগের ভাষাকে উৎকৃষ্ট মনে করেন তাঁহাদের অপেক্ষা, যাঁহাদের ভাষা নিকৃষ্ট সেই সকল লোকদিগকে তাঁহারা নিকৃষ্ট মনে করিয়া থাকেন। এক ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত। তন্মধ্যে বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দ্দু,

উৎকল, পাঞ্জাবী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, মহারাষ্ট্রি, তৈলঙ্গী, প্রধানতঃ, এই কয়েকটী ভাষা প্রচলিত। সংস্কৃত প্রচলিত ভাষা নহে, সংস্কৃত ভাষা এক্ষণে মৃতভাষা, যে কয়েকটী প্রচলিত ভাষা আছে তাহার এক একটী ভাষা এক একটী প্রদেশে প্রচলিত। কোন কোন স্থানে এক প্রদেশে দুই ভাষা, কোন কোন স্থানে দুই প্রদেশে এক ভাষা প্রচলিত, যে প্রদেশের সহিত যে প্রদেশের ভাষা ভিন্ন সেই প্রদেশের সহিত সেই প্রদেশের মিল নাই। কেহ আপনার ভাষাকে উত্তম মনে করিয়া অন্যের ভাষাকে নিন্দা করিতেছেন। ইহা হইতেই বিষ উৎপত্তি হইয়াছে। কেবল ভিন্ন ভাষাকে নিন্দা করা হয় তাহা নহে, এক ভাষার মধ্যে উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে প্রশংসা নিন্দা হইয়া থাকে। এক বাঙ্গালা ভাষাই তাহার প্রমাণ। সমস্ত বঙ্গদেশে এক মাত্র বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। অথচ কলিকাতা অঞ্চলের লোকদিগের সহিত পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও উত্তর বাঙ্গালার লোকদিগের মধ্যে একতা নাই। কলিকাতা অঞ্চলের লোকেরা পূর্ব্ব বাঙ্গালার লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালদিগকে মনুষ্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। ভাষা এক, তথাপি উচ্চারণের ভিন্নতা প্রযুক্ত এই অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলের লোকেরা যেমন ঢাকা অঞ্চলের লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ ঢাকা অঞ্চলেব লোকেরা আবার শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রামের লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া পরিহাস করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করা হয় তাঁহাদের মধ্যে পরিহাসকারিদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল ভাল লোক আছেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কতকগুলি আচার ব্যবহার রীতিনীতি কলিকাতা অঞ্চলের ব্যবহার হইতে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। পূর্ব্ব-বাঙ্গালাবাসীদিগের বুদ্ধি বিদ্যাও নিকৃষ্ট নহে তবে তাঁহাদিগকে

বাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করা হইবে কেন? এক উচ্চারণের প্রভেদে সকল গুণই কি বৃথা হইবে? অথচ তর্ক করিয়া ইহা নিবারণের উপায় নাই। এই উচ্চারণ প্রভেদের জন্য কি সামান্য অনিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ববাঙ্গালার লোকদিগের সহিত এ প্রদেশের লোকদিগের যে সম্পূর্ণ মিল হইবে ইহা শীঘ্র বিশ্বাস করা যায় না।

যদি ভাষা এক না হইলে ভারতবর্ষে একতা না হয় তবে তাহার উপায় কি? সমস্ত ভারতবর্ষে এক ভাষা ব্যবহার করাই উপায়। এখন যতগুলি ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে হিন্দি ভাষা প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত। এই হিন্দি ভাষাকে যদি ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা করা যায়, তবে অনায়াসে শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু রাজার সাহায্য না পাইলে কখনই সম্পন্ন হইবে না। এখন ইংরাজজাতি আমাদের রাজা। তাঁহারা যে, এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন তাহা বিশ্বাস করা যায় না। ভারতবাসীদিগের মধ্যে অনৈক্য থাকিবে না তাঁহারা পরস্পর এক হৃদয় হইবে, ইহা মনে করিয়া হয়তো ইংরাজদের ভয় হইবে। তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে অনৈক্য না থাকিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থির থাকিবে না এইজন্য গভর্ণমেণ্ট উড়িষ্যা ও আসাম হইতে বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিয়াছেন। উড়িষ্যা ও আসামে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিলে এ তিন প্রদেশের লোকের মধ্যে একতা হইবে এই ভয়ে গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা ভাষাকে কেবল বাঙ্গালাতেই বদ্ধ রাখিলেন। যখন দুর্ব্বল বাঙ্গালীদিগের প্রতিই এত ভয় তখন যে সমস্ত ভারতবর্ষকে একতা সূত্রে গ্রথিত হইতে দেখিলে ইংরাজেরা ভীত হইবেন না তাহা সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল বড় বড় রাজা আছেন তাঁহারা মনোযোগ করিলে এ কার্য্যটী আরম্ভ করিতে পারেন। ইংরাজেরা যখন আমাদিগকে বিশ্বাস করিবেন

তখন তাঁহারাও তাহাতে যোগ দিতে পারিবেন। তাঁহাদের ভয় যে নিতান্ত বালকের ভয়ের ন্যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি এক ভাষা হইলেই রাজ্যকে স্বাধীন করা যায়, তবে ফরাসী রাজ্য জার্ম্মানীর নিকট পরাজিত হইল কেন? সমস্ত ফরাসীদিগের এক ভাষা ছিল, অস্ত্রশস্ত্রও ছিল তবে পরাজয়ের কারণ কি? ভারতবাসীরা একমাত্র ভাষা রূপ অস্ত্র দিয়া যে ইংরাজদিগকে পরাজয় করিবে ইহা অপেক্ষা হাস্যের বিষয় আর কি আছে?

যেমন এক ভাষা করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য তেমনি উচ্চারণকে একরূপ করিতে চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য। অনেকে হয় তো অসম্ভব মনে করিতে পারেন। বাস্তবিক অসম্ভব নহে। পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় যাহারা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইতেছেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই ভাষা কলিকাতা অঞ্চলের ভাষার ন্যায় হইতেছে। কাহার কাহার কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় না। অতএব চেষ্টা করিলে বোধ হয় উচ্চারণও একরূপ হইতে পারে।

২য় ধর্ম্ম। যেমন ভাষা এক না হইলে একতা হইতে পারে না তেমনি ধর্ম্ম এক না হইলে কোন কালে একতা হইতে পারে না। হিন্দু মুসলমান এরূপ প্রভেদের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যেই সম্প্রদায় ভেদে অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। এক শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে যেরূপ বিবাদ হইয়া থাকে তাহা কে না অবগত আছেন। একই হিন্দুধর্ম্ম যেমন নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বিবাদের সূত্রপাত করিয়া রাখিয়াছে তদ্রূপ এক এক প্রদেশে হিন্দু ধর্ম্মেরই নানাপ্রকার বিভিন্ন আচার ব্যবহার প্রচলিত থাকাতে ঘোরতর অনৈক্য উৎপন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণে মৎস্য আহার করেন, উত্তর-পশ্চিমের ব্রাহ্মণ দূরে থাকুক চামার ভিন্ন আর

কোনও ভদ্রজাতি মৎস্য স্পর্শ পর্য্যন্ত করা পাপ মনে করেন। আমাদের দেশে কোনও হিন্দুই কুক্কুট-মাংস ভক্ষণ করেন না, মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সমস্ত হিন্দুজাতি কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপ আচার ব্যবহারের ভিন্নতা প্রযুক্ত হিন্দুদিগের মধ্যে অনৈক্য দৃঢ়মূল হইয়া রহিয়াছে।

আর্য্যজাতির চিরপূজ্য একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইলে সর্ব্বপ্রকার অনৈক্য চলিয়া যাইবে।

ভারতবর্ষে একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা এবং এক ভাষা প্রচলিত হইলে ভারতবর্ষ সকল প্রকার অমঙ্গলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে। ভারতবাসীদিগের একতা হইবে। "সুলভ সমাচার" ৫ই চৈত্র ১২৮০ সাল

"পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাম।

গত বৎসরে প্রণাম করিয়াছি, এ বর্ষেও হিমালয় হইতে প্রণাম করিতেছি, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শুনিলাম, আপনার শরীর অসুস্থ; ইচ্ছা হয়, নিকটে থাকিয়া এ সময়ে আপনার চরণ সেবা করি। বহুদিন হইতে এই ইচ্ছা, ইহা কি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই? হৃদয়ের যোগ, আত্মার যোগ তো আছেই; তথাপি মন চায় যে, শারীরিক সেবা করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ করে। যদি প্রেমময়ের অভিপ্রায় হয় যে, মনের ভাব মনেই থাকিবে, তাহাই হউক। ভারতে সুমধুর মনোহর ব্রহ্মলীলা-দর্শনে প্রাণ মোহিত হইতেছে। যত দিন যাইতেছে, তত ব্রহ্মসূর্য্যের কিরণ ও ব্রহ্মচন্দ্রের জ্যোৎস্না অন্তরে বাহিরে দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মনে হয়, পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কখন হয় নাই; আমাদের কি সৌভাগ্য, এই সকল আনন্দলীলা আমরা পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি, যাহা দেবতাদের লোভের বস্তু। নিরাকারের এমন খেলা, যিনি ভূমা মহান্, তাঁহার এমন সুন্দর প্রকাশ কে বা জানিত,

কে বা ভাবিত? এখন তাঁহারই প্রসাদে এ সমুদায় দুঃখী কৃপাপাত্র ভারতবাসীদিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল! অনাস্থনস্ত করতলন্যস্ত! হইল কি? ছিল কি? হিমালয় আবার জাগিয়া উঠিতেছেন, গঙ্গা ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছেন। ভারত নূতন বস্ত্র পরিয়াছেন, চারিদিকে নূতন শোভা! কোথাও গম্ভীরনিনাদে, কোথাও মধুরস্বরে, ব্রহ্মনাথ ঘোষিত হইতেছে। এ সময়ে আনন্দধ্বনি না করিয়া থাকা যায় না। এ সকল যোগেশ্বরের খেলা, যোগেতেই আনন্দ, যোগেতেই মুক্তি, এখন প্রাণ যোগ ভিন্ন আর কিছুই চায় না। আসুন, গভীর যোগে সেই পুরাতন প্রাণসখার প্রেমরস পান করি ও প্রেমময় নাম গান করি।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী সেবক, শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিমলা হইতে ২৭।৯।১৮৮৩ তারিখে লিখিত। "পত্রাবলী" পৃ. ৩

সাহিত্য-সাধনা

কেশবচন্দ্র প্রচলিত অর্থে 'সাহিত্যিক' ছিলেন না। তিনি মুখ্যতঃ ধর্ম্মনেতা, সমাজ-সংস্কারক ও সমাজসেবী। তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য কর্ম্মে রূপায়িত করার পক্ষে ইংরেজী ও বাংলা ভাষাকেই বাহন করিয়া লইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্ব-অধীত বিদ্যা এবং আগেকার ভাষানুশীলন বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। তাঁহার বাগ্মিতাশক্তি প্রবল ছিল; বাংলা ও ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যে বুৎপত্তি হেতু তাঁহার বক্তৃতা সাবলীল গতি লাভ করে। তিনি উচ্চ-শিক্ষিত, সামান্য-শিক্ষিত, এমন কি প্রচলিত অর্থে 'অশিক্ষিত' জনগণের নিকট তাঁহার কথা পৌঁছাইতে চাহিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত তিনি ভাষায় এমন একটি ভঙ্গীমা বা শৈলী গ্রহণ করিলেন যাহা দ্বারা তাঁহার বক্তব্য সর্ব্বজনবোধ্য হইয়া উঠিতে

পারে। কঠিন কঠিন বিষয়ের সহজবোধ্য আলোচনায়ও বাংলা ভাষা কিরূপ উপযোগী তাহা মনে হয় কেশবচন্দ্রই প্রথম প্রদর্শন করান। তাঁহার দ্বারা বাংলা সাহিত্য একটি নূতনতর রূপ লাভ করিয়াছে। এ কারণ সমকালীন মনীষীদের নিকটও তৎপ্রবর্তিত সরল ভঙ্গিমা বিশেষ প্রশংসাপ্রাপ্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ এবং চতুর্থ পাদের বাংলা গদ্যের মধ্যে কত তফাত! বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। কেশবচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত খুব কমই আলোচনা হইয়াছে। জনৈক সাহিত্যিক তাঁহার রচনা সম্বন্ধে সত্য সত্যই বলেন:

"কেশবচন্দ্রই প্রথম বাংলা ভাষায় মিষ্টিসিজম্ আনয়ন করেন। তিনি ছিলেন ভাষা-শিল্পী—নূতন শব্দ প্রণয়নে ছিল তাঁহার অশেষ দক্ষতা। এমন অনেক কথা দেখা যায় যাহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং নূতন ভাবের বাহন। 'নববিধান', 'নবসংহিতা', 'জীবনবেদ', 'সাধু সমাগম', 'সেবকের নিবেদন', 'ধর্ম্ম-সমন্বয়' প্রভৃতি কথা সম্পূর্ণ নূতন। বাংলা ভাষার ভকাবুলারিতে এই সকল শব্দ চিরদিন সর্ব্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে।"

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও রচনা বাংলা সাহিত্যকে সবিশেষ পুষ্ট করিয়াছে সন্দেহ নাই, তাঁহার বক্তৃতাগুলি অনুলেখনের সাহায্যে প্রায়ই বিধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার ইংরাজী-বাংলা রচনা ও বক্তৃতা এখনও বিবিধ পত্র-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন সভা-সমিতির বিবরণ-পুস্তকের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া আছে। তাহার যে অংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেই এক বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলা ও ইংরাজী গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা এখানে দিতে প্রয়াস পাইলাম। শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে এবং পত্র-

পত্রিকা সম্বন্ধেও আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কাল-নির্ণয়ে সমকালীন পত্র-পত্রিকা প্রথম সংস্করণের পুস্তক-পুস্তিকা এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থতালিকাগুলি হইতে বিশেষ সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

বাংলা পুস্তক

দুইটি প্রার্থনা। ১৮৬১ (?); **ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান**। পৃঃ ৪৮; **কলুটোলা ব্রাহ্মসমাজ**। দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা। ১৮৬২ পৃঃ ১২; **প্রচারকদিগের প্রতি নিবেদন**। ১৮৬৫; **বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য**। ১৮৬৫; **ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ**। [বঙ্গানুবাদ সহ] ১৮৬৬ পৃঃ ৬৪ [বইখানি কেশবচন্দ্র সম্পাদনা করেন। পরে ইহা তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রকাশ করেন ১৯৫৬ পৃঃ ৪৬৮]; **স্ত্রীর প্রতি উপদেশ**। ১৮৬৬ পৃঃ ৩৭; **ভক্তি**। মে ১৩। ১৮৬৮ পৃঃ ২৭; **ব্রহ্মোৎসব**। জুলাই ১৮। ১৮৬৮ পৃঃ ৩৩; **উপাসনা প্রণালী**। ২৩ জানুয়ারি। ১৮৬৯ পৃঃ ২০; **ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন**। ১৮৭০; **হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসবে ধর্ম্মালোচনা**। ১৮৭১ পৃঃ ৩৭; **ধর্ম্মসাধন**। ১৮৭২ পৃঃ ৬৫ [ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের উপাসক ও সঙ্গতসভার আলোচিত প্রস্তাব সকল হইতে সঙ্কলিত]; **সামাজিক উপাসনা প্রণালী**। ১১ নভেম্বর। ১৮৭২ পৃঃ ৩৭; **গোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা**। ১৮৭২; **ব্রাহ্মসমাজের মতসার**। ২৩ জানুয়ারি। ১৮৭৩ পৃঃ ১৪; **কতকগুলি ধর্ম্মকথা**। ১ম ১৮৭৩ পৃঃ ১১, ২য় ১৮৭৩ পৃঃ ৮; **কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ**। ভাদ্রোৎসব ১৮৭৪ পৃঃ ১৩; **সুখী পরিবার**। ১৮৭৪ পৃঃ ২৪; **শারদীয় উৎসব**। ১৮৭৪ পৃঃ ৯; **কতকগুলি প্রশ্নোত্তর**। ১৮৭৫ পৃঃ ১২;

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? ১৮৭৫; **বসুহাটী ব্রাহ্মসমাজের ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।** ১৮৭৬ পৃঃ ২৩; **পরমহংসের উক্তি।** ২৪ জানুয়ারি। ১৮৭৮ পৃঃ ৪৩; **আচার্য্যের উপদেশ।** (ভাদ্র ১৪। ১৭৯১ শক হইতে ফাল্গুন ১২। ১৮০১ শক পর্য্যন্ত) ছয় খণ্ডে একত্রে ১৮৮০ (?)। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে উপদেশ প্রদান করিলে পরেই তাহা 'ধর্ম্মতত্ত্বে' ও সঙ্গে সঙ্গে কোন-কোনটি পুস্তিকাকারে বাহির হইত। প্রথম উপদেশ: ব্যাকুলতা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। পর পর যে সকল উপদেশ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় তাহা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে একত্রে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার ভিতর ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশও ছিল। পরে বাছিয়া কালানুক্রমিক ভাবে সাজাইয়া ও অন্যত্র বিক্ষিপ্ত উপদেশ সংগ্রহ করিয়া ১৯১৬-২০ খ্রীষ্টাব্দে তাহা দশ খণ্ডে সবশুদ্ধ ২৮৭৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হয়। ইহাতে জানুয়ারি ২৩। ১৮৬২ হইতে এপ্রিল ১৩। ১৮৮৩ পর্য্যন্ত অনেকগুলি উপদেশ পাওয়া যায়; **ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ** ১ম ভাগ। জানুয়ারি ২৫। ১৭৮০ পৃঃ ৭২। এই উপদেশগুলিও 'ধর্ম্মতত্ত্বে' এবং পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী উপদেশগুলি ২য় ভাগে ১৮০৯ শক ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পৃঃ ৫৮, প্রকাশিত হয়। পরে 'বিধান ভগ্নিসঙ্ঘ' নামে এই দুই ভাগ ও অন্যত্র বিক্ষিপ্ত উপদেশ (জানুয়ারি ২৭। ১৮৭২ হইতে নভেম্বর ৫। ১৮৮২ পর্য্যন্ত) ও 'স্ত্রীর প্রতি উপদেশ,' 'সুখী পরিবার' প্রভৃতি ছয়টি প্রবন্ধ একত্রে আগষ্ট ২৫। ১৯৩২ পৃঃ ৩১৮ প্রকাশিত হয়; **সেবকের নিবেদন।** (আষাঢ় ১৪। ১৮০২ হইতে ৩রা ভাদ্র ১৮০৫ পর্য্যন্ত) পাঁচ খণ্ডে পৃঃ ৭৮৫ ১৮৮০-৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই-গুলিও প্রথমে 'ধর্ম্মতত্ত্বে' ও সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রকরণ 'সেবকের নিবেদন' নামে ১ হইতে ৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐগুলি কালানুক্রমিক ভাবে

সাজাইয়া ও অন্যত্র বিক্ষিপ্ত নিবেদনগুলি সংগ্রহ করিয়া ১ম ও ২য় খণ্ড পৃঃ ২৯০, ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৪১, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৩০, ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৩৩, ১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; **জীবনবেদ**। জানুয়ারি ১৮৮৩। জীবনবেদের উপদেশগুলি 'সেবকের নিবেদন : নূতন প্রকরণ' সংখ্যা ৭৩-৭৭ পৃঃ ৮১-১২০, সংখ্যা ৮০-৮৬ পৃঃ ১৩৩-১৮৮, সংখ্যা ৮৯-৯১ পৃঃ ২০৫-২২৮ প্রকাশিত হয় এবং ১৮০৫ শকে 'জীবনবেদ' নাম দিয়া ঐ সংখ্যাগুলি একত্রিত করিয়া প্রকাশ করা হয়; **নববিধান প্রেরিতগণের প্রতি বিধি**। ১৮৮৬ পৃঃ ৩৪; **ব্রহ্মগীতোপনিষদ্**। (প্রথমার্দ্ধ ১৮৮৬ (?) পৃঃ ১১৮ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ ১৮৮৭ পৃঃ ১২৫), **সাধু সমাগম**। ১৮৮৭ পৃঃ ৮৫ [পুস্তকখানি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্দ্ধিতাকারে প্রকাশিত, পৃঃ ১৩৩]; **মাঘোৎসব**। ১৮৮৮ পৃঃ ১২৬ [১৯৩১এ পরিবর্দ্ধিতাকারে প্রকাশিত, পৃঃ ১৬৮]; **প্রার্থনা** (হিমাচল) ১-৩ খণ্ড। ১৮৮৪-৮৫ পৃঃ ২৯৭; **দৈনিক প্রার্থনা** (কমলকুটীর) ১-৮ খণ্ড। ১৮৮৬-৯৫, **দৈনিক প্রার্থনা** (ভারতাশ্রম প্রভৃতি) ১ম ১৯১৫ পৃঃ ২২৭ ও ২য় ১৯১৫ পৃঃ ২২৬; **প্রার্থনা** (ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির) ১৯১৬ পৃঃ ১৫২ [৩৩-৩৬ সংখ্যক বইগুলিতে প্রকাশিত প্রার্থনাগুলি কেশব জন্ম-শত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'আচার্য্যের প্রার্থনা' নামে চার খণ্ডে পৃঃ ১৫৫৬ কালানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত করিয়া ১৯৩৯-৪১-এ প্রকাশিত হয়]; **ব্রহ্মোপাসনা**। ১৯০১ পৃঃ ৯৯ [পরিবর্দ্ধিতাকারে 'দৈনিক উপাসনা' নামে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পৃঃ ১৩৪ প্রকাশিত হয়।]; **পরিচারিকা**। ৩রা মার্চ্চ ১৮৭৬ বিবৃত ও ১৮৩৭ শক ১৯১৫ পৃঃ ৫ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত, **বিশ্বাস ও ভক্তিযোগ**। ১৮৬৭ বিবৃত ও ১৯৩১ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত পৃঃ ১২; **ব্রহ্মানন্দের পত্রাবলী**। ১ মার্চ্চ ১৯৪১ পৃঃ ২৬৭ [বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তকে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত মূলপত্র হইতে সংগৃহীত]।

ইংরেজী পুস্তক

Young Bengal—This is for you. E—1860 p. 1-6; Be Prayerful. E—1860 p. 7-15; Religion of Love. E—1860 p. 17-22; Basis of Brahmoism. E—1860 p. 23-32; Brethren, Love Your Father. E—1860; Signs of the Times. E—1860; An Exhertation. E—1860; Testimonies to the Validity of Intuitions I. E—1861; Testimonies to the Validity of Intuitions II. E—1861; The Rev. S. Dyson's Questions on Brahmoism answered. E—1861; Revelations. E—1861; Atonement and Salvation. E—1861; The Theist's Prayer Book. P—1861 p. 13; The Destiny of Human Life. L. I.—1862; The Brahmo Somaj Vindicated. L. I.—1863 p. 25; True Faith. 1865 p. 34; An Appeal to Young India. E—1865; Jesus Christ—Europe and Asia. L. I.—1866 p. 31; Greatmen. L. I.—1866 p. 28; Calcutta Brahmo School Lectures. L. I—1868; Regenerating Faith. L. I.—1868 p. 32; Faith. L. I.—1868; Prayer. L. I.—1868; Religious and Social Reformation. L. I.—1868 p. 24; America and India (Free Religious Association). 1869 p. 12; The Educated Native—His Position and Responsibilities—1869 p. 11; The Future Church. L. I.—1869 p. 33; Divine Worship. 1870 p. 12; Psalms by An Indian Thiest. 1870 p 12; The Living God in England and India. 1870; Address in Welcome Soiree in England K. E.—1870; The Duty of England to India. K. E.—1870 p. 49; Lectures and Tracts (First and Second Series) (Edited by Sophia Dobson Collet). L. I. etc.—1870 p. 288; The Reconstruction of Native Society No. I. L. I.—1872 p. 10; Nine Letters on Educational Measures (May to Aug. 1872). 1936 p. 62; Essential Principles of Brahmo Dharma. 1873 p. 8; Inspiration. 1873 p. 24; Essays—Theological and Ethical (First Series). 1874 p. 152; Behold the Light of Heaven in India.—L. I.—1875 p. 36; Our Faith and our Experiences. L. I.—1876; The Disease and the Remedy. L. I.—1877; Philosophy and Madness in Religion. L. I.—1877

p. 27 ; Hand Book of Theistic Devotion. P—1878 p. 22 ; Am I an Inspired Prophet ? L. I.—1879 ; India Asks—Who is Christ ? L. I.—1879 ; Missionary Expedition. B. P.—1881 p. 32 ; God-Vision—in the 19th Century. L. I.—1880 p 25 ; The Voice of God. 1880 p 8 ; Husband-Soul to Wife-Soul. 1880 p. 8 ; Revelation and Science. 1883 p. 8 ; An Epistle to Fellow Indians. B. P.—1881 p. 15 ; Welcome to Oxford Mission. 1881 p. 11 ; New Year's Day Epistle. N. D.–1884 p. 8 ; Queen's Birth Day Proclamation. 1884 p. 5 ; The New Baptismal Ceremony. N. D.—1885 p. 9 ; The New Homa Ceremony. N. D.—1884 p. 6 ; My Sweet Ektara. N. D.—1884 p 5 ; Essential Principles of Brahmo Dharma. 1885 p. 8 ; Psalms. 1885 p. 10 ; Divine Worship. 1885 p. 15 ; Epistles to the Theists in India. K. E —1885 p. 17 ; A Voice from the Himalayas. B. P.—1885 p. 17 ; The Flag Ceremony. N. D.—p. 6 ; We Apostles of the New Dispensation. L. I.—1881 p. 29 ; Keshub Chunder Sen in England Vol. I. (Collection of Lectures in England). 1881 ; Keshub Chunder Sen in England Vol. II. (Collection of Lectures in England). 1882 p. 209 ; That Marvellous Mystery—The Trinity. L. I.—1882 p. 27 ; Lectures in india. 1883 p. 422 ; Asia's Message to Europe. L. I.—1883 p. 42 ; The Minister's Epistle. N. D.—1883 ; The Minister's Prayers Part I. P.—1943 p. 392 ; Yoga—Objective and Subjective. 1884 p. 48 ; The New Samhita. 1884 p. 107 ; The New Dispensation. 1884 p. 47 ; Essays—Theological and Ethical Part II. 1886 p. 199 ; Querries and Answers. 1886 p. 29 ; Diary in England. B. P.—1886 p. 101 ; Diary in Madras and Bombay. B. P.—1887 p. 80 ; Diary in Ceylon. B. P—1888 p. 83 ; The New Dispensation. 1906 p. 308 ; The New Dispensation Vol. II. 1910 p. 320 : Discourses and Writings. 1904 p. 105 ; The Book of Pilgrimages. 1904 p. 275.

E = Essays—Theological and Ethical. B. P. = Book of Pilgrimages. K. E. = Keshub Chunder Sen in England. N. D. = New Dispensation. L. I. = Lectures in India. P = Prayers. D = Discourses and Writings. যে সকল পুস্তিকার এইরূপ সাংকেতিক চিহ্ন আছে, সেগুলি পরে সেই সেই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।